

বাঙালি জাতির জীবনে একাত্তরের ৭ মার্চ অন্য যেকোনো একটি দিনের মতো ছিল না। যদিও দিনটি ছিল অন্যান্য বছরের ফাল্গুনের দিনগুলোর মতোই পাতা ঝরার সময়। শেষ ফাল্গুনের দুপুরটি ছিল না শীত না গরম। আকাশ ছিল পরিষ্কার, কিন্তু চড়া রোদ সেদিন ছিল না। সেদিন রেসকোর্স বা বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে সমাবেশ হয়, সেই সমাবেশও অতীতের কোনো সমাবেশের সঙ্গে তুলনীয় নয়। শেখ মুজিবুর রহমান অতীতে বহু জনসভায় বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু সেদিনের সমাবেশে তিনি যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, সেটি ছিল তাঁর জীবনের অনন্য এক ভাষণ। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণটি ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে দুটি প্রধান দলিলের একটি। দ্বিতীয়টি ১০ এপ্রিলের বৈদ্যনাথতলার ‘স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র’।

কোনো কোনো জাতির ইতিহাসে কোনো একটি প্রজন্ম খুবই ভাগ্যবান। শত দুঃখ-কষ্ট সয়েও তারা ভাগ্যবান এই জন্য যে তারা নিজের চোখে ইতিহাসের নির্মাণ দেখে। তাদের মধ্যে যাদের ইতিহাস সৃষ্টিতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়, তাদের সৌভাগ্য সীমাহীন। আমরা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতাসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সেই প্রজন্ম। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে আন্দোলনের ইতিহাস বই পড়ে জানবে, তা আমাদের চোখে দেখা।

ঘরোয়া আলোচনায় বা সেমিনারে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনতে পছন্দ করতাম। কিন্তু কোনো জনসভায় দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে নেতাদের বক্তৃতা শুনতে আমার ভালো লাগত না। অথও পাকিস্তানের শেষ চার মাস আমি বেশ কয়েকটি জনসভায় শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। ঘূর্ণিঝড়বিধ্বস্ত উপকূল এলাকা থেকে ফিরে এসে মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে যে জনসভা করেন ২৩ নভেম্বর ১৯৭০; তা শুনতে দৈনিক পাকিস্তান গ্রুপের অনেকের সঙ্গে আমিও স্টেডিয়ামের দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। ‘স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান’ কথাটি সেদিন সেখানে প্রথম উচ্চারিত হয়। শুনে অনেকের মতোই কবি শামসুর রাহমান রোমাঞ্চিত হন। একাত্তরের ২১ ফেব্রুয়ারি পল্টনে ছাত্রলীগের জনসভায় বন্ধুদের সঙ্গে আমি মঞ্চের কাছেই ছিলাম। সেখান থেকে বাংলাদেশের স্বাধিকারের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়। ছাত্রলীগের ৩ মার্চের জনসভায়ও বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনি। সর্বশেষ যে স্মরণীয় জনসভাটিতে আমি উপস্থিত ছিলাম, সেটি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি— বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি বন্দিশালা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন।

৭ মার্চ রক্তের অক্ষরে লেখা একটি দিন। তবে জাতির জীবনে ৭ মার্চও হঠাৎ আসেনি। তার আছে এক দীর্ঘ পটভূমি।

সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং কেন্দ্রের সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্র চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাদের দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষও উদাসীন ছিল না। বঙ্গবন্ধুও বুঝতে পারছিলেন পাকিস্তানি সামরিক জান্তার কুচক্রী মনোভাব। ইয়াহিয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে সমস্ত জানুয়ারি মাসটিকে কাজে লাগান। ১২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা আসেন তাঁর উপদেষ্টাদের নিয়ে। তিনি ছয় দফার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ চান। অতি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট হন না। এরপর জানুয়ারির শেষ হপ্তায় ভুট্টো আসেন তাঁর দলের নেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গে ছয় দফা বিষয়ে আলোচনার জন্য। তাঁর কাছে ছয় দফা বিচ্ছিন্নতাবাদী এজেন্ডা। এরপর ১১ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদে ইয়াহিয়া-ভুট্টো দীর্ঘ আলোচনা করেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া এক ঘোষণায় ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ভুট্টো জানিয়ে দেন, তিনি ঢাকায় আসবেন না, কারণ ঢাকা এলে তাঁকে বাঙালিরা মেরে ফেলবে। ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিম পাকিস্তানের আরও নেতা ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে সিন্ধুর জাতীয়তাবাদী নেতা জি এম সৈয়দও ছিলেন। তিনি করাচি গিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি বলেন, তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, ছয় দফায় পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর কিছু নেই।

মানুষের জীবনের কিছু কিছু স্মৃতি কোনো দিনই ম্লান হয় না। তা চির-অম্লান। পাকিস্তান আমলের শেষ একুশে ফেব্রুয়ারির কথা আমার মনে পড়ে। সে ছিল এক অন্য রকম শহীদ দিবস। হাজার হাজার মানুষ রাত ১০টার পর থেকে শহীদ মিনার ও আজিমপুর কবরস্থানে যেতে থাকেন। সেই লাখে জনতার মধ্যে বঙ্গবন্ধুও ছিলেন। রাত ১২টা ১ মিনিটে তিনি শহীদদের কবরে ফাতেহা পাঠ করেন এবং কবরে ফুল দেন। সেখান থেকে তিনি খালি পায়ে হেঁটে আসেন শহীদ মিনার। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সে রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে হেঁটে শহীদ মিনারে আসার। সে রাতে তিনি শহীদ মিনারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তিনি বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশ কারও বাজারও হবে না, কারও কলোনিও হবে না। বায়ান্নতে তারা আমাদের ছেলেদের হত্যা করেছে। তাঁরা শহীদ। এবারের সংগ্রামে আমরা হব গাজী।’

একাত্তরের ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের রেসকোর্সে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও আমি উপস্থিত ছিলাম। নৌকার আকারে বিরাট মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু। সেখানে পরিবেশিত হয়েছিল ‘আমার সোনার বাংলা’ এবং বেশ কিছু গণসংগীত।

১ মার্চ পূর্ণাঙ্গী হোটеле আওয়ামী লীগের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সংসদীয় দলের সভা চলছিল। তখনই রেডিওতে ঘোষণা করা হয়, ৩ মার্চ যে অধিবেশন বসার কথা, তা প্রেসিডেন্ট মূলতবি করেছেন। আমি তখন ওই হোটেলের কয়েক গজ দূরে সিকান্দার আবু জাফরের সমকাল অফিসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ

মতিঝিল, জিন্নাহ অ্যাভিনিউ (ওই দিনই এর নামকরণ হয় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ) এবং দৈনিক বাংলার দিক থেকে মুহূর্মুহু স্লোগান শুনতে পাই: ‘জাগো জাগো বাঙালি জাগো’, ‘তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ’ প্রভৃতি। বেরিয়ে দেখি রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ অনেকের হাতে লাঠিসোঁটা।

তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলনে অধিবেশন মূলতবির প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘এ এক সুদীর্ঘ ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি’। তিনি পরদিন ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারা দেশে হরতালের ঘোষণা দেন। তিনি জানিয়ে দেন, ৭ মার্চ রেসকোর্সে এক সমাবেশে ‘বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচি ঘোষণা’ করা হবে। ১ মার্চ থেকেই ৭ তারিখের জন্য মানুষ রুদ্ধস্থানে অপেক্ষা করতে থাকে। তখন থেকে রাজনীতি শুধু আর আওয়ামী লীগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। সব দলমতের মানুষই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

তখন রমনা পার্ক ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝখানে মওলানা ভাসানী রোড এখনকার মতো প্রশস্ত ছিল না। সোহরাওয়ার্দীর দিকেও শতবর্ষী সেগুন ও মেঘশিরীষ ছিল কয়েকটি। উদ্যানটি ফাঁকা। সমাবেশের নির্ধারিত সময় ছিল বেলা দুইটা। বেলা সাড়ে ১১টার সময় কমলাপুর জসীমউদ্দীন রোড থেকে আমি গিয়ে দেখি রেসকোর্স এক জনসমুদ্র। কোনোক্রমে আমি ঠাঁই পাই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের উল্টো দিকে এক গাছের তলায়, যে গাছের ডালেও বসেছিল কয়েকজন। জনতার ভিড়ে ৩২ নম্বর থেকে সভামঞ্চে আসতে বঙ্গবন্ধুর ঘন্টা খানেক দেরি হয়। প্রথাগত জনসভা নয়, একমাত্র বক্তা বঙ্গবন্ধু। জনতার শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটে উচ্চারিত হয়: ‘ভায়েরা আমার...!’

সেদিন তিনি কী বলেছিলেন, দেশের মানুষের আজ তা মুখস্থ। ভাষণে একটি শব্দও নেই অপ্রাসঙ্গিক। একটি বাক্যও নেই অন্যায়। ভাষণের শুরুতেই তিনি কয়েকবার ‘দুঃখ’ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষেই সেদিন তিনি ‘দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে’ জনতার ‘সামনে হাজির’ হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের ওপর সামরিক জান্তার নির্মম অত্যাচার। বঙ্গবন্ধু তাঁর আন্দোলনের পটভূমি জনতার সামনে তুলে ধরেন। তবে তা বিশুদ্ধ বইয়ের ভাষায় নয়, জনগণের মুখের ভাষায়। পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে কখন তাঁর কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তা জনগণকে জানানো পাকিস্তানের ‘মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে’ তাঁর দায়িত্ব বিরাট, তাই তিনি সবার সঙ্গে ‘আলোচনা’ ও ‘আলাপ’ করে ‘শাসনতন্ত্র তৈয়ার’ করার কথা বলেন।

ভাষণে তিনি যে চারটি শর্ত দেন, তার চেয়ে ন্যায়সংগত দাবি ওই পরিস্থিতিতে হতে পারত না। এক. সামরিক আইন প্রত্যাহার, দুই. সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া, তিন. সব হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করা, এবং চার. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি ছিল: ‘আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, এ দেশের মানুষের অধিকার চাই’ আর একটি প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছিল: ‘সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবো না।’

বঙ্গবন্ধু সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ধারার জননেতা, গেরিলা যুদ্ধের বিপ্লবী নেতা নন। তাঁর ক্ষমতার উৎস জনগণ, বন্দুকের নল নয়। সেদিনের ভাষণের বিষয়বস্তুর বিকল্প আর কী হতে পারত? তাঁর পক্ষে কি বলা সমীচীন হতো: ‘আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।’ অমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা তিনি বলেননি কারণ, পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও অন্যান্য বাস্তবতায় তা তিনি দিতে পারেন না। তা দিলে বাংলাদেশ হতো নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা। আবেগের বশে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে দেশের ৮০ থেকে ৯০ ভাগ মানুষের সমর্থন পেলেও পৃথিবীর সমর্থন পেতেন না—এমনকি ভারতেরও নয়।

বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবেই বলেছিলেন: ‘এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ তিনি বলেছিলেন, স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। তার জন্য আজ থেকে সংগ্রাম শুরু হলো। স্বাধীনতা কারও হাতে তুলে দেওয়ার জিনিস নয়, তা সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল ৭ মার্চের ভাষণে।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি আরেকটু দীর্ঘ ছিল। রেকর্ড করার সময় মাঝে মাঝে কিছু কথা বাদ পড়ে থাকবে। সেকালে রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা এখনকার মতো নিখুঁত ছিল না। কিন্তু তাতে ভাষণটির অঙ্গহানি ঘটেনি।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস-বিকৃতি আহমদ রফিক -ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১৫

বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন জাতীয় চরিত্রের একটি ঐতিহাসিক আন্দোলন। সূচনায় ছাত্র-আন্দোলন হিসেবে এর প্রকাশ ঘটলেও দ্রুতই তা দেশজুড়ে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয় সর্বশ্রেণির মানুষের সমর্থন নিয়ে। এর মূল দাবি পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও এ আন্দোলন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে বাঁকফেরা গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। প্রমাণ, বায়ান্ন থেকে পরবর্তী কয়েক বছরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন।

বিশেষ প্রমাণ মেলে বিভাগোত্তর চার বছরের সাহিত্যের সঙ্গে একুশে-সাহিত্য এবং একুশে-উত্তর সাহিত্যচর্চার তুলনামূলক বিচারে এবং ১৯৫২ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনগুলোর (কুমিল্লা-ঢাকা-কাগমারী) বহুমাত্রিক চরিত্রে—যে চরিত্র একাধারে জাতীয়তাবাদী, প্রগতিবাদী ও লোক-সাংস্কৃতিক। রাজনীতিতে এর প্রভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে নির্বাচনী একুশ দফার গণতন্ত্রী, জাতীয়তাবাদী ও জনকল্যাণী আদর্শের কর্মসূচি বাস্তবায়নের দাবিতে। বাস্তবে

রাজনৈতিক সুফল বহুমতের যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও স্বৈরাচারী-সম্প্রদায়বাদী মুসলিম লীগের অভাবিত পরাজয়ে রাজনীতিতে এর উত্তরপ্রভাব আরও প্রকাশ পেয়েছে যাটের দশকে জাতীয়তাবাদী স্বাধিকার চেতনার ক্রমবিকাশে।

স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ শাসনের চরম দমননীতি ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে নিয়ে রাজনৈতিক জবরদস্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রতিবাদী শক্তি সংহত করতে গঠন করা হয় বহুমতের সর্বদলীয় সংগঠন। আর এতেই ছিল আন্দোলনের সবলতা-দুর্বলতা—দুই-ই। এবং তা একাধিক ভিন্নমতের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বের উপস্থিতিতে। মতাদর্শগত এ দ্বন্দ্বের তাৎক্ষণিক ও উত্তরপ্রভাব স্পর্শ করেছে আন্দোলনের চিত্রচরিত্র উপস্থাপনকে। আরও একটি অব্যাহত বিষয় উচ্চাভিলাষী রাজনীতিকেরা এ আন্দোলনকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাঁদের ব্যক্তিক বা দলীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে। উদাহরণ কম নয়।

সত্যি বলতে কি, ভাষা আন্দোলনের দু-একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের কথা বাদ দিলে ভাষা আন্দোলনের তথ্যবিকৃতি, মূল্যায়নবিকৃতি ঘটেছে নানাভাবে, বিশেষ করে আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কুশীলবদের নৈরাজ্যিক স্মৃতিচারণা। এ ধারাতেই তথ্যগত ভুলভ্রান্তি সর্বাধিক এবং সম্ভবত বিস্মৃতি বা ঝাপসা স্মৃতির কারণে এ ছাড়া কখনো মতাদর্শগত বৈপরীত্যও এ ধরনের বিকৃতির কারণ।

শেষোক্ত ক্ষেত্রে অনেকের প্রবণতা আপন আদর্শিক ভূমিকা, বাস্তব ভূমিকা বড় করে তোলা এবং বিপরীত ধারাকে ভাসিয়ে দেওয়া। সে ক্ষেত্রে ইতিহাসের সত্য বিকৃত হয়েছে, হয়েছে পূর্বোক্ত তিন মতাদর্শের পরস্পরবিরোধী পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আন্দোলনের মূল কারিগরদের বাইরেও তাদের কোনো কোনো আদর্শিক অনুসারী অধিকতর দৃঢ়তায় ইতিহাসবিরোধী পথে চলতে আগ্রহী। এ সম্পর্কে পরে আলোচনায় আসছি, তার আগে প্রাথমিক পর্বের দু-একটি ঘটনা উদ্ধার জরুরি, মূলত উল্লিখিত বক্তব্যের যথার্থতা প্রতিষ্ঠার জন্য।

২.

ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব অর্থাৎ এর তাত্ত্বিকপর্বে লেখক-সাংবাদিক আবদুল হক ও মাহবুব জামাল জাহেদী প্রমুখের লেখা এবং ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. এনামুল হক প্রমুখের রচনাদি ছিল যুক্তিসজ্জিত। কিন্তু এর পাশাপাশি ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বরে যে সংগঠনটি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠে, তার আদর্শ ছিল ধর্মভিত্তিক। তাই বিপরীত মতাদর্শের রাজনীতি, বিশেষভাবে সমাজবাদীদের দূরে রেখে সম্ভাব্য আন্দোলনে একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ছিল তাদের বরাবরের লক্ষ্য।

তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও রচনায় সমাজবাদবিরোধিতা যেমন স্পষ্ট, তেমনি তাতে ইতিহাসের সত্যও লজ্জিত। ১৯৪৮ সালে সরকারের সঙ্গে তাদের আপসরফার বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল না, যা তাদের একাধিক নেতার বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। ঢাকায় ১৯৪৮ মার্চের আন্দোলনে সর্বদলীয় নেতৃত্বের প্রশ্নে রাজপথে বাস্তব তৎপরতায় দেখা যায় জাতীয়তাবাদী ও সমাজবাদী নেতাদের প্রাধান্য। এমনকি জিন্নাহ সাহেবের ঢাকা সফর উপলক্ষে আন্দোলন স্থগিত করার বিরুদ্ধে ছিলেন বিশেষভাবে মোহাম্মদ তোয়াহা ও তাজউদ্দীন আহমদ। আন্দোলন বন্ধের বিপক্ষে ছিল সাধারণ ছাত্রসমাজ।

অথচ ভাষা আন্দোলনের ইতিকথায় অনেকে লিখে থাকেন ১৯৪৮-এর ভাষা আন্দোলনে তমদুন মজলিসের একচেটিয়া ভূমিকার কথা, যদিও ঢাকায় ওই আন্দোলনে পিকেটিংয়ের নেতাদের রাজনৈতিক পরিচয় নিতে গেলে ভিন্ন চিত্র উঠে আসে। তাই অবাক হতে হয়, যখন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস-লেখক বশীর আল-হেলাল অতিরিক্ত গুরুত্ব দেন ১৯৪৮ আন্দোলনে মজলিসের বিশেষ ভূমিকার ওপর। তমদুন মজলিসের প্রচারিত পুস্তিকাদিতে দেখা যায় ইসলামি সমাজব্যবস্থা কায়মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখা যায়, এরা সমাজবাদী আদর্শের ঘোর বিরোধী। তাই শেষোক্তদের ভূমিকা নিয়ে ইতিহাসকে ভিন্নপথে চালনা করাই হয়ে ওঠে তাদের লক্ষ্য। সে জন্য অন্যদের ভূমিকাকে তারা খর্বিত করে দেখায়।

দু-একটি উদ্ধৃতি বিষয়টি স্পষ্ট করবে। যেমন মজলিসপ্রধান অধ্যাপক আবুল কাসেমের বক্তব্য: ‘বস্তুত কমিউনিস্টরা এই আন্দোলনের জন্য কোনো চেষ্টাই করে নাই...এই সুবিধাবাদীগণই নাজিম-মন্ত্রিসভাকে কয়েদে আজমের সম্মুখে আমাদের আন্দোলন ও উদ্দেশ্যের অপব্যবহার সুযোগ দান করিয়াছে...অতি প্রগতিশীলরা ছাত্রদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করিয়া ছাত্রদের ঐক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলিয়া দেয়া’ (একুশের সংকলন, ১৯৮০)।

অথচ আমরা জানি, কি ১৯৪৮-এ কি ১৯৫২-এ, প্রগতিবাদীদের বরাবরের চেষ্টা ছিল আন্দোলনকে সর্বদলীয় চরিত্রে গড়ে তোলা, যাতে এর শক্তি বৃদ্ধি হয়। বিভাজিত শক্তি যে দুর্বল শক্তি—এ সত্য অভিজ্ঞতা তাদের শিখিয়েছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সর্বস্তরে তাঁরা এ আদর্শই অনুসরণ করেছেন। এই ধারায় কমরেড মুজাফফর আহমদের ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক কাসেমের অভিযোগের জবাবে প্রথমোক্তের একটি বাক্যই উদ্ধার করছি: ‘খুব বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে যে এই বক্তব্যে কিঞ্চিৎ সত্যের অপলাপ আছে’ ইত্যাদি (সৈনিক, শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৫৩)। ১৯৪৮-এর আন্দোলন সম্পর্কে ১৬ মার্চের ঘটনা নিয়ে শাহেদ আলীর বক্তব্যও অনুরূপ বিব্রান্তিকর তথ্যে দুষ্ট। (একুশের সংকলন, ১৯৮০)। রচনা-সংক্ষেপের তাগিদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত উদ্ধৃতিদান সম্ভব হলো না।

বিশেষ এ রাজনীতির অনুসারী কেউ কেউ একুশ শতকে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক বিদ্রোহ নতুন নতুন তথ্যে সাজিয়ে তুলেছেন, তাতে একুশের ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক চিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নিয়ে তমদুনপন্থী এবং লেখকের রচনায় ভ্রান্ত তথ্যের প্রকাশ ঘটেছে, বিশেষ করে স্মৃতিস্তম্ভের নকশা-আঁকা ও আঁকিয়ার রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে। সেই সঙ্গে এসেছে ডা. সাঈদ হায়দারেরও নাম। রচনাটি প্রকাশিত হয় প্রথম আলোর ১৪ ফেব্রুয়ারি (২০০৪) সংখ্যায়।

বদরুল আলম প্রয়াত। হয়তো তাই এ বিষয়ে ভাষাসংগ্রামী সাঈদ হায়দার লেখেন: ‘আমি তমদুন মজলিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। প্রকৃত তথ্য হলো ওই সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজে তমদুন মজলিসের বা “ছাত্রশক্তি”র কোনো ইউনিট ছিল না...আমার বিশিষ্ট বন্ধু বদরুল কোনো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই যুক্ত ছিল না (প্রথম আলো, ১৮-২-২০০৪)। এ বিষয়ে একই রকম কথা বলেছেন তৎকালীন মেডিকেল ছাত্র শরফুদ্দিন আহমদ, যিনি ছিলেন কলেজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক’ (প্রথম আলো, ২৪-২-২০০৪)। তাঁর ভাষায়: ‘বদরুল আলম ও সাঈদ হায়দার সাহেবদের তমদুন মজলিসের সঙ্গে যুক্ত করে জনাব বার্নিক ইতিহাসের তথ্য বিকৃতি ঘটিয়েছেন।’

৩.

একদিকের বিদ্রোহের তথ্যের উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে অন্যদিকে নজর ফেরানো যাকা বিশেষ করে আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় কারও কারও স্মৃতিচারণার দিকে। তাতে দেখা যায়, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের নানা দিক নিয়ে তথ্যবিচ্যুতি অনেক বেশি। যেমন খ্যাতিমান যুবলীগ নেতার জাতীয় রাজনীতি গ্রন্থে, তেমন একাধিক ভাষাসংগ্রামীর স্মৃতিচারণায়। সেগুলো কখনো পরস্পরনির্ভর, কখনো পরস্পরবিরোধী।

ছোটখাটো ভুলত্রুটির কথা, কিংবা আমতলার সভায় টিয়ার গ্যাসের জ্বালায় শত শত ছাত্রের পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো কল্পিত ঘটনা যদি বাদ দিই, তাহলেও দেখা যাবে, পুলিশের গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনা নিয়ে ইতিহাস-বিকৃতি সর্বাধিক। এমনকি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ নিয়েও। তথ্যগত ভুল যেমন রুচিং সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে, তেমন উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি এলিস কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদনে। আর অপপ্রচার হিসেবে মিথ্যা তথ্য প্রতিবেদন প্রকাশের ঘটনা সর্বাধিক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের বেতার বক্তৃতা ও কোনো কোনো মন্ত্রী বা দলনেতার বক্তব্য-বিকৃতিতে। ‘মাথায় গুলি লাগা সালাউদ্দিন’কে আজ পর্যন্ত শনাক্ত করা যায়নি, কিন্তু মাথায় গুলি লাগা রফিকউদ্দিনের ছবি ঠিকই ছাপা হয়েছে কাগজে। অথচ কল্পিত সালাউদ্দিনকে নিয়ে অনেক বাগাড়ম্বর করা হয়েছে জাতীয় রাজনীতি গ্রন্থে। এবং কারও কারও লেখায়।

দিন-তারিখের ভুলভ্রান্তি ঘটেছে ভাষাসংগ্রামী অধিকাংশের স্মৃতিচারণায়। কিন্তু বিস্তৃতির কারণে নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দিয়েছেন অনেকে, ছোট ঘটনাকে বড় করতে বা কল্পিত ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করতে—যেমন রফিকউদ্দিনকে, তেমন আবুল বরকতকে নিয়ে। বন্ধুস্থানীয় বা ঘনিষ্ঠ পরিচিত এসব লেখকের নাম উল্লেখ না করাই বোধ হয় সমীচীন। হাসপাতালের স্ট্রচার এবং নার্স, ওয়ার্ড বয়দের নিয়েও পরিবেশিত হয়েছে গল্প—যদিও তাঁদের একজনও স্বাভাবিক কারণেই একুশের দুপুরে হোস্টেল প্রাঙ্গণে হাজির হননি ছিলেন না কোনো ‘ধাঙড়’।

অসতর্ক সাংবাদিকতাও মাঝেমাঝে ঘটনায় ভুলত্রুটির জন্ম দিয়েছে। সালাউদ্দিন প্রসঙ্গের মতোই একই দৈনিকে পাঁচুয়ার গ্রাম্য যুবা শহীদ জব্বারের পরিচয় হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এ ধরনের ভুল ইতিহাসের বিচারে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

শহীদদের নিয়ে জানাজা প্রসঙ্গেও অনেকে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে লাশ নিয়ে পরদিন মিছিলের সিদ্ধান্ত একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখেই গায়েবানা জানাজার প্রসঙ্গ আসে পরদিন সকালে, যখন জানা গেল গভীর রাতে হাসপাতাল থেকে লাশ উদ্ধার। ২২ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদ-এ ঠিকই বলা হয় যে ‘২১ ফেব্রুয়ারি বেলা চারটার পর হোস্টেলের মধ্য হইতে মাইকযোগে নিহতদের জানাজায় শরিক হওয়ার জন্য ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।’

জাতীয় রাজনীতির ভুল তথ্যগুলো থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে অনেকের মতো বশীর আল-হেলালও ভুল করেছেন এমন কথা লিখে যে, ‘আন্দোলনের নেতাদের এই সময় আর দেখতে পাওয়া যায় না...তাদের অধিকাংশ আত্মগোপন করেছিলেন।’ এ তথ্য ঠিক নয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মতিন, তোয়াহা, ইমাদুল্লাহ, জাহেদী, সুলতানদের হোস্টেলে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি, কাউকে কাউকে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে দেখেছি। জাহেদী তো সার্বক্ষণিক বাসিন্দা ডক্টরস ব্যারাকো। তা ছাড়া একসময় ছাত্র এলাকা মুক্ত এলাকা। ২৬ তারিখ থেকে শুরু চরম দমননীতি, মাইক জব্দ, স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংস এবং গ্রেপ্তার ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের নানান দিক নিয়ে ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুল তথ্যের পরিমাণ এত বেশি যে ছোটখাটো নিবন্ধে তা সম্পূর্ণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই শহীদ মিনার প্রসঙ্গেই লেখার ইতি টানছি। এক ভাষাসংগ্রামী বন্ধু লিখেছেন: ‘বাইশে ফেব্রুয়ারি রাত। মেডিকেল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্ররা...শহীদ মিনার গড়ে তুললেন।’ এ বিষয়ে অধিকতর ভুল তথ্য জাতীয় রাজনীতিতে পরিবেশিত। ভুল শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন প্রসঙ্গেও।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত ঐতিহাসিক বিষয় বায়ান্ন-ফেব্রুয়ারিতে জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কারাগারে অনশনের তারিখ এবং সেই আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা নিয়ে পরস্পরবিরোধী মতামত। এ বিতর্কের ধারাবাহিকতা স্বাধীনতা-উত্তরকালে পর্যন্ত গড়িয়েছে, কিন্তু বিতর্কের অবসান ঘটেনি। এ বিষয়ে জিল্লুর রহমানের সঙ্গে গাজীউল হকের যেমন ভিন্নমত, তেমনি ভিন্নমত তোয়াহার সঙ্গে খন্দকাল গোলাম মোস্তফার। কে জি মুস্তাফার বক্তব্যকে গাজীউল বলেছিলেন, ‘বানোয়াট গল্প’ (একুশের স্মৃতিচারণ, ১৯৮০, বাংলা একাডেমি)। আবার দীর্ঘ সময় পর গাজীউলই এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য পেশ করেছেন।

এভাবে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে বিভিন্নধর্মী উদ্দেশ্যের লাগাম পরানো ও বিস্মৃতিচারণার কারণে ইতিহাসের সত্য প্রশ্নবদ্ধ হয়েছে, যা কোনো ইতিহাসের ক্ষেত্রেই বাঞ্ছিত নয়। কিন্তু উল্লিখিত একাধিক কারণে ভুল, ত্রুটি ও বিতর্কের বাস্তবতা থেকে ইতিহাসকে মুক্ত করা যায়নি। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সর্বপ্রতিষ্ঠানগ্রাহ্য হয়ে ওঠে না বলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকে বিতর্কমুক্ত করতে সর্বজনগ্রাহ্য প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

প্যারিস ট্রাজেডি ও ভবিষ্যৎ বিশ্ব রাজনীতি

গত ১৩ নভেম্বর প্যারিসে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) জঙ্গিদের হাতে ১২৯ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যুর পর যে প্রশ্নটি এখন বিশ্ব মিডিয়ায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে, এর শেষ কোথায়? ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ওলান্দ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি নয়া যুদ্ধ শুরু করেছেন। এ যুদ্ধ বিশ্বকে কোথায় নিয়ে যাবে? মধ্যপ্রাচ্য কি আগামীতে চতুর্থ যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করবে? সারা বিশ্বের মিডিয়ায় এখন নানা প্রশ্ন, নানা জল্পনা-কল্পনা। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে বিশ্বের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলা। সারা বিশ্বের মানুষ সেদিন টিভির পর্দায় দেখেছিল কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে গেল টুইন টাওয়ার। সন্ত্রাসীরা সেদিন ৪টি বিমান হাইজ্যাক করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বিধ্বস্ত করিয়েছিল। ওই ঘটনার পরের ইতিহাস সবার জানা। আল কায়দা ও এর নেতা ওসামা বিন লাদেন টুইন টাওয়ার ধ্বংসের এবং কয়েক হাজার সাধারণ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী- এ অভিযোগ তুলে অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের বিমানবহর হামলা চালাল আফগানিস্তানে এবং দেশটি দখল করে নিল। দীর্ঘ ১৩ বছর যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ছিল। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে সরকারিভাবে আফগানিস্তান থেকে সব সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয়া হলেও সেখানে এখনও কিছু মার্কিন সেনা রয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, তাদের কাজ শুধু প্রশিক্ষণ দেয়া। এরপর ২০০৩ সালের মার্চ ইরাকের কাছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র রয়েছে- এই অভিযোগ তুলে যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নিল। প্রিয়মেটিভ স্ট্রাইকের তত্ত্বটি ব্যবহার করা হয়েছিল ইরাক আক্রমণের ক্ষেত্রে। এ তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, শত্রু আঘাত হানার আগেই তাকে ধ্বংস করে দেয়া। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে, ইরাকের কাছে কোনো মারণাস্ত্র ছিল না। ওই সময়ের ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্ল্যার সম্প্রতি স্বীকার করেছেন, ইরাক হামলা ভুল ছিল। বাস্তবতা হচ্ছে, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের আগে ইরাকি জনগণকে খাদ্য ও স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা দিলেও পুরো ইরাক ধ্বংস হয়ে গেছে। ইরাকি জ্বালানি তেলের ব্যাপারে আগ্রহ ছিল মার্কিনদের। আর ওই তেল বিক্রি করেই ইরাক পুনর্গঠনের কাজ পেয়েছিল মার্কিন কোম্পানিগুলো। এর পরের টার্গেট ছিল লিবিয়ার গাদ্দাফি। ২০১১ সালে গাদ্দাফিকে উৎখাত করা হল। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ইরাকি তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়নি। স্থলবাহিনীও সেখানে পাঠানো হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছিল হিউম্যানিটারিয়ান ইন্টারভেনশন তত্ত্ব, অর্থাৎ মানবাধিকার রক্ষায় হস্তক্ষেপ তত্ত্ব। গাদ্দাফির শাসনামলে সেখানে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে, এ অভিযোগ তুলে মার্কিন ও ফরাসি বিমান লিবিয়ায় হামলা চালাল এবং গাদ্দাফিকে হত্যা করা হল। এরপর চার বছর পেরিয়ে গেছে। লিবিয়া কার্যত এখন একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সেখানে কোনো সরকার নেই। মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে প্রতিদিন। লিবিয়া এখন সন্ত্রাসীদের রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে লিবিয়ার রাজনীতি। এরপর এলো রেসপন্সিবিলিটি টু প্রটেক্ট তত্ত্ব। এর মূল কথা হচ্ছে, মানবতা রক্ষায় বিশ্বশক্তির দায়িত্ব। সিরিয়ার ক্ষেত্রে এ তত্ত্বটি ব্যবহৃত হয়েছে। সিরিয়ায় আইএসের উত্থানের আগেই প্রেসিডেন্ট আসাদ ছিলেন মার্কিনদের পরবর্তী টার্গেট। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সাধারণ মানুষ হত্যার, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করার। তাই উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল আসাদকে উৎখাতের। একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল রেসপন্সিবিলিটি টু প্রটেক্ট তত্ত্ব। তবে এ ব্যাপারে কোনো চুক্তি হয়নি। ফলে এ তত্ত্ব কোনো আন্তর্জাতিক আইন হিসেবেও গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণত কোনো দেশে সামরিক আগ্রাসন চালাতে হলে নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। ইরাকের (২০০৩) ক্ষেত্রে কিংবা সিরিয়ার ক্ষেত্রে (২০১১) এ ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি নিরাপত্তা পরিষদ। সেখানে জন্ম হয় আইএস জঙ্গিগোষ্ঠীর, যারা এখন সিরিয়া ও ইরাকের একটা বিশাল অংশ দখল করে একটি তথাকথিত জিহাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। আসাদবিরোধী ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সিরিয়ান রেস্টোরেশনারি অ্যান্ড অপজিশন ফোর্সেস গঠিত হয়েছিল ২০১২ সালের নভেম্বরে দোহায়। ২০১৩ সালের জুলাইয়ে আহমেদ জারবা এ সংগঠনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল স্বাধীন একটি গণতান্ত্রিক সিরিয়া প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেখা গেল, আইএসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল কাউন্সিলের ভূমিকা সীমিত হয়ে গেছে। রাজনীতির দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় আইএসের জঙ্গিরা। তাদের নৃশংস কর্মকাণ্ড সারা বিশ্বের শোভাবুদ্ধির মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কারা আইএসকে সংগঠিত করেছে? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সিরিয়ায় আইএসের নাম প্রথম শোনা যায় ২০১৩ সালে। তখন সংগঠনটির নাম ছিল ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড লেভান্ট। এ এলাকার ঐতিহাসিক নাম লেভান্ট। জঙ্গিরা এ নামটি গ্রহণ করেছিল। পরে তারা নামটি পরিবর্তন করে। তবে ১৯৯১ সালে জামাত আল তওহিদ ওয়াল জিহাদ নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে মূলত এটি সংগঠিত হয়েছিল। পরে এরা আল কায়দা ইন ইরাক নাম ধারণ করে। এ সংগঠনটি মূলত সুন্নি প্রভাবাধীন ও সুন্নি সম্প্রদায়নির্ভর। ২০০৬ সালে ইরাকে সুন্নি প্রভাবাধীন মুজাহিদিন শূরা কাউন্সিলে সংগঠনটি যোগ দেয়। ২০১৩ সালে সারা বিশ্ব প্রথমবারের মতো আবু বকর বুগদাদির নাম জানতে পারো। ২০১৪ সালের ২৯ জুন বুগদাদি একটি খেলাফতের ডাক দিলে সংগঠনটি ব্যাপক পরিচিতি পায়। তখন সংগঠনটি নতুন নাম ধারণ করে ইসলামিক স্টেট বা আইএস। তবে আল কায়দার সঙ্গে সংগঠনটির সম্পর্ক কী তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। বলা হচ্ছে, ২০১৪ সালের জুন থেকে আইএসের সঙ্গে আল কায়দার কোনো সম্পর্ক নেই। আল কায়দার রাজনৈতিক দর্শন ও আইএসের রাজনীতির মাঝে কিছুটা

পার্কায় রয়েছে। দুটি সংগঠনই মূলত জিহাদি, সালাফি ও ওয়াহাবি মতবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়। আল কায়দা জিহাদি ও ওয়াহাবি মতবাদ অনুসরণ করলেও খেলাফতের কথা বলেনি কখনও। আইএস খেলাফতের কথা বলেছে। বুগদাদি নিজেকে খলিফা বা আমিরুল মুমিনিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন; কিন্তু আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেন যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেননি। বুগদাদি নিজেকে পুরো মুসলিম বিশ্বের নেতা বা খলিফা হিসেবে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে দাবি করেছেন, সব মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে এ খেলাফতের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করা। তিনি মুসলমানপ্রধান দেশগুলোকে নিয়ে এক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন। অপরদিকে আল কায়দার স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে ছোট ছোট আমিরাত প্রতিষ্ঠা করা। আল কায়দা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অপারেট করে। কিন্তু আইএস তা করে না। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, আল কায়দা ও আইএস- উভয় সংগঠনই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থার জন্ম দেয়া। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। এখানে তার স্বার্থ অনেক। স্বার্থ রয়েছে ফ্রান্সেরও। বাহরাইন ও কাতারে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে আমিরাত ও সাইপ্রাসে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে সস্তায় তেল পাওয়া যায়। এ তেলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের নির্ভরশীলতা অনেক বেশি। লিবিয়ার তেলের ওপর ৩টি পশ্চিমা দেশের নির্ভরশীলতা ইতিমধ্যে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ইতালির প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেলের ২৯ ভাগ আসে লিবিয়া থেকে। ফ্রান্স ও স্পেনের এ নির্ভরশীলতার হার যথাক্রমে ১৪ ও ১০ ভাগ। তারা চাইবে সস্তায় তেল নিতে। সিরিয়ায় খুব বেশি তেলসম্পদ নেই। কিন্তু এ তেলই এখন আইএসের জঙ্গিদের আয়ের অন্যতম উৎস। আইএস প্রতিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে ২৬ হাজার ব্যারেল তেল উত্তোলন করে। কালোবাজারে তা বিক্রি করে। এর মূল্য দেড় থেকে ২ মিলিয়ন ডলার। আর প্রতিদিনের তেল বিক্রির অর্থ জমা হচ্ছে আইএসের ফান্ডে। এ ফান্ড ব্যবহৃত হয় জঙ্গিদের মাসিক বেতন (৪৩০ থেকে ১ হাজার ডলার) এবং সেই সঙ্গে বিদেশে জঙ্গি তৎপরতার কাজে। যেমন, প্যারিসে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রায় ৫০ হাজার ডলার ব্যয় হয়েছে বলে একটি গোয়েন্দা সংস্থার ধারণা। কাকতালীয়ভাবে ২০০১ সালের টুইন টাওয়ার হামলার সঙ্গে প্যারিসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের অনেক মিল আছে। দীর্ঘ ১৪ বছর পরও টুইন টাওয়ার হামলার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি। কেন টুইন টাওয়ার হামলায় একজন ইহুদিও মারা গেল না, কারা অভিযুক্ত সৌদি নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, এর পেছনে কাদের আর্থিক স্বার্থ বেশি ছিল, একটা মুসলমানবিদ্বেষী মনোভাব তৈরি করে কারা লাভবান হয়েছে- এসব প্রশ্নের কোনো জবাব আমাদের জানা নেই। আমি যুগান্তরে ৯/১১ নিয়ে একাধিক লেখা লিখেছি। তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি, ৯/১১-এর ঘটনাবলী ছিল এটি বড় ধরনের ষড়যন্ত্রেরই ফল। আজ যখন ভিন্ন আঙ্গিকে প্যারিস ট্রাজেডি সংঘটিত হতে দেখি, তখন স্পষ্টতই আবারও সেই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের কথাই মনে পড়ে যায়। আল কায়দার চ্যাপ্টার এখন শেষ। ওসামা বিন লাদেন এখন ইতিহাস। রাজনীতির মঞ্চে এখন বুগদাদি আর ইসলামিক স্টেট। কে এই বুগদাদি, কারা আইএস তৈরি করল- এ নিয়ে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যারা গবেষণা করেন তারাও বলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের সৃষ্টি। টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মিশেল চসুদোভস্কি তো স্পষ্টই ইঙ্গিত করেছেন, প্যারিস ট্রাজেডি হচ্ছে ৯/১১-এর ফরাসি স্টাইল (Le 11 Septembre a la Francaise)। যারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য রাজনীতির কিছুটা খোঁজখবর রাখেন, তারা নিশ্চয়ই গ্রেটার মিডলইস্ট পলিসি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখেন। কয়েক বছর আগে একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ওয়েসলি ক্লার্ক ৭টি দেশের পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। ওই ৭টি দেশ হচ্ছে ইরান, সিরিয়া, লেবানন, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান ও ইরাক। ইতিমধ্যে লিবিয়া ও ইরাকে পরিবর্তন হয়েছে। সিরিয়া পরিবর্তনের পথে। ২০২০-পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে মানচিত্র আঁকতে হবে। সৌদি আরবের ভেঙে যাওয়া, ইয়েমেন, লিবিয়া ও ইরাক একাধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়া- এসবই এখন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে। আর সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যাবে, এ থেকে উপকৃত হচ্ছে একমাত্র ইসরাইল। এ ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রকারীদের যেমন প্রয়োজন ছিল ৯/১১-এর জন্ম দেয়ার, ঠিক তেমনি প্রয়োজন ছিল প্যারিস ট্রাজেডি সৃষ্টি করার। আরও একটা কারণে প্যারিস ট্রাজেডির প্রয়োজন ছিল। সামনে, অর্থাৎ ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। একজন কনজারভেটিভ, কটর, ইমিগ্রেশনবিরোধী রোনাল্ড ট্রাম্পের মতো প্রেসিডেন্ট সেখানে দরকার! হিলারির জনপ্রিয়তায় ধস নামানো প্রয়োজন! তাই প্যারিস ট্রাজেডি নিয়ে অনেক প্রশ্ন ও অনেক জিজ্ঞাসা থাকবেই। ৯/১১-এর ঘটনার রেশ এখন স্তিমিত হয়ে আসছে। তাই প্যারিস ট্রাজেডির প্রয়োজন ছিল। এর জের সারা বিশ্বকে টানতে হবে। নতুন করে মুসলমানবিরোধী একটা জনমত আবার ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় এখন বড় পরিবর্তন আসবে। এ মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সিরিয়া থেকে আসা অভিবাসীরা। যুক্তরাষ্ট্র ১০ হাজার সিরীয় অভিবাসী গ্রহণে রাজি হয়েছিল। এখন তাতে প্রতিবন্ধকতা আসবে। ইতিমধ্যে ১৪টি রাজ্য (যুক্তরাষ্ট্রের) সিরীয় শরণার্থী গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেসব সিরীয় শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছেন, তাদের এখন এক ধরনের বস্তির জীবনযাপনে বাধ্য করা হবে। সিরিয়া থেকে আইএস উৎখাতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এক ধরনের ঐকমত্যে পৌঁছেলেও চূড়ান্ত বিচারে এ ঐকমত্য কতদিন টিকে থাকবে- এটা একটা প্রশ্ন। এই ঐক্য সাময়িক। আসাদকে সিরিয়ায় ক্ষমতায় রাখার প্রশ্নে খুব শিগগিরই এ ঐক্যে ভাঙন ধরবে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইরান একটি ফ্যাক্টর। পারমাণবিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি ইরানকে এ অঞ্চলের ব্যাপারে একটা ভূমিকা রাখতে উৎসাহ জুগিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ সমঝোতা আদৌ ইসরাইলি স্বার্থে আঘাত করবে কি-না? সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। ইউরোপের মতো সুরক্ষিত দেশ ফ্রান্সে বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটল। এর আগে লন্ডন, মাদ্রিদেও সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে। আমাদের মতো দেশ এ থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আমাদের দেশে আইএস নেই বলে আমরা যেন আতুষ্টিতে না ভুগি। আইএস সমর্থকরা এ দেশে সক্রিয় হচ্ছে। প্যারিসের ঘটনা তাদের উৎসাহ জোগাতে পারে। তাই গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানো, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ লোকদের সমন্বয়ে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ফোর্স গঠন করা জরুরি। সর্বক্ষেত্রে মনিটরিং বাড়ানো প্রয়োজন। অনেক ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সবার বিচারও হয়নি। প্যারিস ট্রাজেডি আবার নতুন করে ইউরোপে ইসলাম ফোবিয়ার জন্ম দেবে। কিন্তু এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মূল হোতাদের খুঁজে বের করা যাবে- এ আশ্বাস রাখতে পারছি না। তবে নিঃসন্দেহে প্যারিস ট্রাজেডি থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

বাংলাদেশ বড় ধরনের ভারতীয় পানি আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বাংলাদেশের মানুষ যখন গঙ্গার পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তখন নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তিস্তার পানি না পাওয়া এবং টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ৭ মে, ২০০৯ সংবাদপত্রের খবর, রাজশাহীর কাছে পদ্মা নদীর প্রবাহ বন্ধ হওয়ার পথে এ অঞ্চলের পানির অন্যতম প্রধান উৎস পদ্মা নদী এখন শুধু বালুচরা কোথাও কোথাও হচ্ছে শস্য চাষা চরছে গবাদি পশু। ১৯৯৬ সালের পানি চুক্তি অনুযায়ী ভারত ফারাক্কা পয়েন্ট দিয়ে প্রয়োজনীয় পানি ছাড় না করায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে রংপুর থেকে পাঠানো অপর এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে ‘তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে প্রতিবেশী ভারতের অনৈতিক টিলেমি, হঠকারিতা ও একগুয়েমির ফলে এ নদীর বাংলাদেশ অংশ জুড়ে এখন মরুভূমির প্রতিচ্ছবি। একই সাথে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি করেছে অশনি সংকেত।

ভারতের ‘পানি আগ্রাসন’ বুঝতে এ দুটি সংবাদই যথেষ্ট। বাংলাদেশ আজ ভারতের পানি আগ্রাসনের সম্মুখীন। বাংলাদেশকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে ভারত। ভারতের এ ‘পানি আগ্রাসন’ একদিকে যেমন বাংলাদেশকে বঞ্চিত করছে তার ন্যায্য অধিকার থেকে, অন্যদিকে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ভারত বাংলাদেশকে ‘চাপ’ এর মুখে রেখে তাদের স্বার্থ আদায় করে নিতে চাইছে। ভারতের এ সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় সহযোগিতা করছে বিশ্বব্যাংক ও এডিবিতে কর্মরত কিছু ভারতীয় বংশদ্ভূত কর্মকর্তা। কিন্তু বাংলাদেশের পানি সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী নয় ভারত। ভারত বাংলাদেশের এই ‘জীবন মরণ সমস্যা’ কে কোনদিন সমস্যা হিসেবে দেখেনি। বরং উপহাস করেছে। যেখানে সার্ক এর আওতায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধানের একটি উদ্যোগ নেয়া যেতো, সেখানে তা না করে সমস্যাটিকে ‘জিইয়ে’ রেখে ভারত তার স্বার্থ উদ্ধার করে নিতে চায়।

বাংলাদেশে প্রবাহিত অধিকাংশ নদীর উৎসস্থল হচ্ছে ভারত। ভারত হয়ে বাংলাদেশে প্রবাহমান নদীর সংখ্যা ৫৪টি। ভারত শুধুমাত্র গঙ্গার পানিই এককভাবে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে না, বরং ব্রহ্মপুত্র ও তিস্তার পানিও প্রত্যাহার করে নিতে চাইছে। ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার মাধ্যমে ভারত ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করে নেবে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য হবে এক বড় ধরনের হুমকি। আর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ কাজ শেষ হলে, বৃহত্তর সিলেট অঞ্চল পরিণত হবে মরুভূমিতে। ভারতের এ ‘পানি আগ্রাসন’ আজ বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে বড় ধরনের ঝুঁকির মাঝে ঠেলে দিয়েছে। ভারত আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে বাংলাদেশকে তার পানির ন্যায্য পাওনা থেকে শুধু বঞ্চিতই করছে না, বরং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার এক গভীর যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

✧ গঙ্গা পানি চুক্তি

গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী। গঙ্গার উৎপত্তি হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ ঢালে ২৩ হাজার ফুট উচ্চতায় দক্ষিণ পূর্ব ও তারপর পূর্ব দিকে। ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রায় এক হাজার মাইল অতিক্রম করে গঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চীন, নেপাল ও ভারতের হিমালয় অঞ্চল থেকে কয়েকটি উপনদী উত্তর দিক থেকে গঙ্গায় পড়েছে। বলা ভালো, গঙ্গার পাশাপাশি ব্রহ্মপুত্র চীন, ভারত ও বাংলাদেশ এবং মেঘনা ভারত ও বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশে স্বাদুপানির যে নদীপ্রবাহ বিদ্যমান, তা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নদীপ্রবাহ। গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে দু’দুটো চুক্তি হয়েছে। একটি ১৯৭৭ সালে, অপরটি ১৯৯৬ সালে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর আরো কেটে গেছে ১২ বছর। কিন্তু আমরা কী পেয়েছি? ২০০৬ কিংবা ২০০৮ সালে বাংলাদেশ কী পরিমাণ পানি পেয়েছে, তার হিসাব না হয় বাদই দিলাম। ২০০৮ সালের পানির হিসাব যদি পরিসংখ্যান দেই, তা কোন আশার কথা বলেনা। গঙ্গার পানি চুক্তি কার্যত এখন অকার্যকর। চুক্তি করে বাংলাদেশ কখনই লাভবান হয়নি এবং আগামীতে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

✧ আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

গঙ্গার তথাকথিত পানি চুক্তি যখন বাংলাদেশকে তার পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে, ঠিক তখনই ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রকল্প খোদ ভারতেই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এই বিশাল নদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে ভারতের অভ্যন্তরে ৩৭টি নদীকে ৯ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ৩১টি খালের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করে ১৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করার জন্য। প্রকল্পটির মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে যাওয়া হবে গঙ্গায়। সেখান থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে মহানন্দ এবং গোদাবরিতে। গোদাবরির পানি নিয়ে যাওয়া হবে কৃষ্ণায় এবং সেখানে থেকে পেনার এবং কাবেরীতে। নর্মদার পানি নিয়ে যাওয়া হবে সবরমতিতে। এই বিশাল আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হবে ২০০৬ সালের মধ্যে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের ওপর মারাত্মক আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থায় ভয়াবহ প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। এ প্রকল্পে বাংলাদেশের যেসব ক্ষতি হতে পারে তা নিম্নরূপ: ১. ভাটরা-বাংলাদেশ সীমান্তে বর্তমানে

পাওয়া প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দীর্ঘদিন ধরে পাওয়া পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে, ২. বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে তার মিঠা পানির মোট ৮৫ শতাংশই ব্রহ্মপুত্র এবং গঙ্গা নদী থেকে পায়া এককভাবে ব্রহ্মপুত্র থেকেই পাওয়া যায় মোট প্রয়োজনের ৬৫ শতাংশ পানি। সুতরাং ভারতের পরিকল্পনামত পানি প্রত্যাহার করা হলে তা আমাদের দেশের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনবে, ৩. ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নেতিবাচক প্রক্রিয়া হবে। ভূ-উপরিস্থ পানি কমে গেলে ভূ-গর্ভস্থ পানি বেশি পরিমাণে উত্তোলন করা হবে এবং এতে আসেনিক সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করবে, ৪. মিঠা পানির মাছের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং জলপথে পরিবহন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ৫. পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কোনো কৃষি প্রকল্প হাতে নিতে পারবে না। পানির অভাবে কৃষি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ৬. পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আরও আশংকা করছেন দূষিত নদীগুলোর পানি অপেক্ষাকৃত দূষণমুক্ত অন্য নদীগুলোর পানিকেও দূষিত করে তুলবে। বর্তমানে পরিবেশ দূষণের শিকার নদীগুলোর পানি অপেক্ষাকৃত দূষণমুক্ত অন্য নদীগুলোর পানিকেও দূষিত করে তুলবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গঙ্গার দূষিত পানি অন্য নদীর পানিকে দূষিত করে তুলবে। বর্তমানে পরিবেশ দূষণের শিকার নদীগুলোর পানি অন্য নদীগুলোতে মেশালে এ অঞ্চলের পরিবেশ দূষিত হবে, ৭. এসবের চেয়েও মারাত্মক বিষয় হচ্ছে প্রকল্পে নির্মিতব্য বড় বড় বাঁধ গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

✧ টিপাইমুখ বাঁধ

বাংলাদেশের জন্য আরেকটি দুঃখজনক খবর হচ্ছে টিপাইমুখ বাঁধ। বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় ধরনের আতঙ্কেরা। ভারতের টিপাইমুখ হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টে যে হাই ড্যাম নির্মাণ করা হবে তার উচ্চতা ১৬২ দশমিক ৮ মিটার। এর পানি ধারণ ক্ষমতা ১৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০ মেগাওয়াট। এটি নির্মিত হবে প্রায় বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে, আসামের করিমগঞ্জে বরাক নদীর ওপর। এ বরাক নদী হচ্ছে সুরমা ও কুশিয়ারার মূল ধারা। সুরমা ও কুশিয়ারা পরে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে আমাদের বিশাল মেঘনা। ইতোমধ্যে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করায় মরে যাচ্ছে প্রমত্তা সুরমা। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের সুরমা নদীর পানি প্রবাহ গত ১০ বছরে শতকরা ৮০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, ভারতের বরাক নদী বাংলাদেশের সুরমা, কুশিয়ারা অমলশীদে এসে মিলিত হয়েছে। বরাক, সুরমা ও কুশিয়ারা এ তিন নদীর মিলনস্থল অমলশীদ এক সময় অনেক গভীর ছিল। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমান অনুযায়ী, বর্তমান শুষ্ক মৌসুমে বরাক নদী থেকে প্রতি সেকেন্ডে কমপক্ষে ৮৩ দশমিক ৫৯ ঘনমিটার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ পাঁচ বছর আগে এ প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৩০০ ঘনমিটার। পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্ষা মৌসুমে ভাঙ্গন রোধে বরাক নদীর দুই তীরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ধীরে ধীরে সুরমা নদীর প্রধান প্রবাহ কুশিয়ারার দিকে ঘুরে গেছে। এতে বলা হয়, সুরমার ভাটিতে কমপক্ষে তিন কিলোমিটার মরে গেছে।

✧ বাংলাদেশের পানির হিস্যা ও আন্তর্জাতিক পানি ব্যবহারের আইনগত দিক

আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একটি নদী যদি ২/৩ টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাহলে ঐ নদীর পানি সম্পদের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যে কোন আন্তর্জাতিক নদীর উপর তীরবর্তী রাষ্ট্রের অধিকার সমঅংশীদারিত্বের নীতির উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক নদী সম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুসম বন্টনের নীতি আজ স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক নদীর ব্যবহার সম্পর্কে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলন ও ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক দানিযুব নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইনে এই নীতির উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ২১৪টি নদী রয়েছে যে নদীগুলো একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। মোট ৯টি নদীর কথা জানা যায়, যা ৬টি বা ততোধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এসব নদী হচ্ছে- দানিযুব, নাইজার, নীল, জায়ার, রাইন, জাম্বুজী, আমাজন, লেকচাদ ও মেকং। এক্ষেত্রে কোন একটি একক দেশই এ পানি সম্পদ ভোগ করেনি।

মেকং নদী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মোট ৬টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই দেশগুলো হচ্ছে লাওস, থাইল্যান্ড, চীন, কম্পুচিয়া, ভিয়েতনাম ও বার্মা বা মায়ানমার। এ দেশগুলোর মধ্যে বৈরিতা দীর্ঘদিনের। রাজনৈতিক ব্যবস্থাও ভিন্ন। কিন্তু তবুও দেশগুলো মেকং নদীর পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের একটি সমঝোতায় উপনীত হয়েছিল। নিজ দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত অংশের ভিত্তিতেই পানির ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছিল। রিওগ্রানডো ও কালোরাডো নদী মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এ দু'টি নদীর পানির ব্যবহার নিয়েও দেশ দুটোর মধ্যে বিরোধ ছিল। কিন্তু বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে তারা পানির হিস্যা নির্ধারণ করেছে। ভারত যে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নিয়েছে, আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে এ ধরনের প্রকল্প অবৈধ। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের সবক'টি নদীই আন্তর্জাতিক নদী। তাই এসব নদীর একতরফা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পানি প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বেআইনি এবং অগ্রহণযোগ্য।

আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির হেলসিংকি নীতিমালার ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি অববাহিকাত্ত্ব রাষ্ট্র, অভিন্ন নদীসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেবে এবং তা অবশ্যই অন্য

রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি না করে করেই হতে হবে। ১৯৯২ সালের ডাবলিন নীতিমালার ২ নং নীতিতে বলা হয়েছে, পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সবার অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। কিন্তু আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভারত একটি অস্বচ্ছ ও স্বৈচ্ছাচারমূলক পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহ কনভেনশনের ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহে পানি তার নিজের ভৌগোলিক এলাকায় যুক্তি ও ন্যায্যপরায়ণতার সঙ্গে ব্যবহার করবে। এছাড়া ভারত এ প্রকল্পের মাধ্যমে জলপ্রবাহ কনভেনশনের আরও কিছু বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন করেছে যেমন-১. প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহের পানি ব্যবহার করার সময় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর যাতে কোন বড় ধরনের ক্ষতি না হয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; (অনুচ্ছেদ-৭(১))। ২. জলপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌম ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, পারস্পরিক সুবিধা লাভ এবং সংস্থাসংক্রান্ত ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহের সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেবে (অনুচ্ছেদ-৮); ৩. রাষ্ট্রসমূহ নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত বিনিময় করবে (অনুচ্ছেদ-৯ (১)); ৪. অপর রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন প্রকল্প গ্রহণের আগে অবশ্যই তাকে সময়মত অবহিত করতে হবে। ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, টিপাইমুখী বাঁধ কিংবা গঙ্গার পানি প্রত্যাহার আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনেরও সুস্পষ্ট লংঘন। জীববৈচিত্র্য কনভেনশনের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে কোন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগেই জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন প্রতিটি প্রকল্পের পরিবশগত প্রভাব নিরূপণ করতে হবে। কিন্তু ভারতের প্রস্তাবিত প্রকল্পের কোন বিস্তারিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রক্রিয়ার কথা শোনা যায়নি। আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষভাবে জলজ প্রাণীর আবাসভূমি হিসেবে ব্যবহৃত জলাভূমি বিষয়ক কনভেনশনের (রামসার কনভেনশন) ৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে কনভেনশন উদ্ভূত বাধ্যবাধকতা বাস্তবায়নে রাষ্ট্রসমূহ পরস্পর পরামর্শ করবে এবং একই সঙ্গে জলাভূমির এবং সেখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহের সংরক্ষণের স্বার্থে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নীতিমালা ও বিধিবিধান প্রণয়ন করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত একতরফা পানি প্রত্যাহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের জলাভূমিগুলোকে ধ্বংস করার ব্যবস্থা নিচ্ছে, যা এ কনভেনশনের সুস্পষ্ট লংঘন।

✧ বাংলাদেশের ক্ষতি

ভারতের ‘পানি রাজনীতি’ তথা বাংলাদেশকে তার ন্যায্য ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গঙ্গা থেকে পানি প্রত্যাহার ও টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করায় বাংলাদেশ এক বড় ধরনের পরিবেশ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। নদী ব্যবস্থায় এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন। পলি পড়ে উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং উজানে পানি প্রত্যাহারের কারণে দেশের ২০টি নদী ইতোমধ্যে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এর মধ্যে ১৩টি মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। কার্যত এগুলো এখন মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে পানির অভাবে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে, তা নীচের একটি পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে। ১. উত্তরাঞ্চলে প্রায় ২ কোটি মানুষ সেচের পানির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে; ২. দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ৪ কোটি মানুষ ও এক-তৃতীয়াংশ এলাকা সেচের পানির অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; ৪. গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের ৬৫ শতাংশ এলাকায় সেচ দেয়া সম্ভব নয়; ৫. অতিরিক্ত লবণাক্ততার জন্য জমির উর্বরা শক্তি কমে গেছে; ৬. দেশের প্রায় ২১ শতাংশ অগভীর নলকূপ ও ৪২ শতাংশ গভীর নলকূপ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না; ৭. গঙ্গার পানি চুক্তির (১৯৯৬) পর বাংলাদেশে গঙ্গার পানির অংশ দাঁড়িয়েছে সেকেন্ডে ২০ হাজার ঘনফুটের কম। অথচ ফারাক্কা বাঁধ চালুর আগে শুষ্ক মৌসুমেও বাংলাদেশ ৭০ হাজার কিউসেকের চেয়ে কম পেতো না; ৮. প্রায় ১৫০০ কি.মি. নৌ পথ বন্ধ হয়ে গেছে; ৯. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় হাজার হাজার হস্তচালিত পাম্প অকেজো হয়ে গেছে; ১০. ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের বিষাক্ত প্রভাবে পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় টিউবওয়েলের পানি খাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে; ১১. বৃহত্তর খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় প্রচলিত ধান উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে; ১৩. মাছের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে; ১৪. লবণাক্ততার কারণে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের প্রায় ১৭ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এক সমীক্ষায় উল্লেখ করেছে যে ফারাক্কায় বাঁধ দেয়ার কারণে বাংলাদেশের প্রায় ৯৩ হাজার ৩০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যেক বছরে লোকসানের পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

✧ সমাধান কোন পথে

ভারতীয় পানি আগ্রাসন যে বাংলাদেশকে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশ যদি আগামী ২০ বছর পরের পরিস্থিতি চিন্তা করে এখনই একটি সুদূরপ্রসারী পকিদ্ধনা গ্রহণ না করে, তাহলে এ দেশ ২০৩০ সালে দিকে বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পানি সংকট পারমাণবিক সঙ্কটের ভয়াবহতাকেও ম্লান করে দেবে। পানির অভাবে এ দেশে বড় ধরনের সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হবে, যা পার্শ্ববর্তী দেশকেও আক্রান্ত করতে পারে। তাই সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে তাদের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করতে হবো। ভারতেও পানির সঙ্কট হয়েছে, এটা অস্বীকার করা যাবে না। উভয় দেশের এই যে সঙ্কট, তার সমাধান করতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা রেখে এবং বহুপাক্ষিক সমঝোতার

ভিত্তিতে পানি সমস্যা দ্বিপাক্ষিকভাবে সমাধান করা যাবে না। নেপাল জলাধার নির্মাণ করে হিমালয়ের পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা গেলে শুকনো মৌসুমে ফারাক্কা পানি প্রবাহ ১ লাখ ৩০ হাজার কিউসেক থেকে ১ লাখ ৯০ হাজার কিউসেক পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাতে করে বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ই লাভবান হবে। তাছাড়া জলাধারের সাহায্যে নেপাল প্রতি বছর প্রায় সাড়ে দশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম, যা নেপাল বাংলাদেশেও রফতানি করতে পারবে। ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৭ সালে, অর্থাৎ ১৯৭৭ সাল থেকে ৫০ বছর পর। এ ৫০ বছরে জনসংখ্যা বাড়বে তিনগুণ। মোটামুটি হিসাবে পানির প্রয়োজনও বাড়বে তিনগুণ। কিন্তু ১৯৭৭ সালে আমরা যে পানি পেয়েছিলাম, ৫০ বছর পর পর্যন্ত পেতে থাকবো তার থেকে কমা আরো একটি কথা -বিশ্বব্যাংক প্রণীত 'বাংলাদেশ কান্ট্রি ওয়াটার রিসোর্সেস এসিস্ট্যান্স' নামে একটি ধারণাপত্রের কথা শোনা গিয়েছিল দু' বছর আগে। তথাকথিক এ অঞ্চলের পানি উন্নয়নের নামে এ ধারণাপত্র তৈরী করা হয়েছিল। ওই ধারণাপত্রে গঙ্গার পানি প্রবাহের অপ্রতুলতাকে স্বীকার করে ব্রহ্মপুত্রের পানির ওপর ভিত্তি করে পানি উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এটি মূলত ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনাকেই সমর্থন করে। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের এ ধারণাপত্র সমর্থন করতে পারে না। গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে যেমনি আগামিতেও আলোচনা হবে, তেমনি ব্রহ্মপুত্রকে কেন্দ্র করেও আলোচনা হতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা পানির অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ন্যূনতম ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে। আমি ২০৩০ সালকে সামনে রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদি পানি পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তাব রাখছি। সেই সাথে আন্তর্জাতিক নদীর পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের স্বার্থে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও চীনের পানি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পানি ফোরাম গঠনেরও প্রস্তাব করছি। একই সাথে সার্ক সনদে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা বিষয়টি সংযুক্ত করা দাবি করছি। মনে রাখতে হবে পানি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এ নিরাপত্তা যাতে বিধিভেদ না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

ইরান সমঝোতা ও উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতি

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ব্যাপারে ভিয়েনায় ইরানের সঙ্গে ৬ জাতির সমঝোতা এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অন্যতম একটি আলোচিত বিষয়। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে উপসাগরীয় অঞ্চলে আরেকটি যুদ্ধ এড়ানো গেছে বটে কিন্তু রেখে গেছে বিভিন্ন প্রশ্ন। এ চুক্তি যে উপসাগরীয় অঞ্চলের রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। শুধু তা-ই নয়, এ অঞ্চলের রাজনীতিতে তা গুণগত এক পরিবর্তনও ডেকে আনতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের জন্যও এ ধরনের একটি চুক্তির প্রয়োজন ছিল। এমনিতেই সিরিয়ায় জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে এক ধরনের 'যুদ্ধ' শুরু করে ওবামা প্রশাসন। সেখানে কোনো 'বিজয়' নিশ্চিত করতে পারেনি। এমন এক পরিস্থিতিতে ইরানের পরমাণু প্রকল্পে বিমান হামলা চালিয়ে এবং তা ধ্বংস করে দিয়ে ওবামা প্রশাসন উপসাগরীয় অঞ্চলে আরেকটি 'ফ্রন্ট' ওপেন করতে চায়নি। ফলে ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতা প্রয়োজন ছিল। ইরানের পারমাণবিক প্রকল্প নিয়ে যে সমঝোতা হয়েছে, এতে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে দেখা যায়। ১. আগামী ১০ বছরের মধ্যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে পারবে না। তাদের পরমাণুকে চলেবে নজরদারি। ২. অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকছে। ৩. তেহরান শর্ত ভাঙলে ৬৫ দিনের মধ্যে ফের কিছু নিষেধাজ্ঞা বহাল হবে। ৪. ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে কতটা এগিয়েছে, তা তদন্ত করবে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আইএইএ। ৫. ফের আইএইএ ইরান বিরোধ হলে তা মেটাবে সালিশি বোর্ড। এ চুক্তির পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইরানের যে সম্পদ জব্দ করা হয়েছিল, তা ইরানকে ফেরত দেওয়া হবে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার ফলে ইরান তার যাত্রীবাহী বিমান সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানি করতে পারবে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ১০ বছর পর ইরান তার পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে আরও গবেষণা ও উন্নয়নের কাজ করতে পারবে। নিঃসন্দেহে এ অঞ্চলের রাজনীতির জন্য এ চুক্তি আপাতত উত্তেজনা হ্রাস করতে সাহায্য করবে। ওবামা প্রশাসনের ওপর ইসরায়েলি প্রশাসনের প্রচ- একটা 'চাপ' থাকা সত্ত্বেও ওবামা প্রশাসন ওই ধরনের শর্তে রাজি হয়েছিলেন। ফলে আলোচনায় বাকি বৃহৎ শক্তিগুলোও রাজি হয়ে যায়। ওবামার জন্য একটি প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট কাটার এবং প্রায় ১০০ সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওবামাকে সমর্থন করেছেন। কংগ্রেস সদস্যদের বিরোধিতার মুখে ওবামা এটিও জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেস যদি এই সমঝোতা প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি 'ভেটো' দেবেন। অর্থাৎ তিনি চান কংগ্রেস এ চুক্তি অনুমোদন করুক। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলেও এখনই কার্যকর হচ্ছে না। বেশ কয়েকটি দেশের সংসদে এ চুক্তি অনুমোদিত হতে হবে। মার্কিন কংগ্রেস, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের পাশাপাশি ইরানের পার্লামেন্টে এটি অনুমোদিত হতে হবে। না হলে এটি অকার্যকর হয়ে যাবে। ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রসহ ৬ জাতির যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেটিকে 'ঐতিহাসিক'ভাবে আখ্যায়িত করা হলেও চুক্তিটির ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অবশ্যই মার্কিন কংগ্রেসে এ চুক্তি অনুমোদিত হতে হবে। না হলে চুক্তিটির কার্যকারিতা থাকবে না। কংগ্রেসের উভয়কক্ষ, সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ এখন ওবামাবিরোধী রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের কেউ কেউ এরই মধ্যে এ চুক্তির মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন। ওবামার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমর্থকরা সবাই যে খুশি, তাও তাদের কারও কারও মন্তব্যে মনে হয়নি। বলা ভালো, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে অন্যতম একটি ফ্যাক্টর হচ্ছে ইসরায়েল। চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু মন্তব্য করেছেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক ভুল'। ইসরায়েলের নীতিনির্ধারকদের কেউ কেউ চুক্তির কোনো কোনো ধারা নিয়ে সমালোচনা করেছেন। ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা ওই চুক্তির প্রশংসা এবং ইরানি প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এই চুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে বলে মন্তব্য করলেও ঈশান কোণে একটি 'কালো মেঘ' থাকলই। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরি করছেন। এই অভিযোগ তুলে ২০০৬ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের ইউরোপিয়ান সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি বাতিল করার দাবি সংবলিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এরপর অন্তত এ সংক্রান্ত আরও ছয়টি প্রস্তাব পরে গ্রহণ করা হয়েছে।

এবং ইরান ওই কর্মসূচি বাতিল না করায় ২০১০ সালে ইরানের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানার সম্পদ জব্দসহ দেশটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবরোধ এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে জাতিসংঘ। তবে ২০০৬ সাল থেকেই ইরানের সঙ্গে ৬ জাতি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জার্মানি) আলোচনা চলে আসছিল। এতে কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু ২০১৩ সালে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উদারপন্থী হিসেবে পরিচিত হাসান রুহানি বিজয়ী হলে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ইরানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। ফলে এই ৬ জাতি আলোচনা আরও গতি পায়। গত বছরের নভেম্বরে একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং এপ্রিলে (২০১৫) সুইজারল্যান্ডের লুজানে একটি খসড়া চুক্তিতে ইরান ও ৬ জাতি উপনীত হয়। গত ৩০ জুনের মধ্যে ওই খসড়া চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা ছিল। তা হয়নি। এখন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো। এ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে অন্তত একটি জিনিস স্পষ্ট হলো। তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক বৃদ্ধির একটি সম্ভাবনা। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এ সম্পর্ক আরও উন্নত করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ, প্রশাসন, সেনাবাহিনীতে এখনো ১৯৭৯ সালের ইরান বিপ্লবের পর দীর্ঘ ৪৪৪ দিন রেভলিউশনারি স্টুডেন্টস কর্তৃক তেহরানের মার্কিন দূতাবাস দখল করে নেওয়ার ঘটনার স্মৃতি একটি ‘ক্ষতচিহ্ন’ হিসেবে রয়ে গেছে। ফলে সম্পর্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনাটা অত সহজ ছিল না। এরপর যোগ হয় ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ওই ঘটনার দীর্ঘ ৩৬ বছর পর মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি এই দেশ দুটিকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। তাই এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো যুক্তরাষ্ট্রের ‘বন্ধ’ ইসরায়েলের আপত্তি সত্ত্বেও। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিস্টরা মনে করেন। মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে ইরাক-সিরিয়ায় জঙ্গিবাদী ইসলামিক স্টেটের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে হলে তাদের ইরানের সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। অনেকের স্মরণ থাকার কথা, গত নভেম্বরে (২০১৪) বারাক ওবামা স্বীকার করেছিলেন, তিনি গোপনে ইরানি সমর্থন চেয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। প্রতিউত্তরে খামেনিও তাকে একটি গোপন চিঠি পাঠিয়েছিলেন। আইএস জঙ্গিদের ঠেকাতে খামেনির সমর্থন চেয়েছিলেন ওবামা। পরে ইয়েমেনে ‘কুলি বিদ্রোহ’ প্রমাণ করল, এখানেও একটি স্থিতিশীল সরকার গঠনে ইরানের সমর্থন প্রয়োজন রয়েছে। কেননা হুতরা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অভিযোগ আছে, হুতি বিদ্রোহীরা ইরান থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য পেয়ে থাকে। অবশ্য ইরান বারবার তা অস্বীকার করে আসছে। এখন ‘ইরান চুক্তি’ স্বাক্ষরিত হওয়ায় সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক আরও স্বাভাবিক হবে এবং যুক্তরাষ্ট্র এটিই চাইছে। পারস্যীয় অঞ্চলের রাজনীতিতে একটি সৌদি-ইরান জোট একটি বড় ভূমিকা পালন করুক। এটি চাইবেন মার্কিন স্ট্র্যাটেজিস্টরা। কেননা ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহে সেখানে সরকারের পতন ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর মার্চে সৌদি বিমান হুতি বিদ্রোহী ঘাঁটিতে বোমা হামলা চালালেও সেখানে স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। এখন সৌদি-ইরান একটি ‘সমঝোতা’ সেখানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সাহায্য করবে। একই কথা প্রযোজ্য সিরিয়ার ক্ষেত্রেও। সেখানে একদিকে যেমনই আসাদবিরোধীরা (যাদের যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক ও সামরিকভাবে সাহায্য করছে) প্রেসিডেন্ট আসাদকে উৎখাতের জন্য ‘যুদ্ধ’ করছে, অন্যদিকে তেমনি আইএসএর জঙ্গিরা সিরিয়ার ভেতরে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা আরও সম্প্রসারিত করছে। এক্ষেত্রে মার্কিন সমরনায়করা মনে করেন, সৌদি-ইরান ‘সমঝোতা’ সিরিয়ায়ও একটি ‘ঐকমত্যের সরকার’-এর জন্ম দিতে পারে। উপরন্তু লেবাননে ইরানি প্রভাব এখন কমে যেতে পারে। তা সৌদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য কোনো হুমকি সৃষ্টি করবে না। তবে নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এখানে উল্লেখ করার মতো। যুক্তরাষ্ট্র যদি ‘ইরান চুক্তি’র পরও সৌদি আরবের সঙ্গে ইরানের বিরোধ জিইয়ে রাখে, তাহলে এ অঞ্চলে আইএসএর প্রভাব ও কর্তৃত্ব বাড়বে। ১০৭ পৃষ্ঠাব্যাপী ‘ইরান চুক্তি’তে ইরানের করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। তবে চুক্তির দুটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, চুক্তিতে ইরানের পরমাণু তৎপরতা কমিয়ে আনা হবে এবং পূর্ণ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণে থাকবে ইরানের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। ইরান কোনো কোনো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অন্য দেশে স্থানান্তরিত করবে এবং আগামীতে নতুন কোনো পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে না। দ্বিতীয়ত, ইরানের ওপর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ধীরে ধীরে শিথিল করা হবে। তবে ইরানের ওপর থেকে অস্ত্র রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা আপাতত তুলে নেওয়া হচ্ছে না। এখন ইরানের ওপর থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে ইরান এ অঞ্চলে অন্যতম একটি অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে। ইরানে বিনিয়োগ বাড়বে, বিশেষ করে ইরানের গ্যাস ও তেল সেক্টরে বিনিয়োগ বাড়বে। তবে অনেক বিষয়ের ওপর এ চুক্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। ইসরায়েলের বিরোধিতা ও মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের আপত্তির মুখে এ চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। অবশ্য ইরানে ব্যাপকভাবে এ চুক্তিটি প্রশংসিত হয়েছে এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি এ চুক্তিটি সমর্থন করেছেন। এ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে গেল, চুক্তির ব্যাপারে ইরানের প্রেসিডেন্ট রুহানির স্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও তিনি খামেনির পরামর্শ ছাড়া এদিকে অগ্রসর হননি। এটিই হচ্ছে বাস্তববাদী নীতি। দীর্ঘ ৩৬ বছর ইরান আন্তর্জাতিক আসরে একা। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণে ইরান বিশ্বে একা হয়ে গিয়েছিল। ইরানের বৈদেশিক আয়ের বড় উৎস পেট্রোলিয়াম সেক্টরে কোনো বিনিয়োগ আসছিল না, এমনকি ইরান তেল রপ্তানি করতেও পারছিল না। এ জন্যই ইরানিদের প্রয়োজন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন। কটর শিয়া ধর্মীয় ভাবধারায় বিশ্বাসী ইরানি ধর্মীয় নেতারা এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এটিই হচ্ছে বাস্তববাদী নীতির মূল কথা। ২০১৬ সালে ইরানের পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমার বিশ্বাস, ওই নির্বাচনে রুহানি সমর্থকরা বিজয়ী হবেন। একই সঙ্গে ২০১৭ সালে ইরানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। ওই নির্বাচনে রুহানির দ্বিতীয়বারের মতো বিজয়ী হওয়ার পথও প্রশস্ত হবে। ইসরায়েলের বিরোধিতার কারণে মার্কিন কংগ্রেসে ওই চুক্তির বিরোধিতা রয়েছে। ২০১৬ সালের নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ওই ইরান ইস্যু কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের ‘সহজ বিজয়’ একটি বড় অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। রিপাবলিকানদের অবস্থান এতে শক্তিশালী হবে। অবশ্য হিলারি ক্লিনটন স্পষ্ট করেই বলেছেন, তিনি কোনো অবস্থাতেই ইরানকে পারমাণবিক বোমা বানাতে দেবেন না। মার্কিনীদের জন্য একটি সুযোগ এসেছে উপসাগরীয় অঞ্চলে এক ধরনের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে। ‘যুদ্ধবাজ’ মার্কিন প্রশাসন যদি ওই ‘সম্ভাবনা’ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেখানে যুদ্ধ আরও প্রলম্বিত হবে। ইরান চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইরানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক রামিন জাহানবেগলু (জখসরহ শুধযখনবমষডড) একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির মেরুকরণে এ মুহূর্তে ইরান একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ’। এটিই হচ্ছে মোদা কথা। ইরানকে ছাড়া যে উপসাগর তথা মধ্যপ্রাচ্যে একটি স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত

করা যাবে না, এটি প্রমাণিত হয়েছে। এখন দেখার পালা, মার্কিননীতিতে ওই পরিবর্তনটি কীভাবে প্রতিফলিত হয়। অনেকেই স্বরণ করতে পারেন, ১৯৭৯ সালের ইরান বিপ্লবের আগে অর্থাৎ রেজা শাহ পাহলভির শাসন আমলে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে যে মার্কিননীতি, এর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ইরান। ইরানকে সঙ্গে নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু ওই দৃশ্যপট বদলে যায় ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর। এখন নতুন আঙ্গিকে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ওই পুরনো বৃত্তে ফিরে যাচ্ছে কি না, সেটিই দেখার বিষয়..

গ্রিসের পরিস্থিতি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ

গ্রিসের পরিস্থিতি এখন কোন দিকে? গ্রিসের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় শেষ পর্যন্ত কিছু শর্তসাপেক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা পুনরায় গ্রিসকে ঋণ দিয়েছেন। কিন্তু গ্রিসের সিপ্রাস সরকারের এ ঋণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে গ্রিসে বড় ধরনের বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। দলের অভ্যন্তরে বড় ধরনের এক বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছেন সিপ্রাস। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। তার কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেছে। তিনি নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এবং জনগণের ম্যান্ডেট নেয়ার জন্য আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে নয়া নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছেন। সব মিলিয়ে এক বড় ধরনের অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রিস। এখানে বলা ভালো, দাতাগোষ্ঠীর শর্ত না মানায় গেল ৩০ জুনের মধ্যে গ্রিস আইএমএফের কাছ থেকে নেয়া ঋণের ১৬০ কোটি ইউরো পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশটি দেউলিয়া হয়ে যায়। দাতাদের শর্ত গ্রহণ করা হবে কি না, এ প্রশ্নে গ্রিস সরকার একটি গণভোটের আয়োজন করলে ভোটারদের একটি বড় অংশ এ শর্ত প্রত্যাখ্যান করো। এতে করে প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাসের অবস্থান শক্তিশালী হলেও, শেষাবধি তিনি দাতাগোষ্ঠীর কিছু শর্ত মেনেই পুনরায় ঋণ গ্রহণ করেন। আর্জেন্টিনা, কিংবা স্পেনের ক্ষেত্রেও আইএমএফ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবারো ঋণ দিয়েছিল। এখন তারাই গ্রিসকে ৮ হাজার ৬০০ কোটি ইউরো ঋণ দিয়েছে। কিন্তু এতে করে অনেক প্রশ্নের জন্ম হয়েছে।

এক. এ ঋণ কি গ্রিসের অর্থনীতিতে আদৌ কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে? গত প্রায় পাঁচ বছর গ্রিস এভাবেই ঋণ গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু তাতে অর্থনীতিতে পরিবর্তন এসেছে খুব সামান্যই। বরং পরিস্থিতির দিনে দিনে সেখানে অবনতি হয়েছে।

দুই. গ্রিসের পরিস্থিতির সঙ্গে ইউরোপের তিনটি দেশ— স্পেন, পর্তুগাল আর আয়ারল্যান্ডের পরিস্থিতির অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। স্পষ্টতই ইউরো জোনের অর্থনীতিতে দুটো ঋণের জন্ম হয়েছে। একটি ধনী ইউরোপ, যার নেতৃত্বে রয়েছে জার্মানি ও ফ্রান্স। অন্যদিকে গরিব ইউরোপ, গ্রিসের মতো দেশ যার অংশ।

তিন. জার্মানির অর্থমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেছেন গ্রিসের ইউরো জোন (১৯টি দেশ নিয়ে গঠিত) ত্যাগ করা উচিত। আগামীতে এ বক্তব্যটি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

চার. গ্রিস যদি পুনরায় ঋণ শোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গ্রিস কি নবগঠিত এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের দিকে হাত বাড়াবে? চীন ও রাশিয়া কি এ সুযোগটি গ্রহণ করবে?

পাঁচ. গ্রিস ন্যাটোর অন্যতম সদস্য। দেশটির স্ট্রাটাজিক অবস্থানও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিস্থিতিতে গ্রিস কি ন্যাটো থেকেও বের হয়ে যাবে? হয়, ইউরো জোনের ব্যর্থতা কি ইউরোপের অর্থ-তাকে একটি প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেবে?

➤ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি শক্তি।

➤ অনেক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

➤ কিন্তু ইউরো জোনের অর্থনৈতিক সংকট ইইউর ভূমিকাকে সংকুচিত করে দিয়েছে।

এখানে বলা ভালো, ১৯৫৭ সালে মাত্র ছয়টি দেশ নিয়ে (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ) ইউরোপীয় ঐক্যের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ)। ২৮টি দেশ এখন ইইউর সদস্য। এর মাঝে আবার ২৪টি দেশ ন্যাটোর সদস্য। তবে জর্জিয়া ও ইউক্রেন এখনো ন্যাটোর সদস্য হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র এ দুটি দেশকে ন্যাটোর সদস্যপদ দিতে চাচ্ছে, যাতে রাশিয়ার রয়েছে আপত্তি।

ইউরোপে এরই মাঝে বেশ কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়েছে, যে সংস্থাগুলো হলো ইউরোপীয় কাউন্সিল, কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় আদালত, নিরীক্ষক দপ্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউরোপীয় ব্যাংক ও ইউরোপীয় মুদ্রা ইন্সটিটিউট, কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ সংস্থাগুলো অভিন্ন ইউরোপের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা পুরো দৃশ্যপটকে এখন বদলে দিল। এখন শুধু ইউরোপই নয়, বরং খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। যে যুক্তি তুলে একসময় ব্রিটেন ও ডেনমার্ক ইউরো জোনে (এক মুদ্রা নিজ দেশে চালু) যোগ দিতে চায়নি, সে যুক্তিটি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হলো। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধারের কাজটি অত সহজ নয়। একটি দেশের সমস্যায় অন্য দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ইউরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড়, তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কি না?

২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন তার পঞ্চাশতম পূর্তি উৎসব পালন করে তখনই বার্লিন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইইউর মাঝে বিভক্তি আছে। লক্সেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম প্রধান অর্জন হিসেবে ইউরো মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিল। অথচ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল ইউরোর সব দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক প্রথম থেকেই ইউরোকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। পোল্যান্ড ও ইতালি চেয়েছিল ইউরোপের ক্রিস্টিয়ান মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু ফ্রান্স এর বিরোধিতা করেছিল। দেশটি ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিল। চেক রিপাবলিক ও পোল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও ফ্রান্স ও জার্মানি এটা নিয়ে চিহ্নিত ছিল এ কারণে যে নিরাপত্তার বিষয়টিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাশিয়াকে খেপিয়ে তুলতে পারে।

জার্মানি ও স্পেন ইইউর জন্য নতুন একটি সাংবিধানিক চুক্তি করতে চাইলেও ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস ছিল এর বিরোধী। পূর্ব ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ১৯৮৯ সালের 'ভেলভেট রেভলুশন' দেশগুলোকে সোভিয়েতনির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন হয় এবং দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে ধাবিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের আগে পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশই ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেনি। এ দেশগুলোর ওপর কোপেনহেগেন ফর্মুলা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোপেনহেগেন ফর্মুলায় কতগুলো শর্ত দেয়া হয়েছিল, যা পূরণ করলেই ইইউর সদস্যপদ পাওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তন, মানবাধিকার রক্ষা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাদান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরই কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ইইউতে যোগ দেয়া বসনিয়া হারজেগোভিনা, কিংবা ক্রোয়েশিয়া এখনো ইইউতে যোগ দিতে পারেনি। এখন অর্থনৈতিক সংকট সব সংকটকে ছাপিয়ে গেছে। ঋণ সংকট জর্জরিত ইউরোপে আবারো মন্দার আশঙ্কা বাড়ছে। ২০১৩-২০১৪ সময়সীমায় ইউরো ব্যবহারকারী ইউরো জোনের শূন্য প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। ইইউর প্রবৃদ্ধিও ছিল শূন্যের কোঠায়। তাই ইউরোপ নিয়ে শঙ্কা থেকেই গেলা। এখন ইইউর ঐক্য নিয়ে যে সন্দেহ তা আরো বাড়বে। ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দুই স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স একটি দুই স্তরবিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাচ্ছে। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট সারকোজি খোলামেলাভাবেই এ বিভক্তির কথা বলেছিলেন। জার্মানির চ্যান্সেলর মার্কেলও চাচ্ছেন একটা পরিবর্তন। তিনি বলেন এক নয়া ইউরোপ গড়ার কথা, যদিও এ বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলেন ইউরোপীয় কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান জোসে ম্যানুয়েল বারোসো। এখন সত্যি সত্যিই ইউরোপ ভাগ হয়ে যাবে কি না, কিংবা 'নতুন ইউরোর' স্বরূপ কী হবে, তা এ মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। তবে একটি পরিবর্তন যে আসন্ন, তা গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় ব্যর্থতা। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন যখন ইইউতে থাকা-না থাকা নিয়ে গণভোট করতে চান, তখন ইউরোপের ঐক্যে যে ফাটলের জন্ম হয়েছে, তারই ইঙ্গিত দিলেন তিনি। ক্যামেরন স্পষ্ট করেই বলেছেন, আমরা যদি এখনই এসব সমস্যা নিয়ে উদ্যোগ নিতে না পারি, তাহলে ইউরোপের পতন হবে এবং ব্রিটিশরাও পতনের দিকে যেতে থাকবে।

অতীতে ইইউ সম্পর্কে এত ভয়ংকর কথা কেউ বলেননি। এখন ক্যামেরন সাহস করেই বলেন। সামনের দিনগুলো অত্যন্ত কঠিন সময় ইইউর জন্য। অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সংকট যদি ইইউ কাটিয়ে উঠতে না পারে, তাহলে এটা দিব্য দিয়েই বলা যায় আগামী এক দশকের মধ্যে আমরা এক ভিন্ন ইউরোপের চেহারা দেখতে পাব। ইইউতে থাকা-না থাকা নিয়ে ব্রিটেনের গণভোটের আয়োজন ও ক্যামেরনের সর্বশেষ বক্তব্য প্রমাণ করে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে বেশ অসন্তুষ্ট। ব্রিটেনের পর এখন দৃষ্টি গ্রিসে আবদ্ধ।

তবে সব ছাপিয়ে গেছে গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় গ্রিসের সংসদের অধিকাংশ সদস্য ৫ জুলাইয়ের গণভোটে 'না' ভোটের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, ঋণদাতা দেশগুলো যে সংস্কারের কথা বলেছে, অর্থাৎ বাজেট কাট এর কথা বলছিল, তাতে সংসদের আপত্তি রয়েছে, যদিও সিপ্রাস সে শর্তই মেনে নিলেন। গণভোটে 'না' ভোট জয়যুক্ত হয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে গ্রিসের জনমত ইউরো জোন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে। শেষাবধি গ্রিস ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে কি না, তাও একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে, গ্রিস ব্রিটেন ও ডেনমার্কের মতো অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নে থেকেও নিজস্ব মুদ্রা তারা ব্যবহার করবে। যেমন ব্রিটেনে ইউরো চালু না হওয়ায় এখনো পাউন্ড সেখানে চালু রয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে গ্রিস তার পুরনো মুদ্রা ড্রাকমা পুনরায় চালু করবে, এটাই বাস্তবতা। তবে সব কিছু নির্ভর করছে আগামী তিন বছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন, গ্রিস যদি ইউরো জোন থেকে বেরিয়ে যায়, এর একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বের অর্থনীতিতেই পড়বে। ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটের পতন ঘটেছে। শুধু অস্ট্রেলিয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ৩৫ বিলিয়ন ডলার 'হাওয়া' হয়ে গেছে। মুদ্রা হিসেবে ডলারের মানও কমে গেছে। বলা হচ্ছে, এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২০১৬ সালে এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ০.৩ ভাগ কমে যাবে। সুতরাং সারা বিশ্ব তাকিয়ে থাকবে গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে। গ্রিস ব্যর্থ হলে এর প্রতিক্রিয়া পড়বে পর্তুগাল, স্পেন ও আয়ারল্যান্ডেও।

আজ গ্রিসে অর্থনীতি রক্ষার বড় পরীক্ষা

আজ ৫ জুলাই গ্রিসে অর্থনীতি রক্ষায় (বেইল আউট) গণভোট হতে যাচ্ছে। গ্রিসের অর্থনৈতিক সংকট, বিশেষ করে ৩০ জুনের মধ্যে ১০০ কোটি ৭০ লাখ ডলার পরিশোধ করার ব্যর্থতা শুধু গ্রিসের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই নয়, বরং বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও বড় ধরনের ঝাঁকুনি দিয়েছে। বস্তুত বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়েছে ইউরো জোনের ভবিষ্যৎ। ৩০ জুন গ্রিসের ১০০ কোটি ৭০ লাখ ডলার ঋণ পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় গ্রিস দেউলিয়া হয়ে গেছে। আইএমএফের কাছ থেকে এ ঋণ নিয়েছিল গ্রিস। গত ৫ বছর ধরেই গ্রিসের ঋণ সংকটজনিত পরিস্থিতি বিশ্বের গণমাধ্যমে স্থান পেয়ে আসছিল। এই ঋণ পরিস্থিতি ও ঋণ পরিশোধ করার ব্যর্থতার কারণে সেখানে সরকারের পতন পর্যন্ত ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আলেকসিস সিপ্রাসের নেতৃত্বে একটি বামপন্থী সরকার গঠিত হয়। কিন্তু গ্রিসের অর্থনৈতিক সংকটের কোনো সমাধান দিতে পারছিল না সরকার। এমনই এক পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধে আরও অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আইএমএফ। কিন্তু তারা শর্ত জুড়ে দিয়েছিল। শর্তের মাঝে অন্যতম ছিল কঠোর ব্যয় সংকোচনা। কিন্তু এই শর্তের প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। উল্লেখ্য, এর আগের সরকার কঠোর ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করলে সরকারের পতন ঘটে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে সিপ্রাস প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে আইএমএফের এই শর্তের বিরোধিতা করে আসছিলেন। শেষ মুহূর্তে সরকার ৫ জুলাই একটি গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেয়। সরকার গণভোটে না ভোট দেয়ার জন্য গ্রিসের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। অন্যদিকে ইউরো জোনের নেতারা গণভোটে হ্যাঁ ভোট দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে গ্রিসের পার্লামেন্টের সদস্যরা না ভোট দেয়ার পক্ষেই মত দিয়েছেন। এর অর্থ পরিষ্কার-না ভোট জয়যুক্ত হলে গ্রিস ইউরো জোন থেকে ছিটকে পড়বে। অর্থাৎ যে ১৯টি দেশ নিজস্ব মুদ্রা হিসেবে ইউরো চালু করেছিল, তাদের মধ্যে গ্রিস আর থাকতে পারবে না। এখানে বলা ভালো, বর্তমানে ২৮টি দেশ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত। তবে সব দেশ এখনও তাদের নিজস্ব মুদ্রা হিসেবে ইউরো গ্রহণ করেনি। কোনো কোনো দেশ (ব্রিটেন, ডেনমার্ক) তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে ইউরো গ্রহণ করেনি। আবার কোনো কোনো দেশ ইউরো গ্রহণে যেসব শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, সেসব শর্ত পূরণ করতে পারেনি। যেসব দেশে ইউরো চালু হয়েছে, ওই সব দেশকে নিয়েই ইউরো জোন গঠিত। যেমন- অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, এস্টোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, হল্যান্ড, পর্তুগাল, স্লোভাকিয়া ও স্পেন- এসব দেশ এর সদস্য। এর বাইরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো (যেমন- চেক রিপাবলিক, পোল্যান্ড, সুইডেন, যুক্তরাজ্য ইত্যাদি) এখনও ইউরো জোনের বাইরে রয়েছে। গ্রিস ইউরো জোন থেকে বেরিয়ে গেলে দেশটির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। বিকল্প হিসেবে গ্রিস সদ্যগঠিত চীনের নেতৃত্বাধীন এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের (এআইআইবি) দিকে তাকাতে পারে। এটা হলে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের কর্তৃত্ব আরও খর্ব হবোতবে গ্রিসের পরিস্থিতি একটা শংকা তৈরি করেছে যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের সদস্য দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ২০১৬ সালে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে দেশটির থাকা, না থাকা নিয়ে একটি গণভোট করবে। স্পষ্টতই সমগ্র ইউরোপে অভিন্ন এক ইউরোপের ধারণা তখন কল্পনাতেই থেকে যেতে পারে। ২০১১ সালের পর থেকে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি কোনো অমূলক ধারণা ছিল না। বরং ১৯৫৭ সালে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সৃষ্টির পর ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ম্যাসট্রিচ চুক্তি ছিল অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। ম্যাসট্রিচ চুক্তিতে একটি একক মুদ্রা ও একটি ইউরোপীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চে শেনজেন চুক্তি এবং ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো চালুর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অভিন্ন এক ইউরোপের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল ইউরোপ। বলা ভালো, ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর ইউরোপীয় কমিউনিটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নাম ধারণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিমধ্যে সম্প্রসারণ ঘটেছে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বেশ কটি পূর্ব ইউরোপের দেশ ইইউতে যোগ দিয়েছে। ইইউর সদস্য সংখ্যা এখন ২৮। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন ইইউর ১৫টি দেশের মধ্যে ১১টি দেশ ইউরো চালু করেছিল। এখন চালু রয়েছে ১৯টি দেশে। ইউরো চালু হওয়ার সময়ই এ মুদ্রা নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তখন বলা হয়েছিল, ইউরোপের উত্তরের ধনী দেশগুলো ইউরো চালু হলে এ থেকে সুবিধা নিতে পারে। আজ এত বছর পর এ আশংকাই সত্যে পরিণত হল। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে ইউরো চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও সদস্য দেশগুলোয় তিন বছর পর্যন্ত নিজ নিজ দেশের মুদ্রা চালু থাকে এবং ২০০২ সালের জুলাই মাসে ইউরোর কাগজি ও ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার পর পুরনো মুদ্রা বাতিল হয়ে যায়। গত নয় বছর ইউরো নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা না দিলেও ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ইইউর কয়েকটি দেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। দেশগুলো ঋণ শোধ করতে না পেরে অনেকটা দেউলিয়া হয়ে যায়। ইতিমধ্যে গ্রিস ও ইতালির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরমে ওঠেছে। কিন্তু গ্রিসের পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে খারাপ। সেখানে পাপেন্দ্র সরকারের পতন, বিচারপতি পাপাদেমাসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, কিংবা ২০১৫ সালের জানুয়ারির নির্বাচনে বামপন্থী আলেকসিস সিপ্রাসের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠিত হলেও গ্রিস অর্থনৈতিক সংকট থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। বরং সংকট দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি শক্তি। অনেক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ইউরো জোনের অর্থনৈতিক সংকট ইইউর ভূমিকাকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখানে বলা ভালো, ১৯৫৭ সালে মাত্র ৬টি দেশ নিয়ে (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গ) ইউরোপীয় ঐক্যের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ)। ২৮টি দেশ এখন ইইউর সদস্য। এর মাঝে আবার ২৪টি দেশ ন্যাটোর সদস্য। তবে জর্জিয়া ও ইউক্রেন এখনও ন্যাটোর সদস্য হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র ওই দুটি দেশকে ন্যাটোর সদস্যপদ দিতে চাচ্ছে, যাতে রাশিয়ার রয়েছে আপত্তি। ইউরোপে এরই মাঝে বেশ কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়েছে, যে সংস্থাগুলো ইউরোপীয় ঐক্যকে ধরে রেখেছে। যেমন বলা যেতে পারে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় আদালত, নিরীক্ষক দফতর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউরোপীয় ব্যাংক ও ইউরোপীয় মুদ্রা ইন্সটিটিউট এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা। এ সংস্থাগুলো অভিন্ন ইউরোপের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা পুরো দৃশ্যপটকে এখন বদলে দিল। এখন শুধু ইউরোপই নয়, বরং খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখে। যে যুক্তি তুলে একসময় ব্রিটেন ও

ডেনমার্ক ইউরো জোনে (একক মুদ্রা নিজ দেশে চালু) যোগ দিতে চায়নি, সেই যুক্তিটি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হল। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধারের কাজটি অত সহজ নয়। একটি দেশের সমস্যা অন্য দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ইউরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় তা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কি-না? ২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন তার পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উৎসব পালন করে, তখনই বার্লিন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইইউর মাঝে বিভক্তি আছে। লুক্সেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম প্রধান অর্জন হিসেবে ইউরো মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিল। অথচ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল ইউরো সব দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক প্রথম থেকেই ইউরোকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। পোল্যান্ড ও ইতালি চেয়েছিল ইউরোপের খ্রিস্টীয়ান মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু এর বিরোধিতা করেছিল ফ্রান্স। দেশটি ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিল। চেক রিপাবলিক ও পোল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও ফ্রান্স ও জার্মানি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিল। এ কারণে যে, নিরাপত্তার বিষয়টিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাশিয়াকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে। জার্মানি ও স্পেন ইইউর জন্য নতুন একটি সাংবিধানিক চুক্তি করতে চাইলেও ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস ছিল এর বিরোধী। পূর্ব ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ছিল। ১৯৮৯ সালের ভেলভেট রেভোল্যুশন এ দেশগুলোকে সোভিয়েত নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন হয় এবং দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে ধাবিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের আগে পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশই ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেনি। এ দেশগুলোর ওপর কোপেনহেগেন ফর্মুলা চালিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোপেনহেগেন ফর্মুলায় কতগুলো শর্ত দেয়া হয়েছিল, যা পূরণ করলেই ইইউর সদস্যপদ পাওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তন, মানবাধিকার রক্ষা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরই কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ইইউতে যোগ দেয়। বসনিয়া হারজেগোভিনা, ক্রোয়েশিয়া এখনও ইইউতে যোগ দিতে পারেনি। এখন অর্থনৈতিক সংকট সব সংকটকে ছাপিয়ে গেছে। ঋণ সংকটে জর্জরিত ইউরোপে আবারও মন্দার আশংকা বাড়ছে। ২০১৩-১৪ সালে ইউরো ব্যবহারকারী ইউরো জোনের শূন্য প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। ইইউর প্রবৃদ্ধিও ছিল শূন্যের কোঠা। তাই ইউরোপ নিয়ে শংকা থেকেই গেলা। এখন ইইউর ঐক্য নিয়ে যে সন্দেহ, তা আরও বাড়বে। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দুই স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স একটি দুই স্তরবিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাচ্ছে। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট সারকোজি খোলামেলাভাবেই এ বিভক্তির কথা বলেছিলেন। জার্মান চ্যান্সেলর মার্কেলও চাচ্ছেন একটা পরিবর্তন। তিনি বলেন এক নয়া ইউরোপ গড়ার কথা। যদিও এ বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলেন ইউরোপীয় কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান জোসে ম্যানুয়েল বারোসো। এখন সত্যি সত্যি ইউরোপ ভাগ হয়ে যাবে কি-না, কিংবা নতুন ইউরোপের স্বরূপ কী হবে, তা এ মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। তবে একটি পরিবর্তন যে আসন্ন, তা গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় ব্যর্থতা। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন যখন ইইউতে থাকা, না থাকা নিয়ে গণভোট করতে চান, তখন ইউরোপের ঐক্যে যে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে, তারই ইঙ্গিত মেলে। ক্যামেরন স্পষ্ট করেই বলেছেন, আমরা যদি এখনই এসব সমস্যা নিয়ে উদ্যোগ নিতে না পারি, তাহলে ইউরোপের পতন হবে এবং ব্রিটিশরাও পতনের দিকে যেতে থাকবে। অতীতে ইইউ সম্পর্কে এত ভয়ংকর কথা কেউ বলেননি। এখন ক্যামেরন সাহস করেই বললেন। সামনের দিনগুলো অত্যন্ত কঠিন সময় ইইউর জন্য। অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সংকট যদি ইইউ কাটিয়ে উঠতে না পারে, তাহলে এটা দিবা দিয়েই বলা যায়, আগামী এক দশকের মধ্যে আমরা এক ভিন্ন ইউরোপের চেহারা দেখতে পাব। ব্রিটেনের মতো একটি বড় দেশ যদি ইইউ ত্যাগ করে, তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব আর থাকে না। অভিবাসী প্রশ্নে ক্যামেরনের সর্বশেষ বক্তব্য প্রমাণ করে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে বেশ অসন্তুষ্ট। ব্রিটেনের পর এখন দৃষ্টি গ্রিসের দিকে। তবে সব ছাপিয়ে গেছে গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গ্রিসের পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য ৫ জুলাইয়ের গণভোটে না ভোটের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, ঋণদাতা দেশগুলো যে সংস্কারের কথা বলেছিল, অর্থাৎ বাজেট কাটছাঁট করা, তাতে তারা সায দেবে না। ধারণা করছি গণভোটে না ভোট জয়যুক্ত হবে। এর অর্থ হচ্ছে গ্রিস ইউরো জোন থেকে বেরিয়ে যাবে। শেষ অব্দি গ্রিস ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে কি-না, সেটাও একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে। কিংবা এমনও হতে পারে গ্রিস ব্রিটেন ও ডেনমার্কের মতো অবস্থান গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নে থেকেও নিজস্ব মুদ্রা তারা ব্যবহার করবে। যেমন ব্রিটেনে ইউরো চালু না হওয়ায় এখনও পাউন্ড সেখানে চালু রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, গ্রিস তার পুরনো মুদ্রা ড্রাকমা পুনরায় চালু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তবে সবকিছু নির্ভর করছে আজকের গণভোটের ফলাফলের ওপর। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, গ্রিস যদি ইউরো জোন থেকে বেরিয়ে যায়, এর একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বের অর্থনীতিতে পড়বে। এরই মধ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটে দরপতন ঘটেছে। শুধু অস্ট্রেলিয়া স্টক এক্সচেঞ্জ থেকেই ৩৫ বিলিয়ন ডলার হাওয়া হয়ে গেছে। মুদ্রা হিসেবে ডলারের মানও কমে গেছে। বলা হচ্ছে, এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২০১৬ সালে এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ০.৩ ভাগ কমে যাবে। তাই সারা বিশ্ব তাকিয়ে আছে আজ গ্রিসের গণভোটের দিকে। গ্রিসের এই দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার ঘটনা এখন নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। একটি উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রও যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে, এটা এই প্রথমবারের মতো প্রমাণিত হল। ফলে ইউরোপের আরও অনেক দেশ নিয়ে এ প্রশ্ন থাকল। দ্বিতীয়ত, ঋণদাতা সংস্থা, বিশেষ করে আইএমএফের অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনা যে কোনো দেশের স্বার্থরক্ষা করতে পারে না, এটা প্রমাণিত হল। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নীতি একটি স্বাধীন অর্থনীতির পরিপন্থী। গ্রিসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আইএমএফের প্রেসক্রিপশন ছিল পেনসনের পরিমাণ কমানো, ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়ানো ইত্যাদি। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের নীতি হচ্ছে ঋণগ্রহীতা দেশকে তার সুপারিশমালা অনুযায়ী চলতে বাধ্য করা। পাঠক, বাংলাদেশের কথা ভাবতে পারেন। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের জুলাই মাস থেকে সম্প্রসারিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির আওতায় কাজ করে যাচ্ছে। এক বছরে সরকারের ৯টি ক্ষেত্রে করণীয় কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের বিকল্প হিসেবে ৫৭টি দেশ নিয়ে চীনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক বা আইআইবি। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক (যারা ইউরো

জোনে নেই) এর সদস্য গ্রিস এ ব্যাংকে যোগ দিতে পারোতবে আইএমএফ তার নিজের স্বার্থেই তাদের সুপারিশমালা কিছুটা নমনীয় করে গ্রিসকে তার অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে আরও ঋণ দেবে। এ ক্ষেত্রে আইএমএফ নমনীয় হয়ে কিছু শর্ত প্রত্যাহার করে নিলে গ্রিস সরকার তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে, এমন কথাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাস আগামী ১০ জুলাই গ্রিসকে প্রাইভেট লগ্নিকারী সংস্থাগুলো থেকে নেয়া ২ বিলিয়ন ইউরো পরিশোধ করতে হবে। ফলে সমস্যা একটা থাকলোই। এখন আবারও গ্রিসকে ঋণ দেয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র সবুজ সংকেত পেলেই আজকের গণভোট বাতিল হতে পারোগ্রিসের পরিস্থিতি আমাদের অনেকের জন্যই একটি শিক্ষা। আইএমএফের ফাঁদে পা দিলে একটি দেশের পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, গ্রিসের অবস্থা এর বড় প্রমাণ। Daily Jugantor 05.07.15

গ্রিসের ঋণ সঙ্কট ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ

গ্রিসের ঋণ সঙ্কট একটি প্রশ্নকে আবার সামনে নিয়ে এসেছে আর তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে তো? গ্রিসের সাম্প্রতিক নির্বাচনে একটি বামপন্থী সরকার সেখানে গঠিত হয়েছে। কিন্তু গ্রিস ঋণ সঙ্কটজনিত অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। গেল সপ্তাহে গ্রিসকে দেয়া আন্তর্জাতিক ঋণ সহায়তা তহবিলের মেয়াদ আগে ৪ মাস বাড়তে সম্মত হয়েছে ইউরোজোনে। তবে এর মধ্যে কিছু শর্তও বেঁধে দেয়া হয়েছে। নতুন করে অর্থ সহায়তা না পেলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে গ্রিস দেউলিয়া হয়ে যাবে। দীর্ঘদিন ধরেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভেতরকার দেশগুলোর আর্থিক সঙ্কট বার বার সংবাদের শিরোনাম হয়ে আসছে। এইউতে অধিভুক্ত একাধিক দেশে এই ঋণ সঙ্কটের কারণে সরকারের পতন ঘটেছে। নতুন নির্বাচন ও নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ায় ঋণের আর্থিক সঙ্কটের সমাধান হচ্ছে না। গ্রিস সর্বশেষ উদাহরণ। ফলে অভিন্ন ইউরোপের ধারণা সন্দেহের মধ্যে থেকে যেতে পারে। ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি কোনো অমূলক ধারণা ছিল না। বরং ১৯৫৭ সালে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সৃষ্টির পর ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ম্যাসট্রিট চুক্তিতে একটি একক মুদ্রা ও একটি ইউরোপীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চের চুক্তি ও ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো চালুর সিদ্ধান্তের মধ্যদিয়ে অভিন্ন এক ইউরোপের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল ইউরোপ। বলা ভালো ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর ইউরোপীয় কমিউনিটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নাম ধারণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতোমধ্যে সম্প্রসারণ ঘটেছে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বেশ কটি পূর্ব ইউরোপের দেশ ইইউতে যোগ দিয়েছে। ইইউর সদস্য সংখ্যা এখন ২৭। ১৯৯৯ সালের তৎকালীন ইইউর ১৫টি দেশের মধ্যে ১১টি দেশ ইউরো চালু করেছিল। এখন চালু হয়েছে ১৭টি দেশে। ইউরো চালু হওয়ার সময়ই ইউরো নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তখন বলা হয়েছিল ইউরোপের উত্তরের ধনী দেশগুলো ইউরো চালু হলে এ থেকে সুবিধা নিতে পারে। আজ এত বছর পর এই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে ইউরো চালু হওয়া সিদ্ধান্ত হলেও তিন বছর পর্যন্ত নিজ নিজ দেশের মুদ্রা চালু থাকে এবং ২০০২ সালের জুলাই মাসে ইউরোর কাগজী ও ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার পর পুরনো মুদ্রা বাতিল হয়ে যায়। গত নয় বছর ইউরো নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা না দিলেও, গেল বছরের প্রথম দিকে ইইউর কয়েকটি দেশে বড় ধরনের অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। দেশগুলো ঋণ শোধ করতে না পেরে অনেকটা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে গ্রিস ও ইতালির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরমে ওঠে। কিন্তু গ্রিসের পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে খারাপ। সেখানে পরোক্ষ সরকারের পতন, বিচারপতি পাপাদেমাসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিংবা সর্বশেষ নির্বাচনে বামপন্থী এলেক্সিস গ্রিসের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠিত হলেও গ্রিস অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। তখন গ্রিস পুনর্গঠনে একটি তালিকা চেয়েছে ইউরো গ্রুপ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি শক্তি। অনেক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ইউরো জোনের অর্থনৈতিক সঙ্কট ইইউর ভূমিকাকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখানে বলা ভালো ১৯৫৭ সালে মাত্র ৬টি দেশ নিয়ে (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ) ইউরোপীয় ঐক্যের যে যাত্রা শুরু করেছিল তা আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ)। ২৭টি দেশ এখন ইইউর সদস্য। এর মধ্যে আবার ২৪টি দেশ ন্যাটোর সদস্য। তবে জর্জিয়া ও ইউক্রেন এখনো ন্যাটোর সদস্য হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র এই দুটো দেশকে ন্যাটোর সদস্যপদ দিতে চাচ্ছে যাতে রাশিয়ার রয়েছে আপত্তি। ইউরোপে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়েছে, যে সংস্থাগুলো ইউরোপীয় ঐক্যকে ধরে রেখেছে। যেমন বলা যেতে পারে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় আদালত, নিরীক্ষক দপ্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউরোপীয় ব্যাংক ও ইউরোপীয় মুদ্রা ইন্সটিটিউট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা। এই সংস্থাগুলো অভিন্ন ইউরোপের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা পুরো দৃশ্যপটকে এখন বদলে দিল। এখন শুধু ইউরোই নয়, বরং খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। যে যুক্তি তুলে এক সময় ব্রিটেন ও ডেনমার্ক ইউরো জোনে (এক মুদ্রা নিজ দেশে চালু) যোগ দিতে চায়নি। সেই যুক্তিটি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হলো। অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে উদ্ধারের কাজটি অত সহজ নয়। একটি দেশের সমস্যায় অন্য দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ইউরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজেকে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড়, তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কি না? ২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন উৎসব পালন করে তখনই বার্লিন ঘোষণার মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ইইউর সঙ্গে বিভক্তি আছে। লুক্সেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম প্রধান হয়ে ইউরো মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিল। অথচ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল ইউরো সব দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক প্রথম থেকেই ইউরোকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। পোল্যান্ড ও ইতালি চেয়েছিল ইউরোপের ক্রিস্টিয়ান মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু ফ্রান্স এর বিরোধিতা করেছিল। দেশটি ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিল। চেক রিপাবলিক ও পোল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও ফ্রান্স ও জার্মানি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিল। এ কারণে যে, নিরাপত্তার বিষয়টিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাশিয়াকে খেপিয়ে তুলতে পারে। জার্মানি ও স্পেন ইইউর জন্য নতুন একটি সাংবিধানিক চুক্তি করতে চাইলেও ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস ছিল এর বিরোধী। পূর্ব ইউরোর সাবেক সমাজতন্ত্র দেশগুলো তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে

উদ্ভিগ ছিল। ১৯৮৯ সালের 'ভেলভেট রেভলুশন' এই দেশগুলোকে সোভিয়েত নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন হয় ও দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে ধাবিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের আগে পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশই ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেনি। এ দেশগুলোর ওপর কোপেনহেগের ফর্মুলা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোপেনহেগেন ফর্মুলায় কতগুলো শর্ত দেয়া হয়েছিল যা পূরণ করলেই ইইউর সদস্য পদ পাওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তক, মানবাধিকার রক্ষা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। ওইসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরই কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ইইউতে যোগ দেয়া বসনিয়া হারজেগোভিনা কিংবা ক্রয়েশিয়া এখনো ইইউতে যোগ দিতে পারেনি। এখন অর্থনৈতিক সঙ্কট সব সঙ্কটকে ছাপিয়ে গেছে। ঋণ সঙ্কটে জর্জরিত ইউরোপে আবারো মন্দার অপেক্ষা বাড়ছে। গেল বছর ইউরো ব্যবহারকারী ইউরো জোনের শূন্য প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। ইইউর প্রবৃদ্ধিও ছিল শূন্যের কোঠা। তাই ইউরো মুদ্রা নিয়ে শঙ্কা থেকেই গেল। এখন ইইউর ঐক্য নিয়ে যে সন্দেহ তা আরো বাড়বে। ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দুই স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স একটি দুই স্তর বিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাচ্ছে। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট সারকোজি খোলামেলাভাবেই এ বিভক্তির কথা বলেছিলেন। জার্মানির চ্যান্সেলর মার্কেলও চাচ্ছেন একটা পরিবর্তন। তিনি বলছেন এক নয়া ইউরোপের কথা। যদিও এই বিভক্তির বিরোধিতা করছেন ইউরোপীয় কমিশনের চেয়ারম্যান। এখন সত্যি সত্যিই কি ইউরোপ ভাগ হয়ে যাবে? 'নতুন ইউরোপ' এর স্বরূপ কী হবে, তা এই মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। তবে একটি পরিবর্তন যে আসছে, তা গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় ব্যর্থতা। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন যখন ইইউতে থাকা না থাকা নিয়ে গণভোট করতে চান, তখন ইউরোপের ঐক্যে যে ফাটলের জন্ম হয়েছে তারই ইঙ্গিত দিলেন তিনি। ক্যামেরন স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'আমরা যদি এখনই এসব সমস্যা নিয়ে উদ্যোগ নিতে না পারি, তাহলে ইউরোপের পতন হবে এবং ব্রিটিশরাও পতনের দিকে যেতে থাকবে।' অতীতে ইইউ সম্পর্কে এত ভয়ঙ্কর কথা কেউ বলেনি। এখন ক্যামেরন সাহস করেই বলেন। সামনের দিনগুলো অত্যন্ত কঠিন সময় ইইউর জন্য। মন্দাভাব যদি ইইউ কাটিয়ে উঠতে না পারে, তাহলে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় আগামী দুই দশকের মধ্যে আমরা এক ভিন্ন ইউরোপকে দেখতে পাব। Daily Jai Jai Din 12.03.15

গ্রীষ্মের অর্থনৈতিক সংকট

গ্রীষ্মের অর্থনৈতিক সংকট শুধুমাত্র গ্রিসের ভবিষ্যৎকেই একটি অনিশ্চয়তার মাঝে ঠেলে দিয়েছে, তা নয়। বরং বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর এটা একটা বড় আঘাত। গত ৩০ জুন ছিল গ্রিসে আইএমএফের কাছ থেকে নেওয়া ১০০ কোটি ৭০ লাখ ডলার ঋণ পরিশোধ করার সর্বশেষ তারিখ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় গ্রিস কার্যত এখন একটি ঋণ খেলাপি রাষ্ট্রে পরিণত হলো। আজ ৫ জুলাই গ্রিস সরকার সে দেশে একটি গণভোটের আয়োজন করেছে। অর্থনীতি রক্ষায় (বেল আউট) এই গণভোট। গ্রিসের সিপ্রাস সরকার গণভোটে ঋণদাতাদের অতিরিক্ত বাজেট প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন। এবং গণভোটে 'না'-সূচক ভোট দেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা চাচ্ছেন জনগণ সেখানে 'হ্যাঁ'-সূচক ভোট দিকা। 'না'-সূচক ভোট জয়যুক্ত হলে গ্রিস ইউরো জোন (১৯ দেশ) থেকে বেরিয়ে যাবে এবং তাদের নিজস্ব মুদ্রা ড্রাকমা পুনঃপ্রবর্তন করবে। এর মধ্য দিয়ে আগামীতে গ্রিস ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করতে পারে। একসময় এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন নিয়ে ঋণ ছিল ইউরোপবাসীরা। এক ইউরোপের ধারণা কল্পনাই থেকে যেতে পারে এখন।

২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি কোনো অমূলক ধারণা ছিল না। বরং ১৯৫৭ সালে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সৃষ্টির পর ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ম্যাসট্রিট চুক্তি ছিল অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। ম্যাসট্রিট চুক্তিতে একটি একক মুদ্রা ও একটি ইউরোপীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে সেভেন চুক্তি ও ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো চালুর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অভিন্ন এক ইউরোপের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল ইউরোপ। বলা ভালো, ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর ইউরোপীয় কমিউনিটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নাম ধারণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এরই মধ্যে সম্প্রসারণ ঘটেছে। পূর্বে ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ২০০৪ ও ২০০৭ সালে পূর্ব ইউরোপের বেশ কটি দেশ ইইউতে যোগ দিয়েছে। ইইউর সদস্যসংখ্যা এখন ২৮। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন ইইউর ১৫টি দেশের মাঝে ১১টি দেশ ইউরো চালু করেছিল। এখন চালু রয়েছে ১৭টি দেশে। ইউরো চালু হওয়ার সময়ই ইউরো নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

এখন বলা হয়েছিল, ইউরোপের উত্তরের ধনী দেশগুলোতে ইউরো চালু হলে এ থেকে সুবিধা নিতে পারে। আজ এত বছর পর এই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে ইউরো চালু হওয়ার হওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও তিন বছর পর্যন্ত নিজ নিজ দেশের মুদ্রা চালু থাকে এবং ২০০২ সালের জুলাই মাসে ইউরোর কাগজি ও ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার পর পুরোনো মুদ্রা বাতিল হয়ে যায়। গত নয় বছর ইউরো নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা না দিলেও ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ইইউর কয়েকটি দেশে বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। দেশগুলো ঋণ রোধ করতে না পেরে অনেকটা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে গ্রিস ও ইতালির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরমে ওঠে। কিন্তু গ্রিসের পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে খারাপ। সেখানে পাপাদ সরকারের পতন, বিচারপতি পাপাদেমাসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, কিংবা ২০১৫ নির্বাচনে বামপন্থী এলেক্সিস সিপ্রাসের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠিত হলেও গ্রিস অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি শক্তি। অনেক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ইউরো জোন এর অর্থনৈতিক সংকট ইইউর ভূমিকাকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখানে বলা ভালো, ১৯৫৭ সালে মাত্র ছয়টি দেশ নিয়ে (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ) ইউরোপীয় এক্টের যে যাত্রা শুরু করেছিল, তা আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ)। ২৮টি দেশ এখন ইইউর সদস্য। এর মাঝে আবার ২৪টি দেশ ন্যাটোর সদস্য। তবে জর্জিয়া ও ইউক্রেন এখনো ন্যাটোর সদস্য হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র এই দুটো দেশকে ন্যাটোর সদস্যপদ দিতে চাচ্ছে, যাতে রাশিয়ার রয়েছে আপত্তি।

ইউরোপে এরই মাঝে বেশ কয়েকটি সংস্কার জন্ম হয়েছে যে সংস্থাগুলো ইউরোপীয় এক্টকে ধরে রেখেছে। যেমন বলা যেতে পারে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কাউন্সিল, কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় আদালত, নিরীক্ষক দফতর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউরোপীয় ব্যাংক ও ইউরোপীয় মুদ্রা ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা। এই সংস্থাগুলো অভিন্ন ইউরোপের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা পুরো দৃশ্যপটকে এখন বদলে দিল। এখন শুধু ইউরোপই নয়, বরং খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। যে যুক্তি তুলে একসময় ব্রিটেন ও ডেনমার্ক ইউরো জোনে (এক মুদ্রা নিজ দেশে চালু) যোগ দিতে চায়নি, সেই যুক্তিটি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হলো। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধারের কাজটি অত সহজ নয়। একটি দেশের সমস্যায় অন্য দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ইউরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড়, তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কি না?

২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন তার ৫০তম পূর্তি উৎসব পালন করে, তখনই বর্গিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইইউর মধ্যে বিভক্ত আছে। লুক্সেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম প্রধান অর্জন হিসেবে ইউরোর মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিল। অথচ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছিল ইউরোর সব দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক প্রথম থেকেই ইউরোকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। পোল্যান্ড ও ইতালি চেয়েছিল ইউরোপের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু ফ্রান্স এর বিরোধিতা করেছিল। দেশটি ধর্মকে আলাদা করতে চেয়েছিল। চেক রিপাবলিক ও প্রোল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও ফ্রান্স ও জার্মানি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিল। এ কারণে যে নিরাপত্তার বিষয়টি যে কোনো সিদ্ধান্ত বলে রাশিয়াকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে। জার্মানি ও স্পেন ইইউর জন্য নতুন একটি সাংবিধানিক চুক্তি করতে চাইলেও ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ড এর বিরোধী। পূর্বে ইউরোর সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।

১৯৮৯ সালের পর থেকে সমাজতন্ত্রের দেশগুলো সোভিয়েত নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন হয় এবং দেশগুলো গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়। ২০০৪ সালের আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেনি। এই দেশগুলোর ওপর কোপেনহেগেন ফর্মুলা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোপেনহেগেন ফর্মুলার কতগুলো শর্ত দেওয়া হয়েছিল, যা পরে করলে ইইউর সদস্য পদ পাওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু, মুক্তবাজারে অর্থনৈতিক প্রবর্তন, মানবাধিকার রক্ষা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাদান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। এসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরই কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ইইউতে যোগ দেয়া বসনিয়া, হারজেগোভিনা কিংবা ক্রোয়েশিয়া এখনো ইইউতে যোগ দিতে পারেনি।

এখন অর্থনৈতিক সংকট সব সংকটকে ছাড়িয়ে গেছে। ঋণ সংকট জর্জরিত ইউরোপে আবারও সংস্কার আশঙ্কা বাড়ছে। ২০১৩-২০১৪ সময়সীমায় ইউরো ব্যবহারকারী ইউরো জোনের শূন্য প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। ইইউর প্রবৃদ্ধিও ছিল শূন্যের কোঠায়। তাই ইউরোপ নিয়ে শঙ্কা থেকেই গেলা এখন ইইউর এক্ট নিয়ে যে সন্দেহ, তা আরো বাড়বে। এরই মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দুই স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স একটি দুই স্তরবিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাচ্ছে। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট সার্কোজি খোলামেলাভাবেই এই বিভক্তির কথা বলেছিলেন। জার্মানির চ্যান্সেলর মের্কেলও চাচ্ছেন একটা পরিবর্তন। তিনি বলেছেন এক নয়া ইউরোপ গড়ার কথা। যদিও এই বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলেন ইউরোপীয় কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান জোসে ম্যানুয়েল বারোসো। এখন সত্যি সত্যি ইউরোপ ভাগ হয়ে যাবে কি না, কিংবা নতুন ইউরোপের স্বরূপ কী হবে তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। তবে একটি পরিবর্তনকে আসন্ন তা গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছোট অর্থনৈতিক দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় ব্যর্থতা। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন যখন ইইউতে থাকা বা না থাকা নিয়ে গণভোট করতে চান, তখন ইউরোপের একা যে ফাটলের জন্য হয়েছে তারই ইঙ্গিত দিলেন তিনি। ক্যামেরন স্পষ্ট করেই বলেছেন আবারও যদি তখনই এসব সমস্যা নিয়ে উদ্যোগ নিতে না পারে, তাহলে ইউরোপ ব্যর্থ এবং ব্রিটিশরাও পতনের দিকে যেতে থাকবে। অতীতে ইইউর সম্পর্কে এত ভয়ঙ্কর কথা কেউ বলেননি। তখন ক্যামেরন সাহস করেই বললেন, জাপানের দিনগুলো অত্যন্ত কঠিন সময় ইইউর জন্য। অর্থনীতি ও রাজনীতি সংকট যদি ইইউ কাটিয়ে উঠতে না পারে তাহলে এটা দিব্য বলা যায়। আগামী এক দশকের মধ্যে আমরা এক ভিন্ন ইউরোপের চেহারা দেখতে পাব।

ব্রিটেনের মতো একটি বড় দেশ যদি ইইউ ত্যাগ করে, তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব থাকবে না। যেখানে ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি জ্যাকুদ জ্যাংকার অভিবাসীদের ব্যাপারে বিশেষ করে তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে বসবাসের একটি পরিকল্পনা করছেন সেখানে ক্যামেরন এর বিরোধিতা করেছেন। জ্যাংকারের পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশের জন্য একটি অভিবাসী কোঠা রাখার কথা বলা হয়েছে। নয়া ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেরেশামে বলেছেন, এই কোঠা ব্যবস্থা ব্রিটেন মানবে না। এতে করে ইউরোপের দিকে অভিবাসীদের আশাকে উৎসাহিত করবে। এমনকি হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অর্বান কোঠা ব্যবস্থাকে

বিকৃত মস্তিষ্কও অপ্রাপ্ত বলে অভিহিত করেছেন। এখানে বলা ভালো, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রমকালে শত শত অভিবাসী উদ্ধার হয়েছেন। অথবা নৌকা ডুবিতে মারা গেছেন। এসব অভিবাসীর ট্যাগেট হচ্ছে ইতালি, গ্রিস, সাইপ্রাস ও মাল্টা। অতিরিক্ত অভিবাসীর চাপ সামলাতে না পেরে এই দেশগুলো ইইউর কাছে প্রতিকার চেয়েছিল। গত বছর ইইউর সদস্য রাষ্ট্রগুলো এক লাখ ৮৫ হাজার অভিবাসীকে আশ্রয় দিয়েছে। ফলে এটা স্পষ্ট যে আগামীতে এই অভিবাসী ইস্যু ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি বড় বিতর্ক তুলবে।

তবে সব ছাড়িয়ে গেছে গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গ্রিসের সংসদের অধিকাংশ সদস্য ৫ জুলাইয়ের গণভোটের ‘না’ ভোটের পক্ষে মতামত দিয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ঋণদাতা দেশগুলোকে সংস্কারের কথা বলেছিল। অর্থাৎ বাজেট কাটের কথা বলা ছিল তাতে শায় দেবে না। ধারণা করছি, গণভোটে ‘না’ ভোট জয়যুক্ত হবে। এর অর্থ হচ্ছে গ্রিস ইউরো জোন থেকে বেরিয়ে যাবে। শেষ অব্দি গ্রিস ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে কি না, সেটাও একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দেবে কিংবা এমন হতে পারে গ্রিস ব্রিটেন ও ডেনমার্কের মতো অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের থেকেও নিজস্ব মুদ্রা তারা ব্যবহার করবে। যেসব ব্রিটেনে ইউরো চালু না হওয়ায় তখনো পাউন্ড সেখানে চালু রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, গ্রিস তার পুরোনো মুদ্রা ‘ড্রাকমা’ পুনরায় চালু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তবে সব কিছু নির্ভর করছে ৫ জুলাইয়ের গণভোটের ফলাফলের ওপর। এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন গ্রিস যদি ইউরো জোন থেকে বেরিয়ে যায় এর একটা মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বের অর্থনীতিতেই পড়বে। এরই মধ্যে বিশ্বের প্রতিটি স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটের পতন ঘটেছে। শুধু অস্ট্রেলিয়ার স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ৩৫ মিলিয়ন ডলার হাওয়া হয়ে গেছে। মুদ্রা হিসেবে ডলারের মানও কমে গেছে। বলা হচ্ছে, প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২০১৬ সালে এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ০.৩ কমে ভাগ কমে যাবে। সুতরাং সারা বিশ্ব তাকিয়ে থাকবে আজ ৫ জুলাইয়ের গণভোটের দিকে।

গ্রিসের গণভোট ও ভবিষ্যৎ রাজনীতি

গ্রিসের গণভোটে কঠোর কৃষিসাধনের শর্তসংবলিত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব (বেইল আউট) প্রত্যাখ্যান হওয়ায় পুরো ইউরো জোনের ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ৫ জুলাই এই গণভোটটি অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে ভোটারদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল ঋণদাতাদের কঠোর কৃষিসাধনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে কি না। ভোটাররা ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ টিক চিহ্ন দিয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। ভোটের ফলাফলে দেখা যায় ৬১ দশমিক ৩১ শতাংশ ভোটার ‘না’সূচক জবাব দিয়ে বলেছেন, ঋণদাতারা কঠোর কৃষিসাধনের যেসব শর্ত দিয়েছিল, তা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। প্রধানমন্ত্রী সিন্টিয়া পাস্কা ও তাঁর সরকার এমনটিই চেয়েছিলেন। অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা এবং গ্রিসের ডানপন্থী সংগঠনগুলো চেয়েছিল ভোটাররা হ্যাঁ-সূচক মতামত দিয়ে ঋণদাতাদের প্রস্তাব অনুমোদন করুক। কিন্তু ভোটাররা তা করেননি। গণভোটের এই ফলাফল এখন অনেক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এলো। এক. এর মধ্য দিয়ে গ্রিস কি ১৯ সদস্যবিশিষ্ট ‘ইউরো জোন’ (যেখানে মুদ্রা হিসেবে ইউরো চালু রয়েছে) থেকে বেরিয়ে যাবে? এবং চূড়ান্ত বিচারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে? দুই. যেখানে গত ৩০ জুন (২০১৫) আইএমএফের ১০০ কোটি ৭০ লাখ ডলার পরিশোধের ব্যর্থতার কারণে গ্রিস দেউলিয়া হয়ে যায়, সেখানে ঋণদাতা সংস্থাগুলো কি গ্রিসের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে আরো ঋণ দেবে? তিন. গ্রিসের এই পরিস্থিতি কি পর্তুগাল, স্পেন ও ইতালিতেও প্রভাব ফেলবে? কেননা এসব দেশও ঋণসংকটজনিত সমস্যায় রয়েছে।

গ্রিসের গণভোটের এই ফলাফল যে সংকটকে আরো গভীরতর করবে, এটা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এক সপ্তাহ ধরে গ্রিসের সব ব্যাংক বন্ধ রয়েছে। এটিএম কার্ড থেকে মানুষ প্রতিদিন তুলতে পারছে মাত্র ৬০ ইউরো। কিন্তু এখন ব্রাসেলসের ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে যদি অর্থ না আসে, তাহলে মানুষ আর টাকা তুলতে পারবে না। অন্যদিকে আইন ভঙ্গ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গ্রিসকে আবার নতুন করে আর্থিক সহায়তা দেবে, এটাও মনে হয় না। ফলে একটি জটিল সমীকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে গ্রিস।

কতগুলো পরিসংখ্যান দিলেই বোঝা যাবে সংস্কার আনতে গিয়ে গ্রিসের অর্থনীতিতে কী পরিমাণ ধস নেমেছে। ২০১০ সালের পর ২৯ লাখ লোকের পেনশনের পরিমাণ ৪৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। এটা করা হয়েছে আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী। গ্রিসের মোট ঋণের পরিমাণ তখন দাঁড়িয়েছে ৩২০ বিলিয়ন ডলারে, যা কিনা জিডিপি ১৮০ শতাংশ। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপি ৬০ শতাংশ। অর্থাৎ কৃষি অবলম্বন করেও গ্রিস ঋণের পরিমাণ কমাতে পারেনি। আইএমএফের পরামর্শ অনুসরণ করে দেশটির জিডিপি পরিমাণ কমেছে, বাড়েনি। পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৮ সালে গ্রিসের জিডিপি পরিমাণ যেখানে ছিল ৩৫৪ বিলিয়ন ডলার, ২০১৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৪২ বিলিয়ন ডলারে। এই পরিসংখ্যান বিশ্বব্যাপক। গত ছয় বছরে অর্থাৎ অর্থনৈতিক সংকট ও আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী চলার প্রায় কাছাকাছি সময় থেকে গ্রিসে ১০ লাখ লোক চাকরি হারিয়েছে। এ মুহূর্তে কর্মক্ষম গ্রিকবাসীর প্রতি চারজনের মধ্যে একজন বেকার। সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় দুই লাখ গ্রিক নাগরিক দেশ ত্যাগ করেছেন, যাঁদের অনেকেই দেশে ইমিগ্রেশন অথবা ডাক্তার এবং আইটি সেক্টরে কাজ করতেন। সেদিন বিবিসির এক প্রতিবেদনে দেখলাম মেলবোর্নে প্রায় চার লাখ গ্রিক নাগরিক বসবাস করেন। একজন গ্রিক ব্যাংকারের সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছিল, যিনি মেলবোর্নে (অস্ট্রেলিয়া) এখন একটি গ্রিক ক্যাফেতে সাধারণ কাজ করেন। মাত্র ১১ মিলিয়ন জনসংখ্যার এই দেশটিতে ১০ লাখ মানুষের কোনো স্বাস্থ্য ইনস্যুরেন্স নেই। যেখানে ইউরো জোনে বেকারের গড় হিসাব হচ্ছে জনসংখ্যার ১১ দশমিক ১ শতাংশ, সেখানে গ্রিসে এই সংখ্যা ২৫ দশমিক ৬ শতাংশ। অথচ ২০০৮ সালে ছিল মাত্র ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। গত পাঁচ বছর থেকেই গ্রিস আইএমএফের পরামর্শ অনুযায়ী অর্থনীতিতে কৃষি সাধন করে আসছে। বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথবা সেখানে কাটছাঁট করা হয়েছে। বর্তমানে বেতন কমানো হয়েছে ২০ শতাংশ হারে। সরকারি সেক্টরে বেতন

বৃদ্ধি 'ফ্রিজ' করে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাস চেয়েছিলেন ন্যূনতম বেতন ৭৫০ ইউরোতে (৮৩৫ ডলার) উন্নীত করতো কিন্তু আইএমএফের চাপে তিনি তা পারেননি। গ্রিকবাসীর মাঝে ২০ শতাংশ মানুষের বয়স ৬৫ বছরের ওপর। এই বুড়ো মানুষগুলোর পেনশন কমানো হয়েছে প্রায় ৪৮ শতাংশ হারা। কিন্তু তাতে করে মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করা যায়নি। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে বাংলাদেশে মানুষ দেখেছে গ্রিসে 'হোমলেস' অথবা গৃহহীন মানুষের সংখ্যা কিভাবে বাড়ছে। এই সংখ্যা এখন মোট জনগোষ্ঠীর ২৫ শতাংশ। চিন্তা করা যায় গ্রিসের মতো একটি উন্নত দেশে ২৫ শতাংশ মানুষের থাকার কোনো জায়গা নেই!

গ্রিসের পরিস্থিতিতে অনেকে ২০০১ সালের আর্জেন্টিনার পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করেন। আর্জেন্টিনা ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। যদিও পরে ঋণদাতারা তাদের স্বার্থেই আবার আর্জেন্টিনাকে ঋণ দিয়েছিল। আজকে গ্রিসের পরিস্থিতিতে জিম্বাবুয়ে ও সোমালিয়ার পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। এ দেশ দুটি বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে দেউলিয়া রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মূলত বিশ্বব্যাংক তথা আইএমএফ কাঠামোগত সামঞ্জস্য বা Structural Adjustment-এর আওতায় এই ঋণ দিয়ে থাকে। এ ধরনের ঋণের সঙ্গে কড়া শর্ত জড়িত থাকে এবং এটা এক ধরনের সুপারিশমালা, যা ঋণগ্রহীতা দেশকে অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা গেছে এই সুপারিশমালা অনুসরণ করে ঋণগ্রহীতা দেশ তাদের অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তন আনতে পেরেছে। কাঠামোগত সামঞ্জস্য যেসব সুপারিশ থাকে, তার মধ্যে রয়েছে: ১. গ্রহীতা দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা, ২. সরকারি ব্যয় হ্রাস করা, ৩. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্যসহ সেবামূলক খাত ও কৃষি খাতে ভর্তুকি হ্রাস করা, ৪. প্রকৃত মজুরি হ্রাস ও ঋণ সংকোচন, ৫. দাম নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার, ৬. জনসেবামূলক খাত, কৃষি উপকরণ, বিদ্যুৎ, রেলওয়ে বেসরকারীকরণ, ৭. উঁচু কর ও সুদের হার বাড়ানো, ৮. আমদানি অব্যাহত রাখা, ৯. মুক্তবাজার প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। এ সুপারিশমালা গ্রিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। গ্রিসের বামপন্থী সরকার আইএমএফ কর্তৃক দেওয়া এসব সুপারিশের অনেকগুলো গ্রহণ করেও সেখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তেমন উন্নতি করতে পারেনি। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো এবং সমাজতন্ত্র পরবর্তী পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো (১৯৯১ পরবর্তী) এই কাঠামোগত সামঞ্জস্যের আওতায় ঋণ পেয়ে থাকে। কিন্তু তাতে করে কি ঋণগ্রহীতা দেশের অর্থনীতিতে খুব বেশি পরিবর্তন এসেছে? কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৭৭-৮৫ সালে পেরুতে বিশ্বব্যাংকের ফর্মুলা অনুযায়ী কাঠামোগত সামঞ্জস্যের শর্তাবলি গ্রহণ করা হয়। তাতে দেখা যায়, এর ফলে মাথাপিছু আয় ২০ শতাংশ কমেছিল, মুদ্রাস্ফীতি ৩০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬০ শতাংশ। সেই সঙ্গে বেড়েছিল বেকারত্ব। একই ফল দেখা যায় ফিলিপাইনে ১৯৮৪ সালে সেখানে কাঠামোগত সামঞ্জস্যের ফলে মাথাপিছু প্রকৃত আয় ১৯৭৫ সালের পর্যায়ে চলে যায় এবং শ্রমিকদের আয় ৪৬ শতাংশ কমে যায়। অনেক গবেষক (সুসান জর্জ, জেমস বোভার্ড) দেখিয়েছেন, সাহায্যের একটা বড় অংশ বৈদেশিক উপদেষ্টা নিয়োগ ও তাদের নীতি অনুসরণের ফলে দাতা দেশেই ফিরে গেছে। উল্লেখ করতে চাই, বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের জুলাই মাস থেকেই এই তথাকথিত কাঠামোগত সামঞ্জস্যের আওতায় বৈদেশিক ঋণ পেয়ে আসছে। আমি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাতে পারব, এই নীতি অবলম্বনের ফলে সমাজতন্ত্র-পরবর্তী পূর্ব ইউরোপে নব্বইয়ের দশকের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের জিএনপি পরিমাণ কমে গিয়েছিল। তাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। তাদের প্রতিটি দেশের মুদ্রার মান কমে গিয়েছিল। অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বেকার সমস্যা বেড়ে গিয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের ওই সব দেশ পরে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিলেও কোনো একটি দেশও এখন পর্যন্ত ১৯ সদস্যবিশিষ্ট ইউরো জোনে (যেখানে একক মুদ্রা হিসেবে ইউরো চালু রয়েছে) যোগ দিতে পারেনি। এখানে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন, তা হচ্ছে বিশ্বব্যাংক তথা আইএমএফ কর্তৃক ঋণ গ্রহণের সঙ্গে উন্নয়নশীল বিশ্বের জাতীয়তাবাদী সরকারের পতনের একটা সম্পর্কও রয়েছে। যেমন- গুয়াতেমালায় আরবেনজ সরকার ১৯৫৪ সালে, ব্রাজিলে গাউলটি ১৯৬৪ সালে, ঘানায় নকুম্বা ১৯৬৬ সালে, চিলিতে আলেন্দে ১৯৭০-৭৩ সালে, আর্জেন্টিনায় ১৯৭২-৭৬ সালে পেরনিস্টার, ব্রাজিলে গাউলটি সরকার বিশ্বব্যাংকের কোনো ঋণ পায়নি। অথচ তাঁরা যখন উৎখাত হন তখন সেখানে বিশ্বব্যাংকের সাহায্য বেড়ে যায়। গ্রিসের পরিস্থিতি আজ এ আলোকেই বিশ্লেষণ করতে হবে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো খুব কম ক্ষেত্রেই এই 'ঋণের দুষ্টচক্র' থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছে। গ্রিসের পরিস্থিতি আর্জেন্টিনা কিংবা ব্রাজিলের মতোই হবে। এই দুটি দেশই অতীতে ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বব্যাংক তাদের ঋণেই দেশ দুটিকে আবারও ঋণ দিয়েছিল, যাতে দেশ দুটি ঋণের সুদ পরিশোধ করতে পারে। না দিলে আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিতে বাধ্য। এ জন্যই ঋণের পরিমাণ বাড়লেও পুঁজিবাদী সংস্থাগুলো তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য ভবিষ্যতেও ঋণ দিয়ে যাবে। চূড়ান্ত বিচারে 'ট্রয়কা' তাদের স্বার্থেই গ্রিসকে আরো ঋণ দেবে। আর প্রশ্নটা এখানেই। এতে করে গ্রিসের অর্থনীতিকে আবারও আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে কি? 'ট্রয়কা' (অর্থাৎ আইএমএফ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন) তাদের মতো করে গ্রিসের অর্থনীতি পরিচালনা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তাদের প্রণীত নীতির কারণে গ্রিসের জনগণের কোনো মঙ্গল সাধিত হয়নি। বরং এক ধরনের 'আধিপত্যবাদের' জন্ম হয়েছে সেখানে। ফলে গ্রিকবাসী যে ঋণদাতাদের কৃচ্ছসাধনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, এটা ই স্বাভাবিক। তবে এটা বাস্তবতা যে এই ফলাফল এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ দেশগুলোতে জার্মানি ও ফ্রান্সের নেতারা জরুরি বৈঠক করেছেন। প্রশ্ন একটাই- গ্রিককে শর্ত ছাড়া আরো ঋণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন দেবে কি না? ঋণ না পেলে গ্রিসের জন্য বিকল্প পথ দুটি। এক. তাদের নিজস্ব মুদ্রা 'ড্রাকমা'য় ফিরে যাওয়া, যা খুব সহজ নয়। দুই. চীনের নেতৃত্বাধীন এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে যোগ দেওয়া ও সেখান থেকে ঋণ গ্রহণ করা, যা কি না আইএমএফের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতাকে একটি প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে এই গণভোট প্রমাণ করল গ্রিকবাসী একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবেই বেঁচে থাকতে চায়। আইএমএফ বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের 'মাতব্বর' তারা সহ্য করবে না। এটা আইএমএফ তথা বিশ্বব্যাংকের জন্য একটি শিক্ষাও বটে। Daily Kalerkontho 12.07.15

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বিভক্তি কি আসন্ন?

ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকট যখন একক মুদ্রা ইউরোর ভবিষ্যৎকে একটি বড় প্রশ্নের মাঝে ঠেলে দিয়েছে, তখন অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি কল্পনাতই থেকে যেতে পারে। ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি কোন অমূলক ধারণা ছিল না। বরং ১৯৫৭ সালে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সৃষ্টির পর ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত মাসট্রিচ চুক্তি ছিল অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। মাসট্রিচ চুক্তিতে একটি একক মুদ্রা ও একটি ইউরোপীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে সেঙেন চুক্তি এবং ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো চালুর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অভিন্ন এক ইউরোপের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল ইউরোপ। বলা ভালো, ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর ইউরোপীয় কমিউনিটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নাম ধারণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিমধ্যে সম্প্রসারণ ঘটেছে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বেশ ক’টি পূর্ব ইউরোপের দেশ ইইউতে যোগ দিয়েছে। ইইউর সদস্য সংখ্যা এখন ২৭। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন ইইউর ১৫টি দেশের মাঝে ১১টি দেশে ইউরো চালু করেছিল। এখন চালু রয়েছে ১৭টি দেশে। ইউরো চালু হওয়ার সময়ই ইউরো নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তখন বলা হয়েছিল, ইউরোপের উত্তরের ধনী দেশগুলো ইউরো চালু হলে এ থেকে সুবিধা নিতে পারে। আজ এত বছর পর এই আশংকাই সত্যে পরিণত হল। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে ইউরো চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও তিন বছর পর্যন্ত নিজ নিজ দেশের মুদ্রা চালু থাকে এবং ২০০২ সালের জুলাই মাসে ইউরোর কাগজি ও ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার পর পুরনো মুদ্রা বাতিল হয়ে যায়। গত ৯ বছর ইউরো নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা না দিলেও চলতি বছরের প্রথম দিকে ইইউ’র কয়েকটি দেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। দেশগুলো ঋণ শোধ করতে না পেরে অনেকটা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে পাপেন্দ্র’র নেতৃত্বাধীন গ্রিস সরকারের পতন হয়েছে ও পাপাদেমস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। একই সঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী বার্লুসকোনিও পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

পাপেন্দ্র’ ও বার্লুসকোনির পরিণতি প্রমাণ করে ইউরোপ কী বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সরকারগুলো প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেও সেই ঋণ শোধ করতে পারছে না। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করলেও সেই দেউলিয়া রোধ করতে পারছে না। গ্রিস কিংবা ইতালি কঠোর কৃষ্ণসাধনের কথা ঘোষণা করলেও জনসাধারণ তার বিরোধিতা করেছে। তারা দিনের পর দিন বিক্ষোভ মিছিল করছে। গ্রিসের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) গ্রিসকে ‘উদ্ধারের’ জন্য যে ঋণ দিয়েছে, তা ছিল শর্তযুক্ত। ওই শর্ত মেনেই আবাসন করার ওপর একটি বিল পাস করেছে গ্রিসের সংসদ। পাশাপাশি কমানো হয়েছে পেনশন। কমানো হয়েছে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা। গ্রিসের রাস্তায় বিক্ষোভ তাই নিত্যদিনের চিত্র। এ চিত্র আজ ইতালিতেও লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। ইতালি ও গ্রিসের বাইরে আয়ারল্যান্ড ও পর্তুগালের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ নাজুক। গ্রিসে ২০১০ সালে ঘাটতি ছিল জিডিপি ১৩ ভাগ। আর দেশটির ঋণ পরিস্থিতি জিডিপি ১০০ ভাগকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফলে গ্রিসের পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উন্নীত হয়েছিল যে, সরকারি কর্মচারীদের বেতন পর্যন্ত দিতে পারছিল না সরকার। এমন এক পরিস্থিতিতে আইএমএফ ও ইউরো জোনের দেশগুলো ৩ বছরের জন্য ১১০ বিলিয়ন ইউরো ঋণ দেয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু শর্ত হিসেবে ঘাটতি কমানোর কথা বলা হলে তা মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আয়ারল্যান্ডে ২০০৯ সালে যেখানে ঘাটতি ছিল জিডিপি ১১ ভাগ, সেখানে ২০১০ সালে তা উন্নীত হয় ৩১ ভাগে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য ৮৫ বিলিয়ন ইউরোর একটি ‘উদ্ধার কর্মসূচি’ ঘোষণা করা হয়েছে। পর্তুগালের পরিস্থিতি আরও খারাপ। ২০০৯ সালে ঋণের পরিমাণ ছিল জিডিপি ৭৬ ভাগ। আর ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৫ ভাগে। ফলে ২০১১ সালের মার্চে সেখানে সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটে এবং পর্তুগালকে ঋণ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য ৭৮ বিলিয়ন ইউরো ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। খুব সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। বড় অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিত জার্মানি কিংবা ফ্রান্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কমা। এ কারণেই একক মুদ্রা হিসেবে চালু হওয়া ইউরোর ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে জাতীয় মুদ্রায় আবার ফিরে যেতো বলা হচ্ছে, জাতীয় মুদ্রায় ফিরলে সমস্যার সামধান হবো। ইউরোপের স্বল্পোন্নত বা গরিব দেশগুলোর ধারণা, ইউরো চালু হওয়ার পর ইউরোপের শক্তিশালী (অর্থনৈতিক দিক থেকে) ও দুর্বল দেশগুলোর মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে। তাদের ধারণা, ইউরো তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে শক্তিশালী দেশগুলো তাদের অর্থনীতি ধ্বংস করে দিয়েছে। প্যাকেজ ভর্তুকি ও ঋণ দিয়েও সমস্যার সামধান করা যাচ্ছে না। ফলে নিজ মুদ্রায় ফিরে যাওয়ার দাবি কোন কোন মহলে উচ্চারিত হচ্ছে। ‘ইউরো জোন’-এর এই অর্থনৈতিক সংকট ইউরোপের ঐক্যকে বড় প্রশ্নের মাঝে ঠেলে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন টিকবে কিনা সেটা একটা বড় প্রশ্ন এখন। অথচ একসময় ইউরোপীয় ইউনিয়নকে একটা মডেল হিসেবে ধরা হতো। ইতিমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় আমরা ‘দক্ষিণ এশীয় ইউনিয়ন’ গঠনের কথা শুনেছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সমন্বয়ে অদূর ভবিষ্যতে একটি ‘এশীয় ইউনিয়ন’ গঠিত হতে পারে, এমন ধারণাও করেছিলেন কেউ কেউ। এখন ইউরো জোনের সংকটের ফলে নতুন করে এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে হবো। এখানে বলা ভালো, ১৯৫৭ সালে মাত্র ৬টি দেশ নিয়ে (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ) ইউরোপীয় ঐক্যের (ইইসি) যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পরিণত হয়েছে। ইউরোপের ২৭টি দেশ এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য। বেশ ক’টি পূর্ব ইউরোপের দেশ ইতিমধ্যে শুধু ইইউতেই যোগ দেয়নি, বরং ন্যাটোতেও যোগ দিয়েছে। ন্যাটোর এই সম্প্রসারণ নিয়েও নানা কথা রয়েছে। ইইউভুক্ত দেশগুলোর মাঝে ২৪টি দেশ এখন ন্যাটোর সদস্য।

ইউরোপে এরই মাঝে বেশ কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়েছে, যে সংস্থাগুলো ইউরোপীয় ঐক্যকে ধরে রেখেছে। যেমন বলা যেতে পারে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় আদালত, নিরীক্ষক দফতর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউরোপীয় ব্যাংক এবং

ইউরোপীয় মুদ্রা ইন্সটিটিউট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা। এই সংস্থাগুলো অভিন্ন ইউরোপের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা পুরো দৃশ্যপটকে এখন বদলে দিল। এখন শুধু ইউরোই নয়, বরং খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব প্রশ্নের সম্মুখীন। যে যুক্তি তুলে এক সময় ব্রিটেন ও ডেনমার্ক ইউরো জোনে (এক মুদ্রা নিজ দেশে চালু) যোগ দিতে চায়নি, সেই যুক্তিটি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হল। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধারের কাজটি অত সহজ নয়। একটি দেশের সমস্যায় অন্য দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ইউরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড়, তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা?

২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন তার ৫০তম পূর্তি উৎসব পালন করে তখনই বার্লিন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ইইউর মাঝে বিভক্তি আছে। লুক্সেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম প্রধান অর্জন হিসেবে ইউরোর মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিল। অথচ মাত্র তিন বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হল, ইউরো সব দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক প্রথম থেকেই ইউরোকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। পোল্যান্ড ও ইতালি চেয়েছিল ইউরোপের ক্রিস্টিয়ান মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু ফ্রান্স এর বিরোধিতা করেছিল। দেশটি ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিল। চেক রিপাবলিক ও পোল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও ফ্রান্স ও জার্মানি এটা নিয়ে চিহ্নিত ছিল। এ কারণে যে, নিরাপত্তার বিষয়টিতে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাশিয়াকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে। জার্মানি ও স্পেন ইইউ'র জন্য নতুন একটি সাংবিধানিক চুক্তি করতে চাইলেও ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস ছিল এর বিরোধী। পূর্ব ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ১৯৮৯ সালে 'ভেলভেট রেভোলিউশন' এই দেশগুলোকে সোভিয়েতনির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন হয় ও দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে ধাবিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের আগে পূর্ব ইউরোপের কোন দেশই ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেনি। এই দেশগুলোর ওপর কোপেনহেগেন ফর্মুলা চালিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোপেনহেগেন ফর্মুলায় কতগুলো শর্ত দেয়া হয়েছিল, যা পূরণ করলেই ইইউ'র সদস্যপদ পাওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তন, মানবাধিকার রক্ষা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরই কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ইইউতে যোগ দেয়া বসনিয়া-হারজেগোভিনা ও ক্রোয়েশিয়া এখনও ইইউতে যোগ দিতে পারেনি। এখন অর্থনৈতিক সংকট সব সংকটকে ছাপিয়ে গেছে। ঋণ সংকটে জর্জরিত ইউরোপে আবারও মন্দার আশংকা বাড়ছে। সামনের বছর ইউরো ব্যবহারকারী ইউরো জোনের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশে নেমে আসবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এর ফলে ইইউর ঐক্য নিয়ে যে সন্দেহ, তা আরও বাড়বে। ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দুই স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স একটি দুই স্তরবিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাচ্ছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সারকোজি খোলামেলাভাবেই এই বিভক্তির কথা বলছেন। জার্মানির চ্যান্সেলর মার্কেলও চাচ্ছেন একটা পরিবর্তন। তিনি বলছেন এক নয়া ইউরোপ গড়ার কথা। যদিও এই বিভক্তির বিরোধিতা করছেন ইউরোপীয় কমিশনের চেয়ারম্যান জোসে ম্যানুয়েল বারোসো। এখন সত্যি সত্যিই ইউরোপ ভাগ হয়ে যাবে কিনা কিংবা 'নতুন ইউরোপ'-এর স্বরূপ কী হবে, তা এই মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। তবে একটি পরিবর্তন যে আসবেই, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ কোন পথে

ব্রিটেনের পার্লামেন্ট নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টির বিজয়ের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ এখন আবারও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এর আগে গ্রিসের ঋণ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ একটি প্রশ্নের মুখে আছে। আগে থেকেই এখন এর সঙ্গে যোগ হলো ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সিদ্ধান্ত। নির্বাচনের আগে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে কি না, তা যাচাই করে দেখার জন্য তিনি ২০১৭ সালে একটি গণভোটের আয়োজন করবেন। নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় তিনি এই গণভোটটি ২০১৬ সালেই করতে চান। নির্বাচনের পরপর অভিবাসী প্রশ্নেও তিনি ইইউ নেতাদের সঙ্গে এক বিতর্কে জড়িয়েছেন। তিনি বলেছেন, ভূমধ্যসাগর পার হয়ে যেসব অভিবাসী ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে, তাদের ফিরে যেতে হবে। ইইউয়ের মধ্যে এ প্রশ্নে দ্বিমত আছে। ফলে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে যে অভিন্ন ইউরোপ কল্পনাতেই থেকে যেতে পারে। ২০১১ সালের মাঝামাঝি অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি কোনো অমূলক ধারণা ছিল না। বরং ১৯৫৭ সালে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সৃষ্টির পর ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ম্যাসট্রিচট চুক্তি ছিল অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। ম্যাসট্রিচট চুক্তিতে একটি একক মুদ্রা ও একটি ইউরোপীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চে সেভেন চুক্তি ও ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো চালুর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অভিন্ন এক ইউরোপের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল ইউরোপ। বলা ভালো, ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর ইউরোপীয় কমিউনিটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নাম ধারণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিমধ্যে সম্প্রসারণ ঘটেছে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বেশ কয়েকটি পূর্ব ইউরোপের দেশ ইইউতে যোগ দিয়েছে। ইইউয়ের সদস্য সংখ্যা এখন ২৮। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন ইইউয়ের ১৫টি দেশের মধ্যে ১১টি ইউরো চালু করেছিল। এখন চালু রয়েছে ১৭টি দেশে। চালু হওয়ার সময়ই ইউরো নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তখন বলা হয়েছিল, ইউরোপের উত্তরের ধনী দেশগুলো ইউরো চালু হলে এ থেকে সুবিধা নিতে পারে। আজ এত বছর পর এ আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে ইউরো চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও তিন বছর পর্যন্ত নিজ নিজ দেশের মুদ্রা চালু থাকে

এবং ২০০২ সালের জুলাই মাসে ইউরোর কাগজি ও ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার পর পুরনো মুদ্রা বাতিল হয়ে যায়। গত ৯ বছর ইউরো নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা না দিলেও ২০১৩ ও ২০১৪ সালে ইউরোর কয়েকটি দেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। দেশগুলো ঋণ শোধ করতে না পেরে অনেকটা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে গ্রিস ও ইতালির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি চরমে ওঠে। কিন্তু গ্রিসের পরিস্থিতি ছিল সবচেয়ে খারাপ। সেখানে পাপেন্দ্র সরকারের পতন, বিচারপতি পাপাদেমাসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিংবা ২০১৫ সালের জানুয়ারির নির্বাচনে বামপন্থী এলেক্সিস সিপ্রাসের নেতৃত্বে একটি সরকার গঠিত হলেও গ্রিস অর্থনৈতিক সংকট থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না। এখন গ্রিস পুনর্গঠনে একটি তালিকা চেয়েছে ইউরো গ্রুপ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি শক্তি। অনেক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইউরো যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ইউরো জোনের অর্থনৈতিক সংকট ইউরোর ভূমিকাকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখানে বলা ভালো, ১৯৫৭ সালে মাত্র ছয়টি দেশ নিয়ে (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ) ইউরোপীয় ঐক্য যে যাত্রা শুরু করেছিল, তা আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ)। ২৮টি দেশ এখন ইউরোর সদস্য। এর মধ্যে আবার ২৪টি ন্যাটোর সদস্য। তবে জর্জিয়া ও ইউক্রেন এখনো ন্যাটোর সদস্য হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র এই দুটি দেশকে ন্যাটোর সদস্যপদ দিতে চাচ্ছে, যাতে রাশিয়ার রয়েছে আপত্তি। ইউরোপে এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়েছে, যে সংস্থাগুলো ইউরোপীয় ঐক্যকে ধরে রেখেছে। যেমন বলা যেতে পারে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় আদালত, নিরীক্ষক দপ্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউরোপীয় ব্যাংক ও ইউরোপীয় মুদ্রা ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা। এ সংস্থাগুলো অভিন্ন ইউরোপের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা পুরো দৃশ্যপটকে এখন বদলে দিল। এখন শুধু ইউরোই নয়, বরং খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। যে যুক্তি তুলে একসময় ব্রিটেন ও ডেনমার্ক ইউরো জোনে (এক মুদ্রা নিজ দেশে চালু) যোগ দিতে চায়নি, সেই যুক্তিটি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হলো। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধারের কাজটি অত সহজ নয়। একটি দেশের সমস্যা অন্য দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ইউরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড়, তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কি না? ২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন তার পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করে, তখনই বার্লিন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ইউরোর মধ্যে বিভক্তি আছে। লুক্সেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম প্রধান অর্জন হিসেবে ইউরোর মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিল। অথচ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল, ইউরো সব দেশের স্বার্থরক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক প্রথম থেকেই ইউরোকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। পোল্যান্ড ও ইতালি চেয়েছিল ইউরোপের ক্রিশ্চিয়ান মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু ফ্রান্স এর বিরোধিতা করেছিল। দেশটি ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিল। চেক রিপাবলিক ও পোল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও ফ্রান্স ও জার্মানি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিল। এ কারণে যে নিরাপত্তার বিষয়টিতে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাশিয়াকে খেপিয়ে তুলতে পারে। জার্মানি ও স্পেন ইউরোর জন্য নতুন একটি সাংবিধানিক চুক্তি করতে চাইলেও ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস ছিল এর বিরোধী। পূর্ব ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ১৯৮৯ সালের 'ভেলভেট রেভলুশন' এ দেশগুলোকে সোভিয়েত-নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। যেখানে সমাজতন্ত্রের পতন হয় ও দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে ধাবিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের আগে পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশই ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেনি। এ দেশগুলোর ওপর কোপেনহেগেন ফর্মুলা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোপেনহেগেন ফর্মুলায় কয়েকটি শর্ত দেওয়া হয়েছিল, যা পূরণ করলেই ইউরোর সদস্যপদ পাওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু, মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবর্তন, মানবাধিকার রক্ষা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরই কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ইউরোতে যোগ দেয়। বসনিয়া-হারজেগোভিনা কিংবা ক্রোয়েশিয়া এখনো ইউরোতে যোগ দিতে পারেনি। এখন অর্থনৈতিক সংকট সব সংকটকে ছাপিয়ে গেছে। ঋণ সংকটে জর্জরিত ইউরোপে আবারও মন্দার আশঙ্কা বাড়ছে। ২০১৩-১৪ সময়সীমায় ইউরো ব্যবহারকারী ইউরো জোনের শূন্য প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। ইউরোর প্রবৃদ্ধিও ছিল শূন্যের কোঠায়। তাই ইউরোপ নিয়ে শঙ্কা থেকেই গেলা। এখন ইউরোর ঐক্য নিয়ে যে সন্দেহ, তা আরো বাড়বে। ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দুই স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স একটি দুই স্তরবিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাইছে। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট সারকোজি খোলামেলাভাবেই এই বিভক্তির কথা বলেছিলেন। জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেলও চাচ্ছেন একটা পরিবর্তন। তিনি বলছেন এক নয়া ইউরোপ গড়ার কথা। যদিও এই বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলেন ইউরোপীয় কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান জোসে ম্যানুয়েল বারোসো। এখন সত্যি সত্যিই ইউরোপ ভাগ হয়ে যাবে কি না কিংবা 'নতুন ইউরোপ'-এর স্বরূপ কী হবে, তা এ মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। তবে একটি পরিবর্তন যে আসন্ন, তা গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় ব্যর্থতা। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন যখন ইউরোতে থাকা, না থাকা নিয়ে গণভোট করতে চান, তখন ইউরোপের ঐক্যে যে ফাটলের জন্ম হয়েছে সে ইঙ্গিতই দিলেন তিনি। ক্যামেরন স্পষ্ট করেই বলেছেন, 'আমরা যদি এখনই এসব সমস্যা নিয়ে উদ্যোগ নিতে না পারি, তাহলে ইউরোপের পতন হবে এবং ব্রিটিশরাও পতনের দিকে যেতে থাকবে। অতীতে ইউরো সম্পর্কে এত ভয়ংকর কথা কেউ বলেননি। এখন ক্যামেরন সাহস করেই বললেন। সামনের দিনগুলো অত্যন্ত কঠিন সময় ইউরোর জন্য। অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সংকট যদি ইউরো কাটিয়ে উঠতে না পারে, তাহলে এটা দিব্যি দিয়েই বলা যায়, আগামী এক দশকের মধ্যে আমরা এক ভিন্ন ইউরোপের চেহারা দেখতে পাব। ব্রিটেনের মতো একটি বড় দেশ যদি ইউরো ত্যাগ করে, তাহলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব আর থাকে না। অভিবাসী প্রশ্নে ক্যামেরনের সর্বশেষ বক্তব্য প্রমাণ করে, তিনি স্পষ্টতই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট। যেখানে ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি জ্যাঁ ক্লদ জাংকার অভিবাসীদের ব্যাপারে, বিশেষ করে তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে বসবাসের একটি পরিকল্পনা করছেন, সেখানে ক্যামেরন এর বিরোধিতা করছেন। জাংকারের পরিকল্পনায় বিভিন্ন দেশের জন্য একটি 'অভিবাসী কোটা' রাখার কথা বলা হয়েছে। অথচ নয়া ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টেরেসা মে বলেছেন, এই 'কোটাব্যবস্থা'

ব্রিটেন মানবে না। এতে ইউরোপের দিকে অভিবাসীদের আসাকে উৎসাহিত করবে। এমনকি হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান কোটাব্যবস্থাকে 'বিকৃত মস্তিষ্ক ও অন্যায়' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে বলা ভালো, সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রমকালে শত শত অভিবাসী উদ্ধার হয়েছে, অথবা নৌকাডুবিতে মারা গেছে। এসব অভিবাসীর ট্যাগেট হচ্ছে ইতালি, গ্রিস, সাইপ্রাস ও মাল্টা। অতিরিক্ত অভিবাসীর চাপ সামলাতে না পেরে এই দেশগুলো ইইউয়ের কাছে প্রতিকার চেয়েছিল। গত বছর ইইউয়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলো এক লাখ ৮৫ হাজার অভিবাসীকে আশ্রয় দিয়েছে। ফলে এটা স্পষ্ট, আগামীতে এই অভিবাসী ইস্যু ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি বড় বিতর্ক তুলবে। ব্রিটেনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কনজারভেটিভরা ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। অভিবাসী ইস্যু, ইইউতে থাকা না থাকা নিয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে ডেভিড ক্যামেরন ভোটারদের কাছে গিয়েছিলেন। ভোটাররা তাঁর ওপর আস্থা রেখেছে। ফলে তিনি গণভোটের সিদ্ধান্তটি এক বছর এগিয়ে আনতে চান। এ ক্ষেত্রে গণভোটে যদি বেশির ভাগ ভোটার ইইউতে না থাকার পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে ইইউয়ের অস্তিত্ব বড় ধরনের হুমকির মুখে পড়বে। এ ক্ষেত্রে ইইউয়ের নেতারা কিভাবে ব্রিটেনকে আস্থায় নেন, সেটাই দেখার বিষয়। তবে এটা বলতেই হবে, ইইউ সংকটে আছে। এই সংকট ইইউয়ের কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়ে Daily Kalerkontho 21.05.15

ইউরোপীয় ইউনিয়ন কী ভেঙে যাবে



একজন পেনশনভোগীর আত্মহত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে গ্রিস যে এখনো অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে কথাটাই প্রমাণিত হল। এতে করে একক মুদ্রা ইউরো নিয়ে যেমনি প্রশ্ন উঠেছে, ঠিক তেমনি প্রশ্ন উঠেছে ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এখন অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি কল্পনাতেই থেকে যেতে পারে। ২০১১ সালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি কোনো অমূলক ধারণা ছিল না। বরং ১৯৫৭ সালে ইউরোপিয়ান কমিউনিটি সৃষ্টির পর ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্বাক্ষরিত ম্যাসট্রিচট চুক্তি ছিল অভিন্ন ইউরোপ গঠনের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ। ম্যাসট্রিচট চুক্তিতে একটি একক মুদ্রা ও একটি ইউরোপীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এরপর ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে সেভেন চুক্তি ও ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপের একক মুদ্রা ইউরো চালুর সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে অভিন্ন এক ইউরোপের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল ইউরোপ। বলা ভালো, ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর ইউরোপীয় কমিউনিটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) নাম ধারণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইতিমধ্যে সম্প্রসারণ ঘটেছে। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের পর ২০০৪ ও ২০০৭ সালে বেশ কটি পূর্ব ইউরোপের দেশ ইইউতে যোগ দিয়েছে। ইইউর সদস্য সংখ্যা এখন ২৭। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন ইইউর ১৫টি দেশের মাঝে ১১টি দেশ ইউরো চালু করেছিল। এখন চালু রয়েছে ১৭টি দেশে। ইউরো চালু হওয়ার সময়ই ইউরো নিয়ে প্রশ্ন ছিল। তখন বলা হয়েছিল ইউরোপের উত্তরের ধনী দেশগুলো ইউরো চালু হলে এ থেকে সুবিধা নিতে পারে। আজ এত বছর পর এই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হল। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালে ইউরো চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও, তিন বছর পর্যন্ত নিজ নিজ দেশের মুদ্রা চালু থাকে এবং ২০০২ সালের জুলাই মাসে ইউরোর কাগজি ও ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার পর পুরনো মুদ্রা বাতিল হয়ে যায়। গত নয় বছর ইউরো নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন দেখা না দিলেও, গেল বছরের প্রথম দিকে ইইউর কয়েকটি দেশ বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে। দেশগুলো ঋণ শোধ করতে না পেরে অনেকটা দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে পাপেন্ড্রের নেতৃত্বাধীন গ্রিস সরকারের পতন হয়েছে এবং পাপাদেসস অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। একইসঙ্গে ইতালির প্রধানমন্ত্রী বারলুসকোনিও পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

পাপেন্ড্র ও বারলুসকোনির পরিণতি প্রমাণ করে ইউরোপ এখনো বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সরকারগুলো প্রচুর ঋণ গ্রহণ করেও সেই ঋণ শোধ করতে পারছে না। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে পড়ছে। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করলেও, সেই দেউলিয়াত্ব রোধ করতে পারছে না। গ্রিস কিংবা ইতালি কঠোর কৃষুসাধনের কথা ঘোষণা করলেও, সাধারণ জনগণ তার বিরোধিতা করছে। তারা দিনের পর দিন বিক্ষোভ মিছিল করছে। গ্রিসের পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিখ্যাত দৈনিক গার্ডিয়ানের অনলাইন ভার্সনে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, তা দেখে দেশটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গ্রিসের একটি শহর থেসসালোনিকির গির্জার পাশে বসে এক মধ্যবয়সী রমণী ভিক্ষা করছেন। রাষ্ট্র এই রমণীর দায়িত্ব নিতে পারছে না। ফলে তাকে ভিক্ষা করে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদপুত্র হবং- এর অনলাইন ভার্সন যারা দেখেছেন সেখানেও রয়েছে গ্রিসের ভয়াবহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর একটি প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছে পেরামা জাহাজ নির্মাণ বন্দরের একটি বিবরণ দিয়ে। পেরামা বন্দর এখন জনমানবশূন্য, কোনো কর্মচাঞ্চল্য নেই, একরকম পরিত্যক্ত। গ্রিসে বেকারত্বের হার এখন শতকরা ৬০ ভাগ। সেখানে এখন কৃষুসাধন চলছে। আইএমএফের ঋণের শর্ত হিসেবে সরকারি কর্মচারীদের বেতন কমানো হয়েছে। পেনশন হ্রাস করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা এখন বন্ধ। সরকারি গড় বেতন কমিয়ে আনা হয়েছে। মাসিক ৮৬০ ডলারে, আর বেসরকারি সেক্টরে গড় বেতন মাসে ৭৫০ থেকে ১০০০ ডলার। আর বিশ্বব্যাপক বলছে বেতন কমাতে হবে ৬০০ ডলার। এক সময় হাসপাতালগুলোতে বিনে পয়সায় ওষুধ পাওয়া যেত। এখন তা পুরোপুরি বন্ধ। প্রবাসী গ্রিকদের আর্থিক সহযোগিতায় উড়পঃডঃ ডঃ ংযব ডঃঃযফ নামে একটি এনজিও এখন বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করছে। আগে এরা মাত্র ৩ দিন (সপ্তাহে) ওষুধ সরবরাহ

করত। এখন তাদের ৭ দিনই ওষুধ দিতে হয়। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে যারা ওষুধ নেন, তাদের অনেকেই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সচ্ছলভাবে দিন যাপন করতেন। এখন আয় কমে যাওয়ায় তারা স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেন না। গণপরিষদপুথর প্রতিবেদনে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক মিসেস ডেলপিনা কউটিসউম্বার ছবি ও বক্তব্য ছাপা হয়েছে। ডেলপিনা আগে মাসে বেতন পেতেন ১১৯০ ডলারের সমতুল্য। এখন তা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৬৬০ ডলার। অথচ তাকে বাসা ভাড়া দিতে হয় ৭৩০ ডলার। অধ্যাপক স্বামী ও এক সন্তান নিয়ে তার দিন আর চলছে না। ঋণের শর্ত হিসেবে দেশটির সরকারি লোকবল ১ লাখ ৫০ হাজার কমিয়ে মোট ৪ লাখ ৫০ হাজার নামিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু তাতেও কাজ হচ্ছে না। অর্থনীতি ঠিকমতো চলছে না। এখন দেশটিকে ঋণ নিয়েই ঋণের সুদের টাকা পরিশোধ করতে হচ্ছে। গ্রিসকে তার বাজেটের শতকরা ২০ ভাগ ব্যয় করতে হয় ঋণ পরিশোধে। গ্রিসের এই অর্থনৈতিক সংকট খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্বকে একটি ঝুঁকির মাঝে ঠেলে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাঠামো ভেঙে যেতে পারে, এমন আশঙ্কাও করছেন কেউ কেউ।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি শক্তি। অনেক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইউ ইউ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ইউরো জোনের অর্থনৈতিক সংকট ইউ ইউর ভূমিকাকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখানে বলা ভালো, ১৯৫৭ সালে মাত্র ৬টি দেশ নিয়ে (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ) ইউরোপীয় ঐক্যের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ)। ২৭টি দেশ এখন ইউ ইউর সদস্য। এর মাঝে আবার ২৪টি দেশ ন্যাটোর সদস্য।

ইউরোপে এরই মাঝে বেশ কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়েছে, যে সংস্থাগুলো ইউরোপীয় ঐক্যকে ধরে রেখেছে। যেমন বলা যেতে পারে— ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় আদালত, নিরীক্ষক দফতর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউরোপীয় ব্যাংক ও ইউরোপীয় মুদ্রা ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা। এই সংস্থাগুলো অভিন্ন ইউরোপের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা পুরো দৃশ্যপটকে এখন বদলে দিল। এখন শুধু ইউরোপই নয়, বরং সেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। যে যুক্তি তুলে এক সময় ব্রিটেন ও ডেনমার্ক ইউরো জোন (এক মুদ্রা নিজ দেশে চালু) যোগ দিতে চায়নি, সেই যুক্তি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হল। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধারের কাজটি অত সহজ নয়। একটি দেশের সমস্যায় অন্য দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ইউরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এখানে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড় তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা?

২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন তার পঞ্চাশতম পূর্তি উৎসব পালন করে তখনই বার্লিন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ইউ ইউর মাঝে বিভক্তি আছে। লুক্সেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম প্রধান অর্জন হিসেবে ইউরোর মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিল। অথচ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হল ইউরো সব দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক প্রথম থেকেই ইউরোকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। পোল্যান্ড ও ইতালি চেয়েছিল ইউরোপের খ্রিস্টীয়ান মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু ফ্রান্স এর বিরোধিতা করেছিল। দেশটি ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিল। চেক রিপাবলিক ও পোল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও, ফ্রান্স ও জার্মানি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিল। এ কারণে যে, নিরাপত্তার বিষয়টিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাশিয়াকে খেপিয়ে তুলতে পারে। জার্মানি ও স্পেন ইউ ইউর জন্ম নতুন একটি সাংবিধানিক চুক্তি করতে চাইলেও, ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস ছিল এর বিরোধী। পূর্ব ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ১৯৮৯ সালের 'ভেলভেট রেভলুশন' এই দেশগুলোকে সোভিয়েত নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন হয় এবং দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে ধাবিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের আগে পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশই ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেনি। এই দেশগুলোর ওপর কোপেনহেগেন ফর্মুলা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোপেনহেগেন ফর্মুলায় কতগুলো শর্ত দেওয়া হয়েছিল, যা পূরণ করলেই ইউ ইউর সদস্যপদ পাওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল— গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তন, মানবাধিকার রক্ষা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাদান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরই কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ইউ ইউতে যোগ দেয়। বসনিয়া-হারজেগোভিনা কিংবা ক্রয়েশিয়া এখনো ইউ ইউতে যোগ দিতে পারেনি। এখন অর্থনৈতিক সংকট সব সংকটকে ছাপিয়ে গেছে। ঋণ সংকটে জর্জরিত ইউরোপে আবারো মন্দার আশঙ্কা বাড়ছে। এখন ইউ ইউর ঐক্য নিয়ে যে সন্দেহ, তা আরো বাড়বে। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দুই স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স একটি দুই স্তরবিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাচ্ছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সারকোজি খোলামেলাভাবেই এ বিভক্তির কথা বলছেন। জার্মানির চ্যান্সেলর মরকেলও চাচ্ছেন একটা পরিবর্তন। তিনি বলছেন এক নয়া ইউরোপ গড়ার কথা। যদিও এই বিভক্তির বিরোধিতা করছেন ইউরোপীয় কমিশনের চেয়ারম্যান জোসে ম্যানুয়েল হারোসো। এখন সত্যি সত্যিই ইউরোপ ভাগ হয়ে যাবে কি না কিংবা 'নতুন ইউরোপ'-এর স্বরূপ কী হবে, তা এ মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। তবে একটি পরিবর্তন যে আসন্ন, তা গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় ব্যর্থতা।

ইউরোপের মানচিত্র কি বদলে যাবে!

গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং এর আগে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের ২০১৬ সালেই ইউরোপীয় ইউনিয়নে ব্রিটেনের থাকা না থাকা নিয়ে একটি গণভোট করার সিদ্ধান্ত এমন একটা আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে যে, শেষ অবধি হয়তো আর অভিন্ন ইউরোপের ধারণাটি টিকে থাকছে না। গত ৩০ জুন ছিল গ্রিসের ১০০ কোটি ৭০ লাখ ডলারের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা। গ্রিস ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঋণদাতা গোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া শর্ত গ্রিস সরকার

মানেনি। অর্থনীতি রক্ষায় তারা ৫ জুলাই এক গণভোটে যাচ্ছে। ওই গণভোটে যদি ‘না’ ভোট জয়যুক্ত হয় (যা কিনা গ্রিক সরকার চাচ্ছে), তাহলে ইউরো জোন থেকে গ্রিস বেড়িয়ে যাবে। ইউরোর বদলে মুদ্রা হিসেবে ড্রাকমা আবারো পুনঃস্থাপিত হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। অন্যদিকে ১১ মের নির্বাচনে (২০১৫) ব্রিটেনের কনজারভেটিক পার্টির পুনরায় ফিরে আসা প্রমাণ করল ব্রিটেনের মানুষ ইউরোপীয় ইউনিয়ন নয়, বরং তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য নিয়েই ইউরোপে টিকে থাকতে চায়। এখন ব্রিটেনের পথেই এগুচ্ছে গ্রিস। আগামীতে পর্তুগাল ও ইতালিও যদি একই পথ অবলম্বন করে তাহলে অবাধ হওয়ার কিছু থাকবে না। যুক্তরাজ্যের গেল নির্বাচন অনেক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল। যুক্তরাজ্যের গত ৯৩ বছরের যে গণতন্ত্র (১৯২২ থেকে) যেখানে মূলত দুটি প্রধান দলই সমতা পরিচালনা করে এই ধারা থেকে যুক্তরাজ্য এবারো বেরিয়ে আসতে পারেনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বরাবরই কনজারভেটিক ও লেবার পার্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এরাই সরকার গঠন করে। ২০১০ সালে কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল বটে। সেবার সরকার গঠনের মধ্য কনজারভেটিক দলের প্রয়োজন ছিল তৃতীয় একটি দলের সমর্থনের। লিভডেম বা লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা কনজারভেটিক পার্টির নেতা ডেভিড ক্যামেরনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যৌথভাবে একটি সরকার গঠন করেছিলেন এবং লিভডেম নেতা নিক ব্লগে উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার ইইউ প্রশ্নে লিভডেমের বড় ধরনের পরাজয় হয়েছে। এই মুহূর্তে লিভডেমকে বাদ দিয়ে ডেভিড ক্যামেরন এককভাবেই সরকার গঠন করেছেন। তিনি এবার আর একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেননি। চারটি জাতি নিয়ে যুক্তরাজ্য গঠিত এবং হাউস অব কমন্স’র আসনও সেভাবে নির্ধারিত। যেমন ইংল্যান্ডের রয়েছে ৫৩৩ আসন, ওয়েলস’র ৪০, নর্থ আয়ারল্যান্ডের ১৮ ও স্কটল্যান্ডের ৫৯। সব মিলিয়ে ৬৫০ আসনে সরকার গঠনের জন্য দরকার হয় ৩২৬টি আসন। এই নির্বাচন প্রমাণ করল যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির উত্থানের যে সম্ভাবনা ছিল, সে সম্ভাবনা আর নেই। সাধারণ মানুষদের আস্থা দুটি বড় দলের প্রতি। তবে যুক্তরাজ্যের গণতন্ত্রের এটা একটা সৌন্দর্য যে, দল যদি হেরে যায় তাহলে দল থেকে পরিবর্তন করে। এড মিলিব্যান্ড এখন আর লেবার পার্টির নেতা নন। তিনি পদত্যাগ করেছেন। একই সঙ্গে লিভডেমের নেতৃত্বও পরিবর্তন এসেছে। নিক ব্লগের পরিবর্তে আমরা এখন অন্য কাউকে দেখব লিভডেমের নেতৃত্বে। যুক্তিটা হচ্ছে দলের নেতৃত্ব যে ‘নীতি ও আদর্শ’ নিয়ে নির্বাচনে গেল, ভোটারা তা গ্রহণ করেনি। ফলে দলকে এখন ‘নয়ানীতি ও আদর্শ’ খুঁজে বের করতে হবে। স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি (এসএনপি) এখন হাউস অব কমন্স এ তৃতীয় শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই দলটি স্কটল্যান্ডের ৫৯টি আসনের মধ্য ৫৬টি আসন পেয়েছে। অথচ এই দলটি স্কটল্যান্ডকে যুক্তরাজ্য ইউনিয়ন থেকে বের করে নিয়ে একটি স্বাধীন দেশ গড়তে চায়। এটা ছিল তাদের সেটোগান। যদিও গেল সেপ্টেম্বরে (২০১৪) স্কটল্যান্ডে স্বাধীনতার প্রশ্নে যে গণভোট হয়েছিল তাতে যুক্তরাজ্যে থাকার পক্ষেই ভোট পড়েছিল বেশি। এখন এসএসপির নেত্রী নিকোলা স্টারজিওন কী ভূমিকা নেন, সে দিকে অনেকের লক্ষ্য থাকবে। যদিও ইতোমধ্যেই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি আবারো একটি গণভোটের উদ্যোগ নেবেন। ফলে তার ভবিষ্যৎ রাজনীতি নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকলই। ইউরোপের মানচিত্র কি বদলে যাবে! প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন নির্বাচনের আগেই বলেছিলেন ভবিষ্যতে যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে কিনা, এটা নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তা যাচাই করে দেখার জন্য আগামী ২০১৭ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে একটি গণভোটের আয়োজন করবেন। মানুষ এতে সায় দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা, না থাকা নিয়ে ব্রিটেনের একটা বিতর্ক আছে। ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে আছে বটে, কিন্তু ইউরোপীয় মুদ্রা ‘ইউরো’ তে কখনই যোগ দেয়নি। ১৯৫৭ সালে মাত্র ৬টি রাষ্ট্র নিয়ে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিটি (ইইসি) যাত্রা শুরু করে আজ তা ইউরোপীয় ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৩ সালে যুক্তরাজ্য তৎকালীন ইইসিতে যোগ দেয়। আর ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের মাঝে ১২টি দেশ অভিন্ন মুদ্রা ইউরোপ চালু করে। পরবর্তীতে আরো কয়েকটি দেশ (মোট ১৯টি) ইউরো গ্রহণ করে। কিন্তু যুক্তরাজ্য তাদের মুদ্রা পাউন্ডকে ধরে রেখেছে। তুলনামূলক বিচারে ব্রিটেনের মানুষ কিছুটা কনজারভেটিক। তারা মনে করে ইইউ বা ইউরোতে যোগ দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের স্বীকৃতি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি হারিয়ে যাওয়া। তাই তারা বারবার ইউরো গ্রহণ করার বিপক্ষে মত দিয়ে আসছে। এখন কনজারভেটিকদের বিজয় এই প্রশ্নটাকেই সামনে নিয়ে আসল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একটি শক্তি। অনেক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ইইউ যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে গিয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু ইউরো জোন এর অর্থনৈতিক সংকট ইইউর ভূমিকাকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখানে বলা ভালো ১৯৫৭ সালে মাত্র ৬টি দেশ নিয়ে (বেলজিয়াম, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ) ইউরোপীয় এককের যে যাত্রা শুরু করেছিল, তা আজ পরিণত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ)। ২৮টি দেশ এখন ইইউর সদস্য। এর মাঝে আবার ২৪টি দেশ ন্যাটোর সদস্য। তবে জর্জিয়া ও ইউক্রেন এখনো ন্যাটোর সদস্য হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র এই দুটি দেশকে ন্যাটোর সদস্য পদ দিতে চাচ্ছে, যাতে রাশিয়ার রয়েছে আপত্তি। ইউরোপে এরই মাঝে বেশ কয়েকটি সংস্থার জন্ম হয়েছে, যে সংস্থাগুলো ইউরোপীয় এককে ধরে রেখেছে। যেমন বলা যেতে পারে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় আদালত, নিরীক্ষক দফতর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, আঞ্চলিক কমিটি, ইউরোপীয় ব্যাংক ও ইউরোপীয় মুদ্রা ইনস্টিটিউট ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কথা। এই সংস্থাগুলো অভিন্ন ইউরোপের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু ইউরোপের অর্থনৈতিক মন্দা পুরো দৃশ্যপটকে এখন বদলে দিল। এখন শুধু ইইউরই নয়, বরং খোদ ইউরোপীয় ইউনিয়নের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। যে যুক্তি তুলে এক সময় ব্রিটেন ও ডেনমার্ক ইউরো জোনে (এক মুদ্রা নিজ দেশে চালু) যোগ দিতে চায়নি সেই যুক্তিটি এখন সত্য বলে প্রমাণিত হলো। অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধারের কাজটি অত সহজ নয়। একটি দেশের সমস্যায় অন্য দেশ আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে ইউরোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বড়, তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান কাঠামো আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা? ২০০৭ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যখন তার পঞ্চাশতম পূর্তি উৎসব পালন করে তখনই বার্লিন ঘোষণার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ইইউর মাঝে বিভক্তি আছে। লুক্সেমবার্গ ইউরোপের অন্যতম প্রধান অর্জন হিসেবে ইউরোর মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছিল। অথচ মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছিল ইউরো সব দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না। ব্রিটেন ও ডেনমার্ক প্রথম থেকেই ইউরোকে প্রত্যাখ্যান করে আসছিল। পোল্যান্ড ও ইতালি চেয়েছিল ইউরোপের খ্রিস্টীয়ান মূল্যবোধকে প্রধান্য দিতে। কিন্তু ফ্রান্স এর বিরোধিতা করেছিল। দেশটি ধর্মকে আলাদা রাখতে চেয়েছিল। চেক রিপাবলিক ও

পোল্যান্ড নিরাপত্তার বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিলেও ফ্রান্স ও জার্মানি এটা নিয়ে চিন্তিত ছিল এ কারণে যে, নিরাপত্তার বিষয়টিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ রাশিয়াকে খেপিয়ে তুলতে পারে। জার্মানি ও স্পেন ইইউর জন্য নতুন একটি সাংবিধানিক চুক্তি করতে চাইলেও ব্রিটেন ও নেদারল্যান্ডস ছিল এর বিরোধী। পূর্বে ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ১৯৮৯ সালের ‘ভেলভেট রেভলুশন’ এই দেশগুলোকে সোভিয়েত নির্ভরতা থেকে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে। সেখানে সমাজতন্ত্রের পতন হয় ও দেশগুলো গণতন্ত্রের পথে ধাবিত হয়। কিন্তু ২০০৪ সালের আগে পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশই ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে পারেনি। এই দেশগুলোর ওপর কোপেনহেগেন ফর্মুলা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। কোপেনহেগেন ফর্মুলায় কতগুলো শর্ত দেয়া হয়েছিল। যা পূরণ করলেই ইইউর সদস্যপদ পাওয়া যাবে। শর্তগুলোর মধ্যে ছিল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু, মুক্তবাজার অর্থনীতি প্রবর্তন, মানবাধিকার রক্ষা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এসব শর্ত পূরণ হওয়ার পরই কয়েকটি পূর্ব ইউরোপীয় দেশ ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ইইউতে যোগ দেয়া বসনিয়া-হারজেগোভিনা, কিংবা ক্রোয়েশিয়া এখনো ইইউতে যোগ দিতে পারেনি। এখন অর্থনৈতিক সংকট সব সংকটকে ছাপিয়ে গেছে। ঋণ সংকটে জর্জরিত ইউরোপে আবারো মন্দার আশংকা বাড়ছে। ২০১৩-২০১৪ সময় সীমায় ইউরো ব্যবহারকারী ইউরো জোনের শূন্য প্রবৃদ্ধি হয়েছিল। ইইউর প্রবৃদ্ধিও ছিল শূন্যের কোটায়। তাই ইউরোপ নিয়ে শঙ্কা থেকেই গেলা। এখন ইইউর এক্য নিয়ে যে সন্দেহ, তা আরো বাড়বে। ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোকে দু’স্তরে বিভক্ত করার প্রস্তাব উঠেছে। জার্মানি ও ফ্রান্স একটি দু’স্তর বিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাচ্ছে। ফ্রান্সের সাবেক প্রেসিডেন্ট সারকোজি খোলামেলাভাবেই এই বিভক্তির কথা বলেছিলেন। জার্মানির চ্যান্সেলর মার্কেলও চাচ্ছেন একটা পরিবর্তন। তিনি বলেন এক নয়া ইউরোপ গড়ার কথা। যদিও এই বিভক্তির বিরোধিতা করেছিলেন ইউরোপীয় কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান জোসে ম্যানুয়েল বারোসো। এখন সত্যি সত্যিই ইউরোপ ভাগ হয়ে যাবে কিনা, কিংবা ‘নতুন ইউরোপ’ এর স্বরূপ কি হবে, তা এই মুহূর্তে বলা খুব কঠিন। তবে একটি পরিবর্তন যে আসন্ন, তা গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছোট অর্থনীতির দেশগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। এটাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় ব্যর্থতা। তাই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন যখন ইইউতে থাকা, না থাকা নিয়ে গণভোট করতে চান, তখন ইউরোপের একে যে ফাটলের জঙ্ক হয়েছিল, তারই ইঙ্গিত দিলেন তিনি। ক্যামেরন স্পষ্ট করেই বলেছেন, ‘আমরা যদি এখনই এসব সমস্যা নিয়ে উদ্যোগ নিতে না পারি তাহলে ইউরোপের পতন হবে এবং ব্রিটিশরাও পতনের দিকে যেতে থাকবে।’ অতীতে ইইউ সম্পর্কে এত ভয়ঙ্কর কথা কেউ বলেননি। এখন ক্যামেরন সাহস করেই বললেন। সামনের দিনগুলো অত্যন্ত কঠিন সময় ইইউর জন্য। অর্থনীতি ও রাজনৈতিক সংকট যদি ইইউ কাটিয়ে উঠতে না পারে, তাহলে এটা দিব্য দিয়েই বলা যায় আগামী এক দশকের মধ্যে আমরা এক ভিন্ন ইউরোপের চেহারা দেখতে পাব। তাই ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকলই, এখন ৫ জুলাইয়ের পর গ্রিস যদি ইউরো জোন থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশকে উৎসাহ জোগাতে পারে। এতে করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক ধরনের অস্তিত্ব সংকটের মুখে থাকবে। বিশ্ব খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। চীনের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে ‘এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক’ বা এআইআইবি। জার্মানি কিংবা ডেনমার্কের মতো অনেক ইউরোপিয়ান দেশ ৫৭ সদস্য বিশিষ্ট এই ব্যাংকে যোগ দিয়েছে। বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে এশিয়ার বিশ্ব ব্যাংক। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফের খবরদারি যে কমবে তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না। গ্রিস আইএমএফের শর্ত না মানায় এই সমস্যার মুখোমুখি হয়। রাষ্ট্রটি দেউলিয়া হয়ে যায়। তবে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের ক্ষেত্রেও অতীতে আমরা দেখেছি ওই রাষ্ট্র দুটি এক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে শর্ত সাপেক্ষে আইএমএফ পুনরায় ঋণ দেয়া। তবে গ্রিসের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। তারা ৫ জুলাই গণভোট করবে। এতে করে তারা আইএমএফের চাপিয়ে দেয়া শর্ত মানবে কি মানবে না, এই সিদ্ধান্তটি হবে। শর্ত না মানার পক্ষেই জনমত বেশি। ফলে অন্য ঋণদাতা সংস্থাগুলোও এগিয়ে আসবে না। স্পষ্টতই ইউরোপ বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়েছে। এই সংকট থেকে ওরা কীভাবে বেরিয়ে আসে, সেদিকেই লক্ষ্য থাকবে সবার। কেননা এর সঙ্গে অনেক প্রশ্ন জড়িত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভেঙে গেলে বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস পাওয়া এবং সর্বোপরি ইউরোপে চীন-রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়া সব কিছুই ঘটতে পারে একের পর এক। গ্রিস এআইআইবি ব্যাংকে যোগ দেয়নি। এখন হয়ত গ্রিস বাধ্য হবে এ ব্যাংকে যোগ দিতে এবং সহজ শর্তে ঋণও গ্রহণ করবে। তাই আগামী দিনের ইউরোপের দিকে লক্ষ্য থাকবে সবার। Daily Manobkontho 05.07.15

আরব বসন্ত থেকে ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন

২০১১ সাল শেষ হয়ে গেল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে। বিদ্যায়ী বছরটি শুরু হয়েছিল আরব বিশ্বে গণজাগরণের মধ্যে দিয়ে। আর শেষ হল উত্তর কোরিয়ার ‘মহান নেতা’ কিম জং ইলের মৃত্যু ও তার ছোট সন্তান কিম জং উনের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে। কোন সমাজতান্ত্রিক দেশ যে পারিবারিকভাবে শাসিত হতে পারে উত্তর কোরিয়া তার বড় প্রমাণ। একসময় উত্তর কোরিয়া শাসন করতেন ‘লৌহমানব’ কিম উল সুং। তার মৃত্যুর পর (১৯৯৪) ক্ষমতা নেন তার সন্তান কিম জং ইল। আর এখন ক্ষমতা নিলেন কিম জং উন। ২০১১ সালের অনেক ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, কিম জং উন উত্তর কোরিয়ায় এক ধরনের সংস্কার আনতে পারেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ‘যুদ্ধে’ জড়িয়ে পড়তে পারেন কিংবা তার শাসনামলে দুই কোরিয়া একত্রিত হতে পারে। এমনকি পারিবারিক দ্বন্দ্বও জড়িয়ে পড়তে পারেন কিম জং উন। অনেক প্রশ্নকে সামনে রেখে এখন কোরিয়ার রাজনীতি আবর্তিত হবে। মনে রাখতে হবে, উত্তর কোরিয়া অষ্টম পারমাণবিক শক্তির দেশ। একদিকে উত্তর কোরিয়ায় চরম খাদ্য সংকট, অন্যদিকে উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক কর্মসূচি, সব মিলিয়ে কোরীয় উপদ্বীপের রাজনীতি যে আগামী দিনগুলোতে আলোচিত হতে থাকবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২০১১ সালে বেশকিছু বিষয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঝড় তুলেছিল। ১৯৬৮ সালে সাবেক চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে সমাজতন্ত্রবিরোধী যে আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে যা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল, ইতিহাসে ওই আন্দোলন চিহ্নিত হয়ে আছে ‘প্রাগ বসন্ত’ হিসেবে। ২০১১ সালের পুরোটা সময় আরব বিশ্বে একটা গণআন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, যা চিহ্নিত হয়েছে ‘আরব বসন্ত’ হিসেবে। যুক্তরাষ্ট্রে পুঁজিবাদবিরোধী যে ‘অকুপাই মুভমেন্ট’-এর জন্ম হয়েছে, তার রেশ এখনও রয়ে গেছে। ওই মুভমেন্টের সঙ্গে ‘আরব বসন্ত’-এর সরাসরি কোন মিল নেই সত্য, কিন্তু অসমতা আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে ‘অকুপাই মুভমেন্ট’-এর স্পিরিট এর সঙ্গে ‘আরব বসন্ত’-এর স্পিরিটের একটা মিল আছে। কেননা আরব বিশ্বে একটা শ্রেণী দীর্ঘদিন ধরে সব ধরনের ক্ষমতা ভোগ করে আসছিলেন। সেখানেও একটা অসমতা ও বৈষম্য তৈরি হয়েছিল। তিউনেসিয়ার তরুণ ফল বিক্রেতা (সনি ছিলেন বেকার এক কম্পিউটার গ্রাফুয়েট) বুয়াজিজি ছিলেন সেই অসমতা আর বৈষম্যের প্রতীক। বুয়াজিজির আত্মহত্যা তিউনেসিয়ায় ‘আরব বসন্ত’র সূচনা করেছিল, যা ছড়িয়ে গিয়েছিল মিসর, মরক্কো, বাহরাইন, লিবিয়া ও সিরিয়াতে। সিরিয়া বা বাহরাইনে এখন অবদি সরকার পরিবর্তন না হলেও, এক নায়কতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটেছে। তিউনেসিয়ায় জয়নাল আবেদিন বেন আলীর, মিসরের হোসনি মোবারকের, লিবিয়ার গাদ্দাফির, আর ইয়েমেনের আলী আবদুল্লাহ সালেহেরা সঙ্গত কারণেই টাইমস সাময়িকী যখন এই গণঅভ্যুত্থানকে বছরের সেরা ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করে, এর পেছনে যুক্তি রয়েছে বৈকি! কিন্তু শুধু ওই গণঅভ্যুত্থানকে সেরা ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। আমার বিবেচনায় মে মাসে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরে আল কায়দার শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাও বিশ্ব রাজনীতিতে ২০১১ সালের অন্যতম সেরা ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হতে বাধ্য। এর পেছনে যুক্তিও রয়েছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে আল কায়দার উত্থান ও ইসলামী সন্ত্রাসবাদের জন্ম বিশ্ব রাজনীতিকে পরিপূর্ণভাবে বদলে দিয়েছিল। একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী মনোভাবের কারণে বিশ্ব রাজনীতিতে জন্ম হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র চ্যালেঞ্জকারী শক্তি। কিন্তু ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাবকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ থাকল না। কিন্তু ২০০১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে টুইন টাওয়ারে হামলা ও তা ধ্বংস করা, পেন্টাগনের ব্যর্থ বিমান হামলা চালানোর মধ্যে দিয়ে সারা বিশ্ব জানলো আল-কায়দা নামের একটি সংগঠনের নাম, যারা ইসলাম ধর্মকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। যদিও এটা আজো অস্পষ্ট রয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একসঙ্গে একই সময়ে চারটি বিমান হাইজ্যাক করে আত্মঘাতী হামলা চালানোর সঙ্গে ইসলামী জঙ্গির কতটুকু জড়িত ছিল। যদিও আল-কায়দা ওই হামলার সঙ্গে তার দায় স্বীকার করে নিয়েছিল, কিন্তু আরেক প্রশ্নের জবাব আজও মেলেনি। টুইন টাওয়ার হামলাকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তান আক্রমণ করা ও দেশটি দখল করে নেয়া, পাকিস্তানে লাদেনের আশ্রয় ও পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার তা না জানার কথা, ইত্যাদি গত দশ বছরে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেসব প্রশ্নের জবাব এই মুহূর্তে হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু ইতিহাস হয়তো একদিন বলবে কী ঘটেছিল লাদেনকে ঘিরে। লাদেন অ্যাবোটাবাদে বসবাস করতেন পাঁচ বছর ধরে এবং দুই স্ত্রীসহ কোন রকম নিরাপত্তা ব্যুহ ছাড়াই। যাকে সারা বিশ্বের গোয়েন্দারা হন্যে হয়ে খুঁজছিল, তিনি কিনা একাকী বসবাস করতেন একটি বাড়িতে! পাকিস্তানের কোন গোয়েন্দা সংস্থা ই তা জানবে না? এটা কী বিশ্বাসযোগ্য? লাদেনকে হত্যার পর ‘ফরেন পলিসি’ ম্যাগাজিনের অনেকগুলো ছবি ছাপা হয়েছিল অ্যাবোটাবাদের ওই বাড়িকে নিয়ে। একটি ছবি ছিল পাঁচ বছর আগের তোলা। সূত্র সিআইএ। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ওই বাড়িটি দেখানো হয়েছিল। প্রশ্ন এসে যায়, পাঁচ বছর আগে যদি সিআইএ ওই বাড়িটি চিহ্নিত করে থাকে (যেখানে লাদেন লুকিয়ে থাকতে পারেন এমন আশংকা করা হয়েছিল), তাহলে সিআইএ এত সময় নিল কেন লাদেনকে হত্যা করার? আরও একটা প্রশ্ন মৃত লাদেনের ছবি সিআইএ ‘রিলিজ’ করল না কেন? নাকি লাদেনের নামে যাকে হত্যা করা হয়েছিল, সে অন্য কেউ! এসব প্রশ্নের কোন জবাব নেই। তবে লাদেনকে নিয়ে একটা ‘মিথ’ তৈরি হয়েছিল। এই ‘মিথ’কে উসকে দিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে একটা প্রচারণা চালানো হয়েছিল। আর এর মধ্যে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার স্বার্থ আদায় করে নিয়েছে। বিশ্বব্যাপী তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইরাক দখল করে নিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। আর সর্বশেষ ঘটনায় গাদ্দাফিও উৎখাত হলেন।

যুদ্ধ মানেই ব্যবসা। যুদ্ধের নামে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা করেছে মার্কিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো। ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের মতো ও দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। প্রতি মাসে এই দুটো দেশে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৯ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার। চিন্তা করা যায় কী বিপুল পরিমাণ অর্থ যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করেছে এই ‘যুদ্ধ’ এর পেছনে। সুতরাং অবিশ্বাস্য লাদেনের মৃত্যু আমার কাছে ২০১১ সালের অন্যতম একটি ঘটনা। এর গুরুত্ব এ কারণে বেশি যে লাদেনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড আদৌ বন্ধ হয়ে যাবে কিনা? যদিও লাদেনের মৃত্যুর ছ’মাস পার হয়ে গেছে এবং আল কায়দার কোন বড় ধরনের আক্রমণ আমরা বিশ্বের কোথাও লক্ষ্য করছি না। যুক্তরাষ্ট্র ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ এর যে ধারণা উসকে দিয়েছিল, তাতে কোটি কোটি ডলার খরচ করেও ওই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আদৌ বন্ধ করা যায়নি। ইরাকে ও আফগানিস্তানে আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। পাকিস্তান আজ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। আগামী ২০ বছরে এ অঞ্চলের মানচিত্র যদি বদলে যায়, আমি অবাক হব না। ২০১১ সালের আরও বেশ কয়েকটি ঘটনা গুরুত্বের দাবি রাখে। যেমন বলা যেতে পারে ইউরোপের অর্থনৈতিক সংকট। ইউরোপের এই অর্থনৈতিক সংকটে পর্তুগাল, চীন ও ইটালির সরকারের পতন ঘটেছে। গ্রিসের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। রাষ্ট্রটি দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম। কৃষ্ণ সাধন করেও অর্থনীতিকে বাগে আনা যাচ্ছে না। ইউরোপের ওই অর্থনৈতিক সংকট দু’টো বিষয়কে সামনে নিয়ে এসেছে। এক, একক মুদ্রা হিসেবে ইউরো টিকে থাকবে কিনা? দুই, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার ঐক্যকে ধরে রাখতে পারবে কিনা? ২৭টি দেশ নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। এর মাঝে

১৭টি দেশে ইউরো চালু রয়েছে। একটা প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠেছে যে ইউরোপের ধনী দেশগুলো ইউরোপের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যেই ধনী ও গরিব রাষ্ট্রের জঙ্ক হয়েছে। ইউরোপের এই সংকট ২০১২ সালেও অব্যাহত থাকবে, যা নতুন নতুন সংকটের জঙ্ক দেবে। ফুকুসিমায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ, ডারবানে ব্যর্থ জলবায়ু সম্মেলন, ইরানের পারমাণবিক সংকট, ইত্যাদি বিষয়গুলোকেও হালকাভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। ফুকুসিমায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর এখন পারমাণবিক বিদ্যুতের ভবিষ্যৎ একটা প্রশ্নের মুখে থাকল। খোদ জাপানের মতো দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন যেখানে ঝুঁকির মুখে, সেখানে বাংলাদেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকবেই। বাংলাদেশ এরই মাঝে রাশিয়ার সঙ্গে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ব্যাপারে একটি চুক্তি করেছে। ডারবানে কপ-১৭ সম্মেলনে বিশ্বের উষ্ণতা হ্রাসকল্পে একটি চুক্তিতে উপনীত হতে ব্যর্থ হওয়ায় ধনী ও গরিব দেশগুলোর মধ্যে ‘জলবায়ু বৈষম্য’ আরও বাড়লো। গত বেশকয়েক বছর ধরে ‘কপ’ সম্মেলন হয়ে আসছে। কিন্তু কোন ঐকমত্যে পৌঁছান সম্ভব হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বিশ্বের দেশগুলোয় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্নে নানা ধরনের প্রশ্নের জঙ্ক হয়েছে। ডারবানে কিয়েটো চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে সত্য, কিন্তু কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ যদি হ্রাস করা না যায়, তাহলে বিশ্ববাসীর জন্য তা কোন ভালো সংবাদ নয়।

গেল বছর পাকিস্তান ও রাশিয়ার জন্যও কোন ভালো সংবাদ ছিল না। পাকিস্তানে একাধিকবার সামরিক অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সর্বশেষ ঘটনায় সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জারদারির সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাঝেও বিভক্তি লক্ষ্য করা গেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কেরও অবনতি ঘটেছে। পাকিস্তান আফগান শান্তি আলোচনা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফলে আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। পাকিস্তানের অংশগ্রহণ ছাড়া আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। রাশিয়ার রাজনীতিতে অস্থিরতা বাড়ছে। ডিসেম্বরে ‘ডুমা’র নির্বাচন নিয়ে যা হল, তা নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। রাশিয়া এক ভিন্ন আঙ্গিকে গণতন্ত্র চর্চা করছে। সেখানে ব্যক্তি ও দলীয় কর্তৃত্ব বাড়ছে। পুতিনকে ঘিরে তৈরি হয়েছে একটি ‘রাজনৈতিক বলয়’, যারা যেভাবে হোক ক্ষমতা ধরে রাখতে চাইছে, অনেকটা সাবেক সোভিয়েত শাসনামলে কমিউনিস্ট পার্টির মতো। পুতিন আবার মার্চে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ক্ষমতায় তিনি থাকতে চান। ১৯৯৯ সালের পর থেকেই তিনি ক্ষমতায় আছেন। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত, পরে পর পর দু’বার প্রেসিডেন্ট, এর পর আবার প্রধানমন্ত্রী। ইতিমধ্যে সেখানে যে গণবিক্ষোভের জঙ্ক হয়েছে, তার নামকরণ করা হয়েছে ‘স্লাভিক বসন্ত’ হিসেবে। রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট মেদভেদেভ রাশিয়ায় একটি সংস্কারের আহ্বান জানালেও, সেখানে আদৌ কোন সংস্কার আনা হবে কিনা, সেটাই বড় প্রশ্ন এখন। মূলত একদিকে গণতন্ত্রের লড়াই অন্যদিকে অসমতা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ২০১১ সালের বিশ্ব রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। এর প্রভাব চলতি বছরেও অনুভূত হবে। দৈনিক যুগান্তর, ১ জানুয়ারি ২০১২ড. তারেক শামসুর রেহমান

মিয়ানমারের গণতন্ত্র ও ভবিষ্যৎ রাজনীতি

মিয়ানমারের সাধারণ নির্বাচনে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসির (এনএলডি) বিজয় এবং ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন এবং সেনাপ্রধান জেনারেল মিন অং থাং-ইং কর্তৃক এই রায় মেনে নেয়ার মধ্য দিয়ে যে প্রশ্নটি সামনে চলে আসল তা হচ্ছে মিয়ানমারে কি শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে? ১৯৯০ সালের নির্বাচনের পরও এমন একটি সম্ভাবনার জঙ্ক হয়েছিল। ওই নির্বাচনেও অং সান সুচির দল বিজয়ী হয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী ওই নির্বাচন মেনে নেয়নি। বরং নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে অং সান সুচিকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল। আজ ২৫ বছর পর এমন একটি সম্ভাবনার জঙ্ক হতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও, আজকের পরিস্থিতি ভিন্ন। বিশ্ব রাজনীতি তথা আঞ্চলিক রাজনীতিতেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এখন গণতন্ত্রের ব্যাপারে আরো বেশি ‘কমিটেড’। ফলে আন্তর্জাতিক মিডিয়া ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ‘চাপ’ থাকায় এই নির্বাচন বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তবে সংশয় যে নেই, তাও বলা যাবে না। সংশয়, উদ্যোগ এবং নানা প্রশ্নও আছে। অং সান সুচি বলেছেন ‘তার ভূমিকা হবে প্রেসিডেন্টের উর্ধ্বে’। তিনি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন সত্য, কিন্তু সংবিধানের বাইরে তিনি যেতে পারবেন না। সংবিধান তিনি পরিবর্তনও করতে পারবেন না। এর অর্থ হচ্ছে, সংবিধান তাকে মানতে হবে এবং সংবিধান মানলে তাকে বর্তমান প্রেসিডেন্টকে (২০১৬, মার্চ) মানতে হবে। ফলে সুচি যদি ‘জোর করে’ কিছু করতে চান, তাহলে সংকট ঘনীভূত হবে এবং তাতে করে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তিনি বিবাদে জড়িয়ে যাবেন, যা মিয়ানমারের বিকাশমান গণতন্ত্রের জন্য কোন ভালো খবর বয়ে আনবে না। তাহলে তার ভূমিকা কি হবে? তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। কেননা সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর পদটি অবলুপ্ত করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন এনএলডিকে নিয়েই সরকার গঠন করবেন। সংবিধান অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ও ক্যাবিনেটে সভাপতিত্ব করবেন। মন্ত্রিসভায় এনএলডির মন্ত্রী থাকলেও মূল ব্যক্তি হবেন প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন, অং সান সুচি নন। এ ক্ষেত্রে সুচির জন্য প্রশাসনিক আদেশে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদায় একটি পদ সৃষ্টি করা হতে পারে। অথবা সুচি মন্ত্রিসভায় যোগ না দিয়েও পদার অন্তরালে (অনেকটা ভারতে সোনিয়া গান্ধীর মতো) থেকে মন্ত্রিসভা পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু নির্বাচনের আগে সুচিকে যেভাবে মানুষ দেখেছে, নির্বাচনের পর মানুষ দেখেছে ভিন্নভাবে। তিনি বিদেশি গণমাধ্যমকে ইন্টারভিউ দিয়ে যেভাবে নিজের মনোভাবকে তুলে ধরছেন, তা তার কর্তৃত্ববাদী মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। যেখানে তার উচিত ছিল একটা আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলা, ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব দেয়া, এটা না করে তিনি এক ধরনের ‘ছমকির সুরে’ সরকার পরিচালনার কথা বলছেন। গণতন্ত্রের নামে এ ধরনের কর্তৃত্ববাদী আচরণ আমরা কোনো কোনো দেশে লক্ষ্য করি। মালয়েশিয়ায় ক্ষমতাসীন জোট গণতন্ত্রের নামে এক ধরনের কর্তৃত্ববাদী আচরণের জঙ্ক দিয়েছে। সিঙ্গাপুরে একদলীয় (পিপলস অ্যাকশন পার্টি) শাসন বজায়

রয়েছে। যদিও জনগণই তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে। কম্পুচিয়ায় সমাজতন্ত্র পরবর্তী কাঠামোয় একদলীয় (পিপলস পার্টি) শাসন বর্তমান। থাইল্যান্ডে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করলেও সেখানে থাকসিন সিনাওয়াত্রার দলের প্রভাব অনেক বেশি। তার নামেই তার বোন ইংলাক সিনাওয়াত্রা বিজয়ী হয়েছিলেন এবং সরকারও গঠন করেছিলেন। সমাজতন্ত্র পরবর্তী মধ্য এশিয়ার প্রতিটি দেশে গণতন্ত্রের নামে একদলীয় কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে। আমরা বেলারুশের কথাও বলতে পারি। এখানে নির্বাচন হচ্ছে বটে, কিন্তু কারচুপির মাধ্যমে নির্বাচন ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে নেয়া হচ্ছে। এখন অং সান সুচি কী এ পথেই যাচ্ছেন? ক্ষমতা নিতে হলে তাকে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। সংবিধান সংশোধনের একটি উদ্যোগ তিনি নিতে পারেন। কিন্তু সেনাবাহিনী এই উদ্যোগকে সমর্থন করবে এটা মনে হয় না। জনগণই যে ‘সকল ক্ষমতার উৎস’ মিয়ানমারের নির্বাচন এই কথাটা আবার প্রমাণ করল। এই নির্বাচন পরবর্তী থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের সাংবিধানিক শক্তিকে উৎসাহিত করবে। দেশটিতে এই প্রথমবারের মতো সংসদে কোনো মুসলিম প্রতিনিধিত্ব থাকল না। ফলে মুসলমানদের মাঝে ক্ষোভ ও অসন্তোষ আরো দানা বাঁধবে। উগ্রপন্থি বৌদ্ধরা মুসলিম নিধন ও উৎখাতে আরো উৎসাহিত হবে। রোহিঙ্গা সমস্যার ব্যাপকতা আরো বৃদ্ধি পাবে। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত সংসদের মেয়াদ ৫ বছর। অর্থাৎ জানুয়ারিতে যখন সংসদ গঠিত হবে, তারপর ২০২০ সাল পর্যন্ত এই সংসদ টিকে থাকার কথা। সময়টা অনেক লম্বা। নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার আগে এখন অন্তত এক মাস সময় থাকবে হাতে। সুচি এই সময়টা কাজে লাগাবেন সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটি ‘সমঝোতায়’ যেতো সম্ভবত এটাই তার জন্য শেষ সময়। ২০১০ সালেও একটি নির্বাচন হয়েছিল। তার দল ঠিক সময়মতো নিবন্ধন করতে না পারায় অথবা নিবন্ধন না করায় ৫ বছর পিছিয়ে গিয়েছিলেন সুচি। এবারো যদি তিনি ভুল করেন, তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে ২০২০ সাল পর্যন্ত। সময়টা অনেক বেশি। সুচির বয়স গিয়ে দাঁড়াবে তখন ৭৪। এরপর তার পক্ষে আর রাজনীতিতে সক্রিয় থাকা সম্ভব হবে না। সে কারণেই তিনি মিয়ানমারের সমাজে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে মেনে নেবেন। আমরা তার নির্বাচন বিজয়ে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের জন্য মিয়ানমারে একটি বন্ধুপ্রতিম সরকার থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতির জন্য মিয়ানমার আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সড়ক পথ চালু হলে এই সড়ক পথে একদিকে যেমনি আমাদের চীনের সঙ্গে সংযোগ ঘটবে। অন্যদিকে আমরা আমাদের পণ্য নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতেও যেতে পারব। আমাদের পণ্যের বিশাল এক বাজার সৃষ্টি হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উভয় দেশই বিমস্টেক (ইওগব্বাওউঈ, পরিবর্তিত নাম ইইওগব্বাওউঈ) এবং ইঈওগ জোটের সদস্য। যদিও প্রস্তাবিত ইঈওগ জোটটি এখনো আলোর মুখ দেখেনি। ভুটান ও নেপাল বিমস্টেক জোট যোগ দেয়ায় এই জোটটি শক্তিশালী হয়েছে। এই জোটের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা। মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে চট্টগ্রামে মিয়ানমারের কাঁচামালভিত্তিক ব্যাপক শিল্প কারখানা স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষিভিত্তিক মিয়ানমারে বাংলাদেশি সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন চট্টগ্রাম এলাকায় বেশ কিছু সার কারখানা স্থাপন করে বাংলাদেশ মিয়ানমারে সার রফতানি করতে পারে। মিয়ানমারের আকিয়াব ও মংডুর আশপাশের অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ, কাঠ ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। এসব কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সিমেন্ট ও কাগজ শিল্প বিকশিত হতে পারে। মিয়ানমারে প্রচুর জমি অনাবাদী রয়েছে। এ অবস্থায় মিয়ানমারের ভূমি লিজ নিয়ে বাংলাদেশের জন্য চাল উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। মন্দালয়-ম্যাগওয়ের তুলা আমদানি করতে পারে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ তার ক্রমবর্ধিষ্ণু গার্মেন্টস সেক্টরের কাঁচামাল হিসেবে তুলা মিয়ানমারের এই অঞ্চল থেকে আমদানি করতে পারে। গবাদিপশু আমদানি করার সম্ভাবনাও রয়েছে। বাংলাদেশিরা মিয়ানমারে গবাদিপশুর খামারও গড়ে তুলতে পারে। মিয়ানমারের সেগুন কাঠ পৃথিবী বিখ্যাত। আমাদের ফানিচার শিল্পের চাহিদা মেটাতে পারে এই সেগুন কাঠ, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপে আমাদের ফানিচার শিল্পের প্রসার ঘটাতে পারি। মিয়ানমার মূল্যবান পাথর যেমন রুবি, জেড, বোম আর মার্বেল সমৃদ্ধ। এসব মূল্যবান পাথর আমাদের জুয়েলারি শিল্পকে সমৃদ্ধ করে। ভ্যালুএডিশনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক হতে পারে। ভারত-মিয়ানমার প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপ লাইন থেকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশও উপকৃত হতে পারে। ভারতীয় কোম্পানি রিলায়েন্স মিয়ানমারের গভীর সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত রয়েছে। এই গ্যাস তারা পাইপ লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতে নিয়ে যেতে চায়। অতীতে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের আপত্তি ছিল। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। বাংলাদেশ মিয়ানমারের গ্যাস ব্যবহার করে সেখানে বিদ্যুৎ তথা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, যা পরে বাংলাদেশে রফতানি করা সম্ভব হবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না বাংলাদেশের যে পূর্বমুখী পররাষ্ট্রনীতি, সেখানে মিয়ানমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এ কারণে মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটা ‘সমস্যা’ আছে বটে। কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা কোনো সমস্যা তৈরি হবে না এটাই প্রত্যাশা করি। এ কারণেই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। এই নির্বাচন মিয়ানমারকে কতটুকু স্থিতিশীলতা আনতে পারবে সে প্রশ্ন থাকলই। নির্বাচনের আগে প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন বিচ্ছিন্নতাবাদী ৮টি গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। কিন্তু এর বাইরে রয়ে গেছে আরো ৭টি সশস্ত্র গোষ্ঠী। সুতরাং একটি প্রশ্ন থাকলই। শান্তিচুক্তিতে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। এখন দেখতে হবে নির্বাচনের পর নয়া সরকার এ ব্যাপারে কী উদ্যোগ নেয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুটি বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এক প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, ‘মিয়ানমারের গণতন্ত্রীয় প্রক্রিয়ায় আরব বসন্তের মতো রক্তপাত ও চরম বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হতে পারে।’ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে এ ধরনের আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছিল। এটা দিয়ে তিনি একটি ইঙ্গিত দিলেন। মিয়ানমার নির্বাচনের আয়োজন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সুচি যদি একা প্রক্রিয়ার অংশ না নেন, তাহলে সেনাবাহিনী এটা মেনে নেবে না। দুই। এটা সত্য, সুচি এই মুহূর্তে মিয়ানমারের অন্যতম একটি শক্তি। তিনি নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন আগামী

জানুয়ারিতে যখন সংসদ বসবে তখন একটি এনএলডি মন্ত্রিসভা গঠন করে সেনাবাহিনী ও রাজনৈতিক শক্তির মাঝে একটা অ্যালায়েন্স গড়ে তুলতে পারেনা তবে একটা কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর যে কর্পোরেট ইন্টারেস্ট গড়ে উঠছে, তা সহজে ভাঙবে না। রাজনীতিতে তাদের প্রভাব অব্যাহত থাকবে। ৮ নভেম্বরের নির্বাচন তাতে কোনো পরিবর্তন ডেকে আনল না।

প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে কী পেল বিশ্ব

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে সদ্য সমাপ্ত জলবায়ু সম্মেলন (যা কপ-২১ নামে পরিচিত) শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে প্রশ্নটি এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে এই ‘সমঝোতা’ কি আদৌ কার্যকর হবে? নাকি ১৯৯৭ সালে জাপানের প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোতে বিশ্বের উষ্ণতা রোধকল্পে যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে আবারও! বলা ভালো, বিশ্বের উষ্ণতা রোধকল্পে কিয়োটো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ওই চুক্তিতে বলা হয়েছিল- বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলো সামগ্রিকভাবে বায়ুম-লে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা ১৯৯০ সালের তুলনায় শতকরা ৫ দশমিক ২ ভাগ হারে হ্রাস করবে। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র বড় কার্বন নিঃসরণকারী দেশ, দেশটি হ্রাস করবে শতকরা ৭ ভাগ, ইইউর দেশগুলো করবে ৮ ভাগ, জাপান ৬ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু বুশ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি এই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেন। ফলে কিয়োটো চুক্তি অকার্যকর হয়ে যায়। এরপর একের পর এক বিশ্বের কোনো না কোনো দেশে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু কোনো একমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। প্যারিসে শেষ পর্যন্ত একটি সমঝোতা হলো বটে, এবং ফ্রান্সের এটা ছিল একটা ‘কূটনৈতিক অভ্যুত্থান’ কিন্তু সমঝোতাটি ইতোমধ্যেই নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বলা হচ্ছেই এটা একটা ‘জগাখিচুড়ি সমঝোতা’। এটা কোনো চুক্তি নয়। চুক্তি হবে ২০১৬ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে। ওই সময় জাতিসংঘের মহাসচিব নিউইয়র্কে একটি সম্মেলন ডাকবেন। এবং জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে। শতকরা ৫৫ ভাগ দেশ যদি এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করে (যার মাঝে আবার শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর মাঝে ৫৫ ভাগ দেশ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে) তাহলেই চুক্তিটি কার্যকর হবে। প্রশ্ন সেখানেই বড় কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো প্যারিসে উপস্থিত থেকে একটি সমঝোতা চুক্তির ব্যাপারে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করলেও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, তেল ও গ্যাস উত্তোলনকারী সংস্থাগুলোর চাপ, কর্পোরেট হাউসগুলোর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ইত্যাদি নানা কারণে বড় কিছু দেশ মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। রিপাবলিকানদের পেছনে বড় অর্থলগ্নি করেছে আন্তর্জাতিক তেল উত্তোলনকারী কোম্পানিগুলো। সুতরাং প্যারিসে ওবামা একটি সমঝোতার ব্যাপারে তার সমর্থন ব্যক্ত করলেও ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র নিউইয়র্কে এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করবে কিনা সে প্রশ্ন থাকলই। চীন ও ভারত বড় কার্বন নিঃসরণকারী দেশ। কার্বন হ্রাসের ব্যাপারে এই দেশ দুটির যুক্তি হচ্ছেই কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করলে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। চীন ও ভারত কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। আর এই কয়লা পোড়ানোর ফলে বায়ুম-লে প্রচুর কার্বন ড্রাইঅক্সাইড নির্গমন হয়, যা বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট। ফলে দেশ দুটোর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকলই।

বিশ্বের ১৯৫টি দেশের সরকার তথা রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রায় সবাই প্যারিস সম্মেলনে যোগ দিয়ে এই সম্মেলনের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন, সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতির (যাদের একটা বড় অংশ আবার এনজিও প্রতিনিধি) ফলে সেখানে কত টন কার্বন নিঃসরণ হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান আমার কাছে নেই। কিন্তু কোপেনহেগেনে (২০০৯ সালের ডিসেম্বর) যে কপ-১৫ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার একটি পরিসংখ্যান আছে। প্রায় ১৫ হাজার প্রতিনিধি ওই সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। আর খরচ হয়েছিল ১২২ মিলিয়ন ডলার। আর জাতিসংঘের মতে, এসব প্রতিনিধিকে আনা, নেওয়া, গাড়ি ব্যবহারের কারণে তারা বায়ুম-লে ৪০ হাজার ৫০০ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করেছিল। পাঠক, এ থেকে ধারণা করতে পারেন এবার কত টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুম-লে নিঃসরণ হয়েছে। কিন্তু ফল কী? একটি সমঝোতা হয়েছে। কিন্তু চুক্তি হবে কয়েক মাস পর। চুক্তি মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বলা হচ্ছেই ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা হবে। এর জন্য বায়ুম-লে কার্বন নির্গমন হ্রাস করতে হবে। প্রশ্ন এখানেই। কে কতটুকু হ্রাস করবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এখন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে কি একই কাতারে আমরা দেখব? কিংবা রাশিয়াসহ ইউরোপের দেশগুলো কতটুকু কমাবে? এ ব্যাপারে সমঝোতা চুক্তিতে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। সমঝোতায় আছে উন্নত বিশ্ব জলবায়ুর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে বছরে ১০ হাজার কোটি ডলার সাহায্য দেবে। এটা শুনে ভালোই শোনায়। কিন্তু এই অর্থ কে দেবে? কোন দেশ কতটুকু দেবে, তার কোনো উল্লেখ নেই। দ্বিতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো নানা ক্যাটাগরিতে বিভক্ত (ভালনারেবল ২০, রেইন ফরেস্ট কোয়ালিশন ইত্যাদি)। এই দেশগুলোর মাঝে অর্থ বন্টনের ভিত্তি কী হবে? তৃতীয়ত, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো এই অর্থ কীভাবে ম্যানেজ করবে? কেননা উন্নয়নশীল বিশ্বে দুর্নীতির বিষয়টি ব্যাপক আলোচিত। বাংলাদেশে জলবায়ু ফান্ডে প্রাপ্ত টাকা বরাদ্দ নিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এক সময় কথা হয়েছিল প্রাপ্ত টাকা বিলি-বন্টনের বিষয়টি দেখভাল করবে বিশ্বব্যাংক। কিন্তু এক সময় বিশ্বব্যাংক এখান থেকে সরে যায়। বিষয়টি যে শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, বরং উন্নয়নশীল বিশ্বেরও। বিশেষ করে সাগরপাড়ের অনেক দেশ নিয়ে এ রকম সমস্যা আছে। সমঝোতা স্মারকে উন্নয়নশীল বিশ্বের স্বার্থ দেখা হয়নি। আইনি বাধ্যবাধকতার বিষয়টিও অত কঠোর নয়। অর্থাৎ সাগরপাড়ের দেশগুলো, যারা বিশ্বের উষ্ণতা বেড়ে গেলে, সাগর-মহাসাগরে পানির পরিমাণ বেড়ে গেলে, তাদের বিশাল এলাকা সাগরগর্ভে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, কোনো ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারবে না। ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আসবে তাদের মর্জিমাফিকের ওপর।

একটা সমঝোতা স্মারকে দেশগুলো স্বাক্ষর করেছে। এর প্রয়োজন ছিল। কেননা বিশ্বের উষ্ণতা যে বেড়ে যাচ্ছে, সাগর উত্তপ্ত হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এ সবই বাস্তব। এ ব্যাপারে কারও কোনো বক্তব্য নেই। পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে, গ্রিনল্যান্ড ও এনটার্কটিকায় বরফ গলছে। এর জন্য একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এটা সবাই উপলব্ধি করেন। কিন্তু কর্মপরিকল্পনাটা কী, কীভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানো যাবে তার কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্যারিস

সম্মেলনে নেওয়া হয়নি। এটা বলা যাচ্ছে বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণে বায়ুম-লে কার্বনের পরিমাণ বাড়ছে। অর্থাৎ শিল্পে, কলকারখানায়, যানবাহনে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে বায়ুম-লে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু এই জ্বালানির ব্যবহার আমরা কমাতে কীভাবে? জ্বালানি ব্যবহারের সাথে উন্নয়নের প্রশ্নটি সরাসরিভাবে জড়িত। জীবাশ্ম জ্বালানি কম ব্যবহার করলে কার্বন নিঃসরণ কম হবে, এটা সত্য। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিশ্বের কাছে কি বিশাল জ্বালানি আছে? উন্নয়নশীল বিশ্ব জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। উন্নত বিশ্বের কাছে ‘নয়া প্রযুক্তি’ থাকলেও তাদের অনীহা রয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বে এই প্রযুক্তি সরবরাহে। সোলার এনার্জির একটা বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে এই এনার্জির ব্যবহার বাড়ছে না। বাংলাদেশে যে পরিমাণে এর ব্যবহার বাড়ানো উচিত ছিল তা কিন্তু হয়নি। কেননা এর জন্য যে খুচরা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, তা বিদেশ থেকে আনতে হয়। খরচ অনেক বেশি পড়ে, যা আমাদের সাধ্যের মধ্যে পড়ে না। এ সেক্টরে যতদিন পর্যন্ত না বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে, ততদিন বিকশিত হবে না। আর এই সেক্টর বিকশিত না হলে মানুষ জ্বালানির জন্য নির্ভরশীল থাকবে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর। বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে যাওয়ায় মানুষের নির্ভরশীলতা আরও বেড়েছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো এমনকি সাগরপাড়ের দেশগুলোর জ্বালানি দরকার। তারা বিকল্প জ্বালানি অর্থাৎ নবায়নযোগ্য জ্বালানি উদ্ভাবন করতে পারেনি। ফলে তাদের পক্ষে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করাও সম্ভব হবে না।

ফলে একটা প্রশ্ন থেকেই গেল যে, প্যারিস চুক্তি শেষ পর্যন্ত কি বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখতে আদৌ কোনো সাহায্য করবে? মার্কিন তথা বাংলাদেশীয় সংস্থাগুলোর স্বার্থ এখানে বেশি। জ্বালানি একটা বিশাল ‘ব্যবসা’। এই ‘ব্যবসা’ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এটা কখনই চাইবে না বাংলাদেশীয় সংস্থাগুলো। প্যারিসে একটি সমঝোতা হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওসিস্টেমের অধ্যাপক মাইলেস এলেন তাই ইতোমধ্যে প্যারিস চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সন্দেহ প্রকাশ করেছেন পরিবেশ নিয়ে কাজ করা ৩৫০ অঙ্গসংগঠনটির প্রধান বিল মেকিবেন। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলনের সাথে জড়িত বড় বড় ব্যবসায়িক তথা বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কারণে এই ‘সমঝোতা’ শেষ পর্যন্ত ভুল হয়ে যাবে। দাতব্য সংস্থা অক্সফামও তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। ফলে একটা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে আশাবাদী হওয়ার মতো কোনো কারণ নেই। যারা অনলাইনে নিয়মিত বিভিন্ন জার্নাল পাঠ করেন, তারা দেখবেন প্যারিস চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ করার সংখ্যাই বেশি। তারপরও একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে এতগুলো দেশ এক সাথে প্যারিসে মিলিত হয়েছিল। বিশ্বের শীর্ষ নেতাদের প্রায় সবাই সেখানে গিয়েছিলেন। এবং তারা সবাই এক বাক্যে একটি চুক্তির কথা বলেছেন।

বাংলাদেশ থেকেও প্রতিনিধি প্যারিসে পাঠানো হয়েছিল। বন ও পরিবেশমন্ত্রী সেখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বাংলাদেশ প্যারিস সমঝোতাকে স্বাগত জানালেও প্রতিনিধি দলের কোনো কোনো সদস্য স্বীকার করেছেন সমঝোতা স্মারকে অনেক বিষয়ে দুর্বলতা রয়েছে। এমনকি শিল্পোন্নত দেশগুলো যে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা বা আইএনডিসি জমা দিয়েছে তা রিভিউ করার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী বর্তমান শতাব্দীর শেষে বৈশ্বিক তাপমাত্রা তিন ডিগ্রির বেশি বাড়বে। অথচ চুক্তিতে ২ ডিগ্রির বেশি বাড়তে না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাঁচ বছর পর কার্বন নিঃসরণ কমানোর পর্যালোচনায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর লক্ষ্যমাত্রা পুনঃনির্ধারণ প্রয়োজন। সমঝোতা স্মারকে দুর্বলতা থাকলেও একটি ঐকমত্য হয়েছে, এটাই বড় কথা। শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের ‘কমিটমেন্ট’ এবার রক্ষা করবে, এটাই সবাই আশা করে।

ট্রাম্পের মুসলমানবিদ্বেষ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নতুন মাত্রা

যুক্তরাষ্ট্রের ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়নপ্রত্যাশী ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি বক্তব্য নতুন করে ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের’ একটি মাত্রা এনে দিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে সব মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছেন। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নার্ডিনোতে এক মুসলমান দম্পতির হামলায় ১৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনার পর ট্রাম্প এই আহ্বান জানালেন। ট্রাম্পের এই বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি বলেছেন, ‘আমরা আমেরিকা ও ইসলামকে কখনোই মুখোমুখি অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারি না।’ একজনের দোষের জন্য কখনো পুরো ধর্মকে দোষারোপ করা যাবে না বলেও মনে করেন ওবামা। ট্রাম্পের প্রধানমন্ত্রী ম্যানুয়েল ভালস ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরনও ট্রাম্পের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। আর পেন্টাগনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের এই বক্তব্য জাতীয় নিরাপত্তাকে দুর্বল করেছে। প্যারিসে নভেম্বরে আইএস জিহাদিদের হাতে ১২৯ জন মানুষ নিহত হওয়ার রেশ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে তাসফিন মালিক ও সৈয়দ রিজওয়ান ফারুক দম্পতির গুলিতে মারা গেল ১৪ জন। এই দম্পতির সঙ্গে আইএসের সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। এর আগে ২০০৮ সালের নভেম্বরে মুম্বাইয়ে হামলা, ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে নাইরোবির ওয়েস্ট গেটমলে হামলা, জানুয়ারিতে (২০১৫) প্যারিসের শার্লি এবদো ম্যাগাজিন কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা—সবই একই সূত্রে গাঁথা। এসব হামলা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে টুইন টাওয়ার হামলারই নতুন এক রূপ। অর্থাৎ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা ও এক দেশ থেকে অন্য দেশে তা ছড়িয়ে দেওয়া। এর মধ্য দিয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলমানবিদ্বেষী মনোভাব শক্তিশালী হচ্ছে। সম্প্রতি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন। ইসলামিক স্টেটের (আইএস) জঙ্গিরা আত্মঘাতী হামলা চালাতে পারে—এমন একটি আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে আসিয়ান সম্মেলনের প্রাক্কালে সেখানে সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে ইসলামিক জঙ্গিরা তত্পর। এদের কর্মকাণ্ড একাধিকবার আন্তর্জাতিক সংবাদের জন্ম দিয়েছে। ফিলিপাইনে আবু সায়াফ গ্রুপের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কিংবা ইন্দোনেশিয়ায় জামিয়া ইসলামিয়ার হাতে বিদেশি নাগরিকদের হত্যাকাণ্ডের

ঘটনা এই দেশ দুটি সম্পর্কে বিশ্বে একটি বাজে ধারণার জন্ম দিয়েছে। এ অঞ্চলে আইএসের নেটওয়ার্ক কতটুকু সম্প্রসারিত হয়েছে, তা জানা না গেলেও আল-কায়েদার প্রভাব আছে। এ অঞ্চলের বিভিন্ন ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে আল-কায়েদা একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ফলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বেড়ে যাওয়ায় এ অঞ্চলের জঙ্গিরাও যে এতে উত্সাহিত হবে, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জঙ্গি তত্পরতার সঙ্গে ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীকে জড়িত করলেও অভিযুক্ত জঙ্গিদের ব্যক্তিগত জীবন ও তাদের জীবনধারা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ইসলাম ধর্মের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। প্যারিস হামলার মূল পরিকল্পনাকারী আবদুল হামিদ আবাবুদ নিজে কোনো দিন কোরআন পড়েননি, নামাজও পড়েননি। তাঁর চাচাতো বোন নারী বোমাবাজ হাসনা আইত বুলোচেন পশ্চিমা সংস্কৃতি ও জীবনে বিশ্বাসী ছিলেন—এমনটাই জানা যায়। ফলে জঙ্গি তত্পরতার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই বলেই অনেকে মনে করেন।

যে প্রশ্নটি এখন অনেকেই করার চেষ্টা করেন, তা হচ্ছে এর শেষ কোথায়? প্যারিস কিংবা ক্যালিফোর্নিয়ার ট্র্যাজেডিই কি শেষ? যেভাবে প্যারিসে এখনো সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, তাতে কি এ ধরনের হামলা ভবিষ্যতে রোধ করা সম্ভব হবে? এর জবাব সম্ভবত ‘না’ বাচক। কেননা ইউরোপে বিশাল এক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে আইএস। একটি ‘শক্তি’ তাদের উত্সাহ জোগাচ্ছে। সম্ভবত ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার প্রচলিত সমর্থন রয়েছে এই আন্দোলনের পেছনে। সুদূরপ্রসারী একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে। এবং ভবিষ্যতেও হবে বলে আশঙ্কা করছি। কতগুলো উদ্দেশ্য পরিকল্পনা ৯/১১-এর পর যেভাবে একটি ‘মুসলমানবিরোধী’ মনোভাব সারা যুক্তরাষ্ট্রে ছড়িয়ে গিয়েছিল, আজ প্যারিস ঘটনাবলির পর সারা ইউরোপেও তেমনি একটা ‘মুসলমানবিরোধী’ মনোভাব ছড়িয়ে গেছে। এখানে মুসলমানরা (যেসব শরণার্থীকে ইতিমধ্যে ইউরোপে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে) সব সময় থাকবে এক ধরনের ‘নিরাপত্তাবলয়’-এর ভেতর। তাদের সব কর্মকাণ্ড মনিটর করা হচ্ছে। তারা ইউরোপে আশ্রয় পেয়েছে বটে; কিন্তু তাদের এক ধরনের ‘বস্তিজীবন’ যাপনে বাধ্য করা হবে। তাদের জন্য তৈরি করা হবে ‘কংক্রিটের বস্তি’ এবং সেখানেই তাদের বসবাসে বাধ্য করা হবে। ইউরোপের সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হবে। জার্মানিতে হিটলার যেভাবে ইহুদিদের ‘কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প’ রাখতেন কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদী যুগে যেভাবে হোমল্যান্ড সৃষ্টি করে কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠীকে শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে রাখা হতো, অনেকটা সেভাবেই সিরীয় মুসলমান অভিবাসীদের এখন এক ধরনের ‘ঘেটো’ জীবনযাপনে বাধ্য করা হবে। উগ্রপন্থীরা তথা কনজারভেটিভরা প্যারিস ঘটনায় ‘উপকৃত’ হয়েছে। ফ্রান্সে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। তারা নির্বাচনে ‘বিজয়ী’ হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলেছে। এখন তাদের দিয়ে এক ধরনের ‘নোংরা রাজনীতি’ করানো হবে। অর্থাৎ ‘ইউরোপ হবে মুসলমানমুক্ত’—এ ধরনের একটি স্লোগান ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে পোল্যান্ডসহ বেশ কটি দেশ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের বাদ দিয়ে খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বী শরণার্থীদের গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে সেখানে কটরপন্থীরা সক্রিয় হচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্য এর বড় প্রমাণ। তাঁর এই মুসলমানবিরোধী মনোভাব বাহ্যত আইএসকে যুক্তরাষ্ট্রে ‘অবস্থান’ করতে সাহায্য করবে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৬৫ দেশের সমন্বয়ে একটি আইএসবিরোধী অ্যালায়েন্স রয়েছে। রাশিয়া এই জোটে নেই। কিন্তু রাশিয়া আলাদাভাবে আইএসবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। তবে অচিরেই আইএসবিরোধী অভিযানে ফাটল দেখা দেবে। পশ্চিমা শক্তিগুলোর মাঝে যদি ফাটল থাকে, তাতে লাভ ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের। অধ্যাপক চসসুডোভস্কি তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ *এসবত্রপথঃ খড়্গম ধিত্ ধমধরহঃ ঐসধহঃ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বিশ্বের সর্বত্র জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থানের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত ‘হাত’ রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ নামে যে অভিযান পরিচালনা করে আসছে, তাতে মূলত তিনটি উদ্দেশ্য কাজ করছে। গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা, অর্থনৈতিক অবরোধ ও সরকার পরিবর্তন। ইরাক ও লিবিয়ার ক্ষেত্রে এই স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা হয়েছে। সিরিয়ার ক্ষেত্রে এই স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা হলেও তা সফল হয়নি। এই স্ট্র্যাটেজি কোনো পরিবর্তন ডেকে আনতে পারেনি। যেসব দেশে এই স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানে দরিদ্রতা বেড়েছে, অর্থনীতি ধ্বংস হয়েছে এবং এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে (ইরাক, লিবিয়া ও সিরিয়া)। ‘মানবাধিকার রক্ষা ও পশ্চিমা গণতন্ত্র’ প্রতিষ্ঠার নামে এ ধরনের অভিযান পরিচালনা সেখানে কোনো সুফল বয়ে আনেনি।

ইউরোপে কিংবা পশ্চিম আফ্রিকায় অতিসম্প্রতি ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সেখানে সন্ত্রাসীরা একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এতে সন্ত্রাসীরা প্যারিসের সমাজজীবনের কত গভীরে প্রবেশ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোয়েন্দাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একাধিক স্থানে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। খোদ ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ওলঁদ যখন একটি স্টেডিয়ামে ফুটবল ম্যাচ উপভোগ করছিলেন, ওই স্টেডিয়ামের বাইরে তখন তিন আত্মঘাতী বোমারু নিজেদের বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দিয়েছিল। গোয়েন্দারা সেটা আঁচ করতে পারেনি। চিন্তা করা যায় সন্ত্রাসীরা কালাশনিকভ রাইফেল ব্যবহার করে ‘পাখির মতো’ নির্বিচারে একটি কনসার্ট হলে মানুষ হত্যা করেছিল। এই রাইফেল সিরিয়া থেকে আসেনি। সংগ্রহ করা হয়েছিল ফ্রান্সের ভেতর থেকেই। ফ্রান্সে যে এ রকম একটি হামলা হতে পারে, তা ইসলামিক স্টেটের প্রপাগান্ডা ম্যাগাজিন ‘দাবিক’-এ ফেব্রুয়ারি মাসের সপ্তম সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছিল। ফ্রান্স কেন, সব ইউরোপীয় রাষ্ট্র তথা যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থার ব্যর্থতা এখানেই যে ‘দাবিক’-এ অভিযুক্ত আবাবুদের (ফ্রান্সে তাঁর পরিচিতি ছিল আবু উমর আল বালঝিকি নামে) সাক্ষাতকার ছাপা হলেও তা প্রতিরোধে তারা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি। যেমনটি তারা নিতে পারেনি নিউ ইয়র্কে ‘টুইন টাওয়ার’-এর ক্ষেত্রেও। টুইন টাওয়ারে হামলার ১৪ বছর পর প্যারিসে বড় ধরনের একটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলো। এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরপরই আইএসের অপারেটিভরা ক্যালিফোর্নিয়ায় সন্ত্রাসী হামলা চালান।

২০০১ সালে অস্তিত্ব ছিল আল-কায়েদারা আজ দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়েছে ইসলামিক স্টেট। টাগেট একটাই—মুসলমানবিরোধী একটা জগৎ গড়ে তোলা। ২০০১ সালের পর দীর্ঘদিন মুসলমানবিরোধী একটা মনোভাব যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘদিন মুসলমানরা, যারা সবাই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তারা সেখানে একটা আতঙ্কের মধ্যে ছিল। সেই পরিবেশ থেকে বের হয়ে এসে মুসলমানরা যখন মার্কিন সমাজে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করেছে, ঠিক তখনই ক্যালিফোর্নিয়ায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আইএসের সম্পৃক্ততা ‘আবিষ্কৃত’ হলো। তাসফিন রিজওয়ান দম্পতি যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানে পুলিশ হানা দিয়ে বেশ কিছু বিস্ফোরকও পেয়েছে। এ খবর আমরা পেয়েছি পত্রপত্রিকা থেকে। এ ঘটনা মার্কিন সমাজে যে প্রভাব ফেলবে, মুসলমানবিরোধী একটা মনোভাব যে আবারও সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে, তা একরকম নিশ্চিত করেই বলা যায়। মুসলমানবিরোধী মনোভাব কেন শক্তিশালী হয়েছে তার স্পষ্ট কারণও রয়েছে। তুলনামূলক বিচারে মার্কিন সমাজে মুসলমানরা অতটা ভয়ংকর নয়, বরং শান্ত ও শিক্ষিত। মাত্র ১ শতাংশ মুসলমান বাস করে যুক্তরাষ্ট্রে। ২০৫০ সালে তা হবে ২.১ শতাংশ। মুসলমানরা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার হারে দ্বিতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী। এমনকি মার্কিনদের চেয়েও মুসলমানরা শিক্ষিত। প্রথম অবস্থানে রয়েছে ইহুদিরা। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রায় দুই হাজার ৫০০ মসজিদ রয়েছে, যে মসজিদগুলো প্রধানত জাতিগতভাবেই প্রতিষ্ঠিত। যেমন বাংলাদেশি মুসলমানদের নিজস্ব মসজিদ রয়েছে, তেমনি পাকিস্তানি আমেরিকানদেরও আলাদা মসজিদ রয়েছে। ৯/১১-এর ঘটনাবলির পর এই মসজিদগুলো বারবার আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশি আমেরিকানরা যেখানে বসবাস করে (বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে) সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে তারা বাসাবাড়িতে মার্কিন পতাকা উত্তোলন করে রেখেছে। দীর্ঘদিন। সেই পরিস্থিতি অবশ্য এখন আর নেই। তবে সর্বশেষ ক্যালিফোর্নিয়ার ঘটনাবলির পর মুসলমানবিরোধী মনোভাবটা আবার চাঙ্গা হবে এবং রিপাবলিকানরা এটাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইস্যু করবে—এটা দাবি দিয়ে বলা যায়। ব্যক্তিগতভাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন কটরপন্থী হিসেবে পরিচিত। চূড়ান্ত বিচারে তিনি মনোনয়ন না পেলেও মনোনয়নপ্রত্যাশী ট্রেড ক্রুজ কিংবা বেন কারসন কোনো অংশে কম যান না। মুসলমানবিরোধী হিসেবে এ দুজনেরও পরিচিতি আছে। ক্যালিফোর্নিয়ার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা এই দৌড়ে জেব বুশকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। রিপাবলিকান শিবিরে কটরপন্থীরা শক্তিশালী হচ্ছে। ওবামা ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন বটে; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মার্কিন সমাজে যে মুসলমানবিরোধী জনমত শক্তিশালী হচ্ছে, তা তিনি উপেক্ষা করবেন কিভাবে? টেক্সাসের স্কুলের ছোট্ট বালক আহমেদ মোহাম্মদের ‘কাহিনী’ নিশ্চয়ই আমাদের সবার মনে আছে। ফলে আগামী দিনগুলোতে আমরা ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’-এর নতুন এক রূপ প্রত্যক্ষ করব। ১৪ বছর পর নতুন করে আবারও ‘মুসলমানবিরোধী’ রাজনীতি শুরু হবে! সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশ আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন মেরিন সেনা পাঠালেও লিবিয়ায় ওবামা কোনো সেনা পাঠাননি। এমনকি সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠানোর একটা সম্ভাবনা তৈরি হলেও (২০১৪) ওবামা শেষ পর্যন্ত আলোচনার টেবিলকেই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু আইএস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে বোমাবর্ষণের নির্দেশ দিতে তিনি ভুল করেননি। পরিস্থিতি গত এক বছরে আরো অবনতি হয়েছে। আইএস জঙ্গিরা তাদের জঙ্গি তত্পরতা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে তত্পর হয়েছে। আবারও নতুন করে এক ধরনের ‘ইসলাম ফোবিয়া’ আক্রান্ত হতে পারে বিশ্ব! ‘৯/১১ সিনড্রোম’ (টুইন টাওয়ারে হামলা, ২০০১) নতুন করে আবার ফিরে আসছে! অনেকটা নিশ্চিত করেই বলা যায় নতুন করে যে ‘ইসলাম ফোবিয়া’ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তাতে রিপাবলিকানদের ২০১৬ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারে। যারা পর্দার অন্তরালে যুক্তরাষ্ট্রের ‘রাজনীতি’ নিয়ন্ত্রণ করে তারা এটিই চাইছে। বিশ্বে উত্তেজনা কারোরই কাম্য নয়। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, তথাকথিত এই ‘ইসলাম ফোবিয়া’ অর্থাৎ মুসলমানবিরোধী মনোভাব বিশ্বে আবার নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। এতে বিস্মিত হবে বিশ্বশান্তি।

প্যারিস সম্মেলনে বিশ্ব কী পাবে

জলবায়ুসংক্রান্ত প্যারিস সম্মেলনে, যা কপ-২১ নামে পরিচিত বিশ্ব কি কিছু পাবে? একটি চুক্তি কি স্বাক্ষর হবে শেষ পর্যন্ত? এর আগের সম্মেলনে (লিমা ২০১৪) বলা হয়েছিল, এটাই সর্বশেষ সুযোগ। বিশ্বেত্বব্দ যদি বায়ুম-লে কার্বন নিঃসরণের ব্যাপারে কোনো চুক্তিতে উপনীত হতে না পারেন তাহলে একটি বড় ধরনের সংকটের মুখোমুখি হবে বিশ্ব। কপের লিমা সম্মেলনের পর যে প্রশ্নটি আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে, প্রতি বছর এ ধরনের সম্মেলন করে শেষ পর্যন্ত কি বিশ্বের উষ্ণতা রোধ করা সম্ভব হবে? বাংলাদেশের পরিবেশমন্ত্রী ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ঢাকায় ফিরে এসে তিনি কিছুটা হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। তাই কপ সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাবেই। ইতোমধ্যেই জাপান, কানাডা ও রাশিয়া কিয়েটা-পরবর্তী আলোচনা নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছিল। সুতরাং বোঝাই যায় এক ধরনের হতাশা এসে গেছে। আসলে বিশ্বের দেশগুলো এখন বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেছে। বিশ্বের উষ্ণতা রোধকল্পে এক এক গ্রুপের এক এক এজেন্ডা। উন্নত বিশ্ব কিংবা উন্নয়নশীল বিশ্বের যে দাবি তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আবার উন্নয়নশীল বিশ্বও একাধিক গ্রুপে বিভক্ত। ধনী দেশগুলো এনেক্স-১-এ অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের জিডিপি শতকরা ৭৫ ভাগ এ দেশগুলোর। অথচ লোকসংখ্যা মাত্র বিশ্বের ১৯ ভাগ। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ করে সবচেয়ে বেশি, শতকরা ৫১ ভাগ। অন্যদিকে গ্রুপ-৭৭-এর দেশগুলো (মোট ১৩০টি দেশ) বিশ্বের জনসংখ্যার ৭৬ ভাগ, জিডিপি মাত্র ১৯ ভাগ। কিন্তু কার্বন উদ্গারণ করে ৪২ ভাগ। আবার সাগরপাড়ের দেশগুলো, যারা বিশ্বের জনসংখ্যা, জিডিপি ও কার্বন নিঃসরণ করে মাত্র ১ ভাগ, তাদের দাবি ২০২০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বর্তমান অবস্থার চেয়ে শতকরা ৮৫ ভাগ কমিয়ে আনার। বনাঞ্চলভুক্ত দেশগুলো যারা রেইন ফরেস্ট কোয়ালিশন হিসেবে পরিচিত তারা বিশ্ব জনগোষ্ঠীর ১৯ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। জিডিপি মাত্র ৩ ভাগ তাদের। আর মাত্র ৪ ভাগ কার্বন নিঃসরণ করে। যুক্তরাষ্ট্র একা কার্বন নিঃসরণ করে ২০ ভাগ, জিডিপি ৩০ ভাগ তাদের। অথচ জনসংখ্যা মাত্র বিশ্বের ৫ ভাগ। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো বিশ্ব জিডিপি ২৫ ভাগ ও জনসংখ্যার ৮ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু কার্বন নিঃসরণ করে ১৫ ভাগ। চীনকে নিয়ে সমস্যা এখন অনেক। চীন একা কার্বন নিঃসরণ করে ২১ ভাগ। বিশ্ব জনসংখ্যার ২০ ভাগই চীনা নাগরিক। জিডিপি ৬

ভাগ তাদের। প্রতিটি গ্রুপের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। সবাই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কার্বন নিঃসরণের হার কমাতে চায়। জাতিসংঘ একে বলছে কার্বনঘনত্ব। অর্থাৎ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা মোট আয়ের (জিডিপি) অনুপাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্গিরণের হারকে কার্বনঘনত্ব বা গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বলা হয়। উন্নয়নশীল বিশ্ব মনে করে এ হার মাথাপিছু জনসংখ্যা ধরে করা উচিত। কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের হার কমানো উচিত, এটা মোটামুটিভাবে সবাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু কে কতটুকু কমাবে, সে প্রশ্নের কোনো সমাধান হয়নি। যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ও চীন (এবং সেই সঙ্গে ভারতও) বিশ্বে সবচেয়ে বেশি দূষণ ছড়ায়, সে কারণে এ দুটো দেশের কাছ থেকে 'কমিটমেন্ট' আশা করেছিল বিশ্ব। কিন্তু তা হয়নি। চীন প্রস্তাব করেছিল ২০০৫ সালের কার্বনঘনত্বের চেয়ে দেশটি ২০২০ সালে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ কমাবো। আর যুক্তরাষ্ট্রের দাবি ছিল তারা ১৭ ভাগ কমাবো। কিন্তু চীন ও ভারত যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। এখানে বলা ভালো, চীনের কার্বনঘনত্ব ২.৮৫ টন, আর ভারতের ১.৮ টন। চীন ও ভারত দুটো দেশই বড় অর্থনীতির দেশে পরিণত হয়েছে। এ শতাব্দীতেই বিশ্বব্যাংকের উপদেষ্টা হরিন্দর কোহলির মতে, আগামী ৩০ বছরে ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। মাথাপিছু আয় তখন ৯৪০ ডলার থেকে বেড়ে ২২ হাজার ডলারে উন্নীত হবে।

২০০৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারত অবদান রাখত মাত্র ২ ভাগ, ৩০ বছর পর অবদান রাখবে ১৭ ভাগ। তবে এটা ধরে রাখতে হলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হতে হবে ৮ থেকে ৯ ভাগ। এ কারণেই ভারতকে নিয়ে ভয়— তাদের কার্বনঘনত্ব বাড়বে। কেননা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালু রাখতে হবে। আর তাতে করে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বাড়বে। পাঠকদের এখানে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৯৭ সালে কিয়োটো সম্মেলনে ১৬০টি দেশ অংশ নিয়েছিল এবং সেখানে যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৯৯০ সালের কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণের মাত্রার চেয়ে ৮ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্র ৭ শতাংশ ও জাপানের ৬ শতাংশ হ্রাস করার কথা। তা ছাড়া সার্বিকভাবে ৫.২ শতাংশ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের আইনগত বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয়েছিল সব কটি দেশকে ২০০৮-১২ সালের মধ্যে গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। তৎকালীন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট গোর কিয়োটো চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও পরে বুশ প্রশাসন ওই চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে কিয়োটো চুক্তি কাগজ-কলমে থেকে গিয়েছিল। বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে যে কটি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের উপকূলে প্রতি বছর ১৪ মিলিমিটার করে সমুদ্রের পানি বাড়ছে। গত ২০ বছরে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ সেন্টিমিটার। সমুদ্রের পানি বেড়ে যাওয়ায় উপকূলের মানুষ অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশে প্রতি সাতজনে একজন আগামীতে উদ্বাস্তু হবে। ১৭ ভাগ এলাকা সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে। বাংলাদেশ কোপেনহেগেন সম্মেলনে পরিবেশগত উদ্বাস্তুদের টহরব্যাংক ঘষণা চব্ব্বংড়হ হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু তা গ্রহণ করা হয়নি।

সর্বশেষ দোহা সম্মেলনেও বড় কোনো অগ্রগতি হয়নি। ফাস্ট স্টার্ট ফান্ডে পাওয়া গেছে মাত্র ২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ সেখান থেকে পেয়েছে ১৩০ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু বাংলাদেশে আইলার কারণে যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূর হয়নি। সার্ক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ঐক্যবদ্ধভাবে দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যাগুলো আমরা তুলে ধরব। কিন্তু লিমায় তা হয়নি। বাংলাদেশ ও ভারত একই ফোরামে ছিল না। একটি আইনি বাধ্যবাধকতার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। প্রযুক্তি হস্তান্তর সম্পর্কেও কোনো সমঝোতা হয়নি। কপ সম্মেলন এলেই বড় বড় কথা বলা হয়। কয়েক টন কার্বন নিঃসরণ করে সম্মেলন 'অনেক আশার কথা' শুনিয়ে শেষ হয় বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয় খুব কমই। আগে সমস্যা ছিল উন্নত বিশ্বকে নিয়ে। এখন চীন ও ভারত একটি সমস্যা। তাদের যুক্তি, নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস করলে তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। তাতে বাড়বে দারিদ্র্য। এ যুক্তি ফেলে দেয়ার নয়। ফলে কপ সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেলই। গেল বছরের ডিসেম্বরে (১-১২ ডিসেম্বর) পেরুর রাজধানী লিমায় কপ-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কপ-১৮ (ডারবান) সম্মেলনের পর দোহায় কপ-১৯, সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কপ-২১ সম্মেলন। কিন্তু তাতে আমাদের প্রাপ্তি কী? শুধু 'অংশগ্রহণ' ছাড়া আমাদের কোনো প্রাপ্তি নেই।

আল গোর নিজে তার প্রবন্ধে বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে ২০৫০ সাল নাগাদ দুই থেকে আড়াই কোটি বাংলাদেশিকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে। এর অর্থ প্রচুর মানুষ হারাতে তাদের বসতি, পেশা। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার মানে কেবল বন্যা নয়, এর মানে নোনা পানির আগ্রাসন। সেই সঙ্গে ধানের আবাদ ধ্বংস হয়ে যাওয়া। দুই কোটি কৃষক, জেলে পেশা হারিয়ে শহরে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে এসে নতুন নতুন বস্তি গড়ে তুলবে। রিকশা চালানোর জীবন বেছে নেবে। সৃষ্টি হবে একটি শ্রেণির, যারা শহরে মানুষের ভাষায় 'জলবায়ু উদ্বাস্তু'। এ জলবায়ু উদ্বাস্তুদের নিয়ে রাজনীতি হবে। বিদেশে অর্থসাহায্য চাওয়া হবে। ইতোমধ্যে প্রাপ্ত সাহায্যের ব্যবহার নিয়ে নানা অনিয়মের খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। এবং খুব কম ক্ষেত্রেই সরকার এসব অনিয়ম বোধ করতে পেরেছে।

বলা ভালো, বাংলাদেশ এককভাবে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে না। বাংলাদেশ এককভাবে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ও তা সামগ্রিকভাবে বিশ্বের উষ্ণতা রোধ করতে খুব একটা প্রভাব রাখবে না। এ জন্য বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক আসরে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বিদেশি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। কিন্তু এ সাহায্যের ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। গেলবার যে বন্যা হলো আবার আমাদের সে কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিল। বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় এখনো এ দেশে স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু 'সিডার' ও 'আইলার' আঘাতে আমাদের যা ক্ষতি হয়েছিল সে ক্ষতি

পোষাতে সরকারের বড়সড় উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় ১ হাজার ২৬৮ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হলেও এখানেও 'রাজনীতি' ঢুকে গেছে। দলীয় বিবেচনায় টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে, যেসব এনজিও জলবায়ু নিয়ে কাজ করেনি, যাদের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই, শুধু দলীয় বিবেচনায় তাদের নামে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। জলবায়ু তহবিলের অর্থ পাওয়া উচিত ওইসব অঞ্চলে যেখানে ঘূর্ণিঝড়, প্লাবনের আঘাত বেশি আর মানুষ যুদ্ধ করে যেখানে বেঁচে থাকে। অথচ দেখা গেছে, জলবায়ুর জন্য বরাদ্দকৃত টাকা দেয়া হয়েছে ময়মনসিংহ পৌরসভাকে, মানিকগঞ্জের একটি প্রকল্পে কিংবা নীলফামারী তিস্তা বহুমুখী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে। সিরাজগঞ্জের প্রগতি সংস্থাও পেয়েছে থোক বরাদ্দ। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের একটিরও জলবায়ুসংক্রান্ত কাজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

আমাদের জন্য তাই প্যারিস কপ-২১ সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক। বাংলাদেশ পরিবেশগত নানা সমস্যায় আক্রান্ত। বাংলাদেশের একার পক্ষে এর সমাধান করা সম্ভব নয়। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই বাংলাদেশ আজ আক্রান্ত। সুতরাং বৈশ্বিকভাবে যদি বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি কমানো না যায় তাহলে বাংলাদেশে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করাও সম্ভব হবে না। তাই একটি চুক্তি অত্যন্ত জরুরি। সেই সঙ্গে আরো প্রয়োজন জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলায় বৈদেশিক সাহায্যের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং সেই সঙ্গে প্রযুক্তি হস্তান্তরের একটি 'কমিটমেন্ট'। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে আমাদের যেতে হবে। সোলার বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, স্থানীয়ভাবে তাদের কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং আর্থিক সাহায্যের প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও সত্য, বিশ্বনেতৃবৃন্দ বার বার সাহায্যের কথা বললেও সে সাহায্য কখনই পাওয়া যায়নি। প্যারিস সম্মেলন চলাকালে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ প্রকাশ করেছে জার্মান ওয়াচ নামে একটি সংস্থা। প্রতি বছর বৈশ্বিক জলবায়ুসূচক তারা প্রকাশ করে। শীর্ষ সম্মেলন চলাকালেই তারা প্রকাশ করেছে বৈশ্বিক জলবায়ুসূচক ২০১৬।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ঝড়, বন্যা, ভূমিধস ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকা এরা প্রকাশ করেছে। এতে বাংলাদেশের অবস্থান দেখানো হয়েছে ৬ নাম্বারে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর শীর্ষে রয়েছে হন্ডুরাস। তারপর পর্যায়ক্রমে রয়েছে মিয়ানমার, হাইতি, ফিলিপাইন ও নিকারাগুয়া। তাই প্যারিস সম্মেলনটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ সম্মেলন নিয়ে প্রশ্ন আছে অনেক। শেষ পর্যন্ত একটি চুক্তি হলেও তাতে যদি আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকে তাহলে ওই চুক্তি মূল্যহীন হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে বিশ্বনেতৃবৃন্দের সবাই, যারা কপ-২১-এ যোগ দিয়েছিলেন, তারা প্যারিস ছেড়েছেন। তারা দেশীয় কর্মকর্তাদের রেখে গেছেন, যারা বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে দেনদরবার করবেন। তবে একটা চুক্তি হোক_ এ প্রত্যাশা সবার। Daily Jai Jai Din 07.12.15

কপ ২১ : আদৌ কি সমঝোতা হবে

বিশ্বের উষ্ণতা রোধকল্পে প্যারিসে জাতিসংঘ কর্তৃক কপ-২১ সম্মেলন শুরু হলেও শেষ অবধি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। গত ৩০ নভেম্বর এই শীর্ষ সম্মেলনটি শুরু হয়েছে এবং চলবে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রয়োজনে আরও দু-একদিন সম্মেলনটি বাড়ানো হতে পারে। ইতোমধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছেন। এতে করে একদিকে এই সম্মেলনের গুরুত্ব যেমনি বেড়েছে, ঠিক তেমনি তাদের সবার বক্তব্যেই বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষতির দিকটি ফুটে উঠেছে। বিশ্ব নেতারা প্রায় সবাই একবাক্যে বায়ুম-লে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে করে ধারণা করা স্বাভাবিক যে, একটি চুক্তি এবং কার্বন হ্রাসের বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে কপ-২১ শেষ হবে। আমাদের ধারণা কতটুকু বাস্তবে রূপ পাবে, তা দেখার জন্য আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে। তবে এটা সত্য, বিশ্ব নেতাদের মধ্যে একটা উপলব্ধিবোধ এসেছে, কার্বন নিঃসরণকারী জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে। তবে কাজটি নিঃসন্দেহে সহজ নয়। এর সঙ্গে বেশ কিছু প্রশ্ন জড়িত। উন্নত বিশ্ব কর্তৃক উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সাহায্য, জলবায়ু সমস্যা মোকাবিলায় 'টেকনোলজি ট্রান্সফার', উন্নত বিশ্বের নিজের কার্বন নিঃসরণ হার কমানো। ইত্যাদি বিষয় জড়িত। এর আগে গেল ডিসেম্বরে লিমা কপ-২০ সম্মেলনে প্রতিটি দেশকে কার্বন নিঃসরণ কমাতে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও কাঠামো উপস্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ এটা করেছে। কিন্তু সব দেশ এটা করতে পেরেছে কিনা, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। চীন ও ভারতের মতো দেশের কার্বন নিঃসরণ নিয়েও কথা আছে। কেননা দেশ দুটি সাম্প্রতিককালে বিশ্বের শীর্ষ কার্বন নিঃসরণকারী দেশে পরিণত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, জলবায়ু পরিবর্তনে যে ক'টি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের উপকূলে প্রতিবছর ১৪ মিলিমিটার করে সমুদ্রের পানি বাড়ছে। গত ২০ বছরে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৮ সেন্টিমিটার। বাংলাদেশের ১৭ ভাগ এলাকা সমুদ্রের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগামীতে আইপিসিসির রিপোর্টেও উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের কথা। অনেকের মনে থাকার কথা যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর পরিবেশের ব্যাপারে বিশ্ব জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ২০১২ সালের জানুয়ারিতে এন্টার্কটিকায় গিয়েছিলেন। আমাদের তৎকালীন পরিবেশমন্ত্রীকেও তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সেখানে সেটা ঠিক আছে। কেননা বিশ্বের উষ্ণতা বেড়ে গেলে যেসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাংলাদেশ। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ পরপর দু'বার বন্যা ও পরবর্তীকালে 'সিডর'-এর আঘাতের সম্মুখীন হয়। এরপর ২০০৯ সালের মে মাসে আঘাত করে 'আইলা'। এর

পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ব্যাপক খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয়া দেশে খাদ্যশস্যের দাম বেড়ে যায়। অহীনীতিতে একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সিডরের পর বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি বারবার বিশ্বসভায় আলোচিত হচ্ছে! সিডরের ক্ষতি ছিল গোর্কির চেয়েও বেশি। মানুষ কম মারা গেলেও সিডরের অর্থনৈতিক ক্ষতি ছিল ব্যাপক। সিডরে ৩০ জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর মধ্যে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ছিল নয়টি জেলা। ২০০ উপজেলার ১ হাজার ৮৭১টি ইউনিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট ১৯ লাখ ২৮ হাজার ২৬৫ পরিবারের ৮৫ লাখ ৪৫ হাজার ৪৫৬ জন সিডরের আঘাতপ্রাপ্ত ছিল। মারা গিয়েছিলেন ৩ হাজার ৩০০-এর বেশি। তবে অর্থনৈতিক ক্ষতি ছিল ব্যাপক। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১৬ হাজার কোটি টাকা। সিডর ও আইলার পর ‘মহাসেন’ বাংলাদেশে আঘাত করেছিল। যদিও এতে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তার হিসাব আমরা পাইনি। সিডর ও আইলার আঘাত আমরা এখনো পরিপূর্ণভাবে কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আইলার আঘাতের পর খুলনার দাকোপ, কয়রা ও পাইকগাছায় যে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করা সম্ভব হয়নি। জলাবদ্ধতা কোথাও কোথাও ১ থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত। আইলায় ৮০ ভাগ ফলদ ও বনজ গাছ মরে গিয়েছিল। দক্ষিণাঞ্চলজুড়ে আজ নোনা জলের আগ্রাসন। সুপেয় পানির বড় অভাব ও ইসব অঞ্চলো এরপর মহাসেন আমাদের আবারও ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছিল।

আমাদের মন্ত্রী, সচিব কিংবা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তির বিদেশ সফর ও সম্মেলনে অংশ নিতে ভালবাসেন। কানকুন, ডারবান, কাতার কিংবা আরও আগে কোপেনহেগেনে (কপ সম্মেলন) আমাদের পরিবেশমন্ত্রী গেছেন। আমাদের কয়েকজন সংসদ সদস্য কোপেনহেগেনে প্লাকার্ড ও ফেস্টুন হাতে নিয়ে বিশ্ব জনমত আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। আমরা পরিবেশ রক্ষায় তাতে বড় ধরনের আর্থিক সহায়তা পাইনি।

বলা ভালো বাংলাদেশ এককভাবে বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারে না। বাংলাদেশ এককভাবে যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ও, তা সামগ্রিকভাবে বিশ্বের উষ্ণতা রোধ করতে খুব একটা প্রভাব রাখবে না। এ জন্য বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক আসরে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বিদেশি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। কিন্তু এই সাহায্যের ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। পরিবেশ বিপর্যয়ে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। গেলবার যে বন্যা হলো, আবার আমাদের সে কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিল। বন্যা, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড় এখন এ দেশে স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সিডর ও আইলার আঘাতে আমাদের যা ক্ষতি হয়েছিল, সেই ক্ষতি সাড়াতে সরকারের বড়সড় উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় ১ হাজার ২৬৮ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হলেও এখানেও ‘রাজনীতি’ ঢুকে গেছে। দলীয় বিবেচনায় টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে যেসব এনজিও জলবায়ু নিয়ে কাজ করেনি, যাদের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই, শুধু দলীয় বিবেচনায় তাদের নামে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। জলবায়ু তহবিলের অর্থ পাওয়া উচিত ও ইসব অঞ্চলে যেখানে ঘূর্ণিঝড়, প্লাবনের আঘাত বেশি আর মানুষ ‘যুদ্ধ’ করে সেখানে বেঁচে থাকে। অথচ দেখা গেছে, জলবায়ুর জন্য বরাদ্দকৃত টাকা দেওয়া হয়েছে ময়মনসিংহ পৌরসভাকে, মানিকগঞ্জের একটি প্রকল্পে কিংবা নীলফামারী তিস্তা বহুমুখী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে। সিরাজগঞ্জের প্রগতি সংস্থাও পেয়েছে খোক বরাদ্দ। অথচ এমন প্রতিষ্ঠানের একটিরও জলবায়ু সংক্রান্ত কাজের কোনো অভিজ্ঞতা নেই। জলবায়ু তহবিলের টাকা বরাদ্দেও যদি ‘রাজনীতি’ ঢুকে যায়, তাহলে এর চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু থাকতে পারে না। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী দেখা যায়, বরাদ্দ পাওয়া এনজিওগুলোর সঙ্গে সরকারি দলের নেতা ও কর্মীরা জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু দুর্নীতি যদি এখানেও স্পর্শ করে, তাহলে জলবায়ু ফান্ডে আর সাহায্য পাওয়া যাবে না। সচেতন হওয়ার সময় তাই এখনই। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে সারা বিশ্বে একটা উদ্ভিগ্নতা থাকলেও কতটুকু সচেতন আমরা তা নিশ্চিত নই। আমরা বারবার বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। পরিবেশ দূষণ হয় এমন কর্মকাণ্ডের ওপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি। কমা বিদেশ থেকে যে সাহায্য পাওয়া গেছে, তাতে দুর্নীতি রোধ করতে পারিনি। এমনকি সুন্দরবনের কাছাকাছি একটি কয়লানির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করে আমরা বড় ধরনের পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে রয়েছি। পরিবেশবাদীরা এর বিরোধিতা করলেও সরকার এ ব্যাপারে এখনো অনড়। মজার ব্যাপার বড় দল বিএনপি এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য না দিলেও বাম সংগঠনগুলো সোচ্চার। তারা সুন্দরবন পর্যন্ত লংমার্চের আয়োজন করেছিল। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাগেরহাটের রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ২০১২ সালের ২৯ জানুয়ারি। বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লা ব্যবহার করা হবে। এ জন্য বছরে ৪ মিলিয়ন টন কয়লা ভারত থেকে আমদানি করতে হবে। বিদ্যুৎ আমাদের দরকার। সন্দেহ নেই তাতে। কিন্তু কয়লা পুড়িয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এবং তাতে যে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে, তা কী আমরা বিবেচনায় নিয়েছি? না, নেইনি। ভারতীয় ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ারের সঙ্গে একটি চুক্তি হয়েছে বটে, কিন্তু পরিবেশের প্রভাব নিরূপণের জন্য ই-আইএ সমীক্ষা নি় করা হয়নি। রামপালের গৌরভুর কৈকরদশকাঠি ও সাতমারি মৌজায় ১ হাজার ৮৪৭ একর জমিতে এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মিত হবে, যা সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে। কয়লা পোড়ানো হলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার, নাইট্রিক এসিড বায়ুম-লে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে। এতে করে এসিড বৃষ্টি হবে। পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে। সুন্দরবনের গাছ, উদ্ভিদ মরে যাবে। পশুপাখির প্রজনন বাধাগ্রস্ত হবে। ধ্বংস হয়ে যাবে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যেত না? আমাদের গর্ব এই সুন্দরবন। ইতোমধ্যে সুন্দরবনকে গ্লোবাল হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা এমন কিছু করতে পারি না যেখানে বিশ্বের বৃহত্তম এ প্যারাবনের অস্তিত্ব হুমকির সৃষ্টি করে। রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করে সুন্দরবনের অস্তিত্ব হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত ইউনেস্কো কনভেনশন লংঘন করেছি। ফলে পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে আমরা যতই সোচ্চার হই না কেন, আমরা আমাদের নিজেদের পরিবেশ রক্ষায় কতটুকু সচেতন এ প্রশ্ন উঠবেই। প্যারিস সম্মেলনে যদি আদৌ সুন্দরবনের প্রশ্নটি ওঠে, আমি তাতে অবাক হব না।

প্যারিস সম্মেলনের আগে বৈদেশিক সাহায্যের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য না পেলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে না- এমন কথাও উঠেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, জলবায়ু মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান দেখানো উচিত। তবে সেই সঙ্গে এটাও সত্য, উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেরা যদি নিজেদের পরিবেশ রক্ষায় সচেতন না হয়, তাহলে বাইরের কোনো ‘শক্তি’ তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

প্যারিসে কপ-২১ সম্মেলনে একটি চুক্তি হলেও তা এখনই কার্যকরী হবে না। কার্যকর হবে ২০২০ সাল থেকে। বিশ্ব যদি প্যারিসে একটি চুক্তিতে উপনীত হতে না পারে, তাহলে আমাদের জন্য আগামী দিনগুলোতে আরও খারাপ খবর অপেক্ষা করছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে হাড় কাঁপানো শীত, মারাত্মক ঝড়, অব্যাহত তাপপ্রবাহ, তীব্র পানি সংকট এবং সেই সঙ্গে ভয়াবহ শরণার্থী সংকট আমরা প্রত্যক্ষ করব আগামী দিনগুলোতে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি ‘গ্রিনবিশ্ব’ উপহার দেওয়ার জন্য প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে একটি চুক্তি হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

প্যারিস সম্মেলন প্রত্যাশা পূরণ করবে কি?

৩০ নভেম্বর থেকে প্যারিসে কপ-২১ শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামাসহ ১৯৬টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা জলবায়ুবিষয়ক এ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। সম্মেলন চলবে প্রায় দু’সপ্তাহ এবং ধারণা করা হচ্ছে, বিশ্বের উষ্ণতা রোধকল্পে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাস করার ব্যাপারে বিশ্বনেতারা শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। বাংলাদেশের জন্য এই কপ-২১ সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক। কেননা বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে যে ক’টি দেশের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হবে, তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশের নাম। বাংলাদেশ এরই মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শরিক দেশগুলোর জোট ‘ভালনারেবেল টোয়েন্টি’তে (ভি-২০) যোগ দিয়েছে। ভি-২০-তে বাংলাদেশ ছাড়াও কিরিবাতি, টুভালুর মতো সাগরপাড়ের দেশগুলোর পাশাপাশি নেপাল, ভুটানের মতো দেশও রয়েছে, যাদের সীমান্তে কোনো সাগর নেই। এসব দেশ বড় ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় যে প্রযুক্তি ও অর্থের দরকার এ দেশগুলোর তা নেই। এমনকি পশ্চিমা বিশ্ব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা তারা দেয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নত সব দেশই আজ ঝুঁকির মুখে। তবে মালদ্বীপ কিংবা বাংলাদেশের মতো দেশের ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। তবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিশ্বের দেশগুলো নানা গ্রুপে বিভক্ত এবং তাদের স্ট্রাটেজিও ভিন্ন ভিন্ন। গ্রুপ-৭৭-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ১৩০টি দেশ। বিশ্বের জনসংখ্যার ৭৬ ভাগ এসব দেশে বসবাস করে এবং বিশ্ব জিডিপি ১৯ ভাগ তারা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এ দেশগুলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণ করে মোট নিঃসরণকৃত কার্বনের ৪২ ভাগ। চীন অন্যতম কার্বন নিঃসরণকারী দেশ (২১ ভাগ), অথচ বিশ্ব জিডিপি ৬ ভাগ তাদের এবং বিশ্ব জনসংখ্যার ২০ ভাগ চীনের। ধনী দেশগুলো এনেক্ষ ১-এর অন্তর্ভুক্ত, যাদের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ৫১ ভাগ; অথচ বিশ্ব জনসংখ্যার ১৯ ভাগ এবং জিডিপি ৭৫ ভাগ তাদের নিয়ন্ত্রণে। যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে ২০ ভাগ কার্বন নিঃসরণ করে, ৩০ ভাগ জিডিপি আর বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ৫ ভাগ তাদের। এর বাইরে আফ্রিকান ইউনিয়নভুক্ত ৩৯ দেশ, তেল ও গ্যাস সম্পদসমৃদ্ধ ওপেকভুক্ত দেশ এবং জনসম্পদসমৃদ্ধ ‘রেইনবো কোয়ালিশন’ভুক্ত দেশগুলোর অবস্থান আলাদা আলাদা। মোটামুটিভাবে সবাই এটা স্বীকার করে যে, তারা বায়ুমণ্ডলে কার্বন নিঃসরণের হার কমাতে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারত কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর শীর্ষে রয়েছে। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ করেছিল, (চীন করেছিল ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন টন), সেখানে ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নিঃসরণের পরিমাণ ছিল ৬ বিলিয়ন টন (চীনের ৬ বিলিয়ন টনের উপরে)। এখন যুক্তরাষ্ট্র বলছে, ২০২০ সালের মধ্যে তারা কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে ১৭ থেকে ২০ ভাগ। চীন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৪৫ থেকে ৫০ ভাগ কমানো। আর ভারতের প্রতিশ্রুতি ২০ ভাগ কমানো। দেশগুলো এই প্রতিশ্রুতি কতটুকু রাখতে পারবে এটাই বড় প্রশ্ন। এখন বাংলাদেশের ঝুঁকির প্রসঙ্গটি বিশ্ব মিডিয়ায় অনেকবারই এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ভেতরে বিষয়টি নিয়ে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয়নি। অনেকে স্মরণ করতে পারেন, চলতি বছরের প্রথম দিকে অনেকটা অগোচরেই খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিন দিনব্যাপী জলবায়ু উদ্বাস্ত সংক্রান্ত একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্মেলন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের একটি সম্মেলনের যথেষ্ট গুরুত্ব থাকলেও মিডিয়ায় সেই সম্মেলন সংক্রান্ত খবরাদি আমার চোখে পড়েনি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংগঠক ‘ন্যানসেন ইনিশিয়েটিভ’ের সহযোগিতায় ওই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলের ১৪টি দেশের সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের প্রতিনিধিরা। খুলনায় এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য নিঃসন্দেহে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে রয়েছে। আর বাংলাদেশের যেসব এলাকা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর খুলনা। ঘূর্ণিঝড় ‘সিডর’ ও ‘আইলা’য় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো এ অঞ্চলেই অবস্থিত। এ অঞ্চলের মানুষ আজও সিডর ও আইলার বিপর্যয় থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। এখানে গত বছর ডিসেম্বরে পেরুর রাজধানী লিমা অনুষ্ঠিত কপ-২০ (কমিটি অব দ্য পার্টিস) সম্মেলনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে লিমা ঘোষণা ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। তবে প্রশ্ন আছেই। উন্নত বিশ্ব শেষ পর্যন্ত লিমা ঘোষণাকে বিবেচনায় নিয়ে প্যারিসে চুক্তি স্বাক্ষর করে কি-না, তা জানার জন্য আমাদের আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের দ্বন্দ্বের আলোকে মার্কিন কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত কোনো চুক্তির ব্যাপারে আপত্তি তোলে কি-না, সেটাই দেখার বিষয়। তবে প্যারিসে এ নিয়ে বেশ দেন-দরবার হবে। উন্নত বিশ্বের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলো আন্তর্জাতিক আসরে দেন-দরবার করবে। জাতিসংঘ উদ্যোগী হবে। তবে বলার অপেক্ষা রাখে না, এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘের করার কিছু নেই। কেননা উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র যদি রাজি না হয়, তাহলে প্যারিস সম্মেলনে শেষ

পর্যন্ত কোনো চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। আমাদের জন্য খুলনা সম্মেলনের গুরুত্ব যথেষ্ট। সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাংলাদেশ প্যারিসে অনুষ্ঠানরত ‘কপ’ সম্মেলনে উপস্থাপন করছে। খুলনা ঘোষণায় বলা হয়েছিল, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের বাস্তুচ্যুতি একটি নির্মম সত্য। এ সমস্যা মোকাবেলায় স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করতে হবে। বাস্তুচ্যুতি ঠেকাতে এবং নিদেনপক্ষে বাস্তুচ্যুতদের সহযোগিতায় দেশীয় পর্যায়ে দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী ধনী ও উন্নত দেশগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতিমালা তৈরি করাও একান্ত জরুরি। এছাড়া বাস্তুচ্যুত অভিবাসীদের সুরক্ষার জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে, তাদের সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক পরিসরে তেমন কোনো কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করেছে বলেও আমার জানা নেই। অথচ দ্বীপাঞ্চল থেকে মানুষ প্রতিদিনই উদ্বাস্তুতে পরিণত হচ্ছে এবং বড় বড় শহরে আশ্রয় নিয়ে বস্তুি জীবন বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ তাদের পারিবারিক পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ এদের পুনর্বাসনের কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই। বাংলাদেশ বারবার আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় স্থান পেলেও এ দেশের পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যারা চালান তারা এ ব্যাপারে কতটুকু সচেতন, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অতি সম্প্রতি একটি শংকার কথা আমাদের জানিয়েছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)। বাংলাদেশ এই জলবায়ু পরিবর্তনে কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এডিবির এক রিপোর্টে সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এডিবি জানিয়েছে, ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি গড়ে ১ দশমিক ৮ শতাংশ করে কম হতে পারে। চলতি শতাব্দী শেষে এ ক্ষতি হতে পারে প্রায় ৯ শতাংশ। আর বৈশ্বিক তাপমাত্রা বাড়তে পারে ৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এডিবির এ রিপোর্টে দক্ষিণ এশিয়ার অপর দুটি দেশ নেপাল ও মালদ্বীপের ক্ষতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হবে, তা এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। শুধু এডিবির রিপোর্টেই নয়, জাতিসংঘের রিপোর্টেও এই ক্ষতির দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে। একাধিকবারা প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা কপ বা কমিটি অব দ্য পার্টিস নামে পরিচিত, সেখানেও বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যার কথা উঠে আসে। দেশের পরিবেশমন্ত্রী ঘটা করে কপ সম্মেলনে যান। কিন্তু ওই পর্যন্তই ইতিমধ্যে নাসা আরও একটি আশংকার কথা জানিয়েছে। নাসা আশংকা করছে, গ্রিনল্যান্ডে যে বরফ জমা রয়েছে তা যদি উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গলে যায়, তাহলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৭ মিটার বৃদ্ধি পাবে। তাই কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাসের কথা বলছে নাসা। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর তার এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন, বিশ্বের বৃহত্তম বন্দরগুলোয় ইতিমধ্যে ৪ কোটি মানুষ মারাত্মক প্লাবনের হুমকির মুখে আছে। আল গোর বিশ্বের ১০৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে (বাংলাদেশের সাবেক পরিবেশমন্ত্রী হাছান মাহমুদও ছিলেন ওই দলে) গিয়েছিলেন অ্যান্টার্কটিকায়। শুধু জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য। কিন্তু বিশ্ব সম্প্রদায় এখনও নীরব। প্রতিবছরই কপ সম্মেলনে ভালো ভালো কথা বলা হয়। কোপেনহেগেন থেকে লিমা (২০১৪) সম্মেলন পর্যন্ত প্রতিটি সম্মেলনেই বলা হয়েছিল, ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্ব কার্বন নিঃসরণ কমাতে একটি চুক্তি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো। এ সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হলেও বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত কতটুকু কার্যকর হবে তা স্পষ্ট নয়। গত বছর ডিসেম্বরে লিমা সম্মেলনে বলা হয়েছিল, পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কমাতে প্রতিটি দেশ নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ও কাঠামো উপস্থাপন করবো। প্রতিটি দেশকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নিজস্ব কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করার। অর্থাৎ তারা নিজেরাই কার্বন নিঃসরণ কমানোর ব্যবস্থা বের করবো। প্রশ্নটা এখানেই। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে একটি কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন রয়েছে; কিন্তু এ নিয়ে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা হয়নি। আমাদের আমলারা বিদেশ ভ্রমণে যেতে পছন্দ করেন। সম্মেলনে যোগ দিয়ে যে হাতখরচ পাওয়া যায়, তা নিয়ে কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকেন তারা। দেশে ফিরে এসে একরকম ‘ভুলে’ যান সবকিছু। খুলনা সম্মেলনে পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক বলেছিলেন, শুধু ২০০৮ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ৪ কোটি ৬ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে (কালের কণ্ঠ, ৬ এপ্রিল)। তার এ বক্তব্যের জন্য তাকে আমি সাধুবাদ দিতে পারি না। কেননা জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশের ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যে সফল, তা তারা দাবি করতে পারে না। পত্রপত্রিকা থেকে দেখেছি বাংলাদেশ লিমা সম্মেলনের আলোকে অতি সম্প্রতি একটি ‘কর্মপরিকল্পনা’র জন্ম দিয়েছে। এতে ১৫ ভাগ কার্বন নিঃসরণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু যদি বিনিয়োগ না আসে, যদি প্রযুক্তি সহায়তা না পাওয়া যায়, তাহলে এই প্রতিশ্রুতি কাগজে-কলমেই থেকে যাবে। তাই ভি ২০ জোটে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ তার স্বার্থ কতটুকু আদায় করতে পারবে এ প্রশ্ন থাকল। প্যারিসে সন্ত্রাসী ঘটনাবলীর পরও এ সম্মেলন শুরু হয়েছে। শুধু বিপুলসংখ্যক সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতিই নয়, বরং প্রায় ৫০ হাজার মানুষের উপস্থিতি (যারা বিভিন্ন দেশ থেকে গেছেন, যাদের মধ্যে অনেক এনজিও প্রতিনিধিও আছেন) প্যারিসকে পুনরায় বিশ্বের আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত করলেও একটি ‘ভালো খবর’ প্যারিস কপ-২১ সম্মেলন জন্ম দিতে পারবে কি-না, সেটাই দেখার অপেক্ষায় আছি আমরা। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা হচ্ছে ‘কর্পোরেট হাউস’ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা। বড় বড় কর্পোরেট হাউসের ব্যবসায়িক স্বার্থ রয়েছে। তাই তারা তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কার্বন হ্রাস কতটুকু কমাবে, চীন তার কার্বন নিঃসরণ কতটুকু কমাবে বা আদৌ কমাবে কি-না, ভারতের ভূমিকাই বা কী হবে- এসব প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠেছে। তারপরও একটি চুক্তি হোক- এ প্রত্যাশা সবার।

অর্থনীতির গতিপথ : বাস্তবতার আলোকে নিকট ভবিষ্যৎ

মোঃ শাকিল আহমেদ ও তৌহিদ এলাহী : উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত রূপকল্প অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে হওয়ার জন্য সবার আগে প্রয়োজন শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি। কৌতুহল হয়, আমরা কোন পথে আছি, নিকট ভবিষ্যতে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? উত্তর জানতে অর্থনীতির সাধারণ কিছু চলক ও নির্দেশকের বিশ্লেষণ করলেই চলে। সাধারণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশক, আমাদের শ্রম শক্তির বৃদ্ধির হার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার, লেনদেন ভারসাম্য, শেয়ার মার্কেটের অবস্থা, বিরাজমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রভৃতি

বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতির নিকট ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানা সুবিধে হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য বিষয়টিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে সাধারণ অর্থনীতি এবং দ্বিতীয় ভাগটিতে আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতগুলোর ভূমিকা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কিছু বলা যাক।

সাধারণ অর্থনীতি

বাংলাদেশের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫৫% এবং মূদ্রাস্ফীতি ৬.০৭%। সাম্প্রতিক কিছু বছরের গতিপথ বিশ্লেষণ করে বলা যায়, আমাদের অর্থনীতির সামনের কিছু বছর জিডিপি প্রবৃদ্ধির এই হার ৬% এর আশেপাশেই থাকবে। দেশি-বিদেশি বেসরকারি স্বনামধন্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো একই ভবিষ্যৎবাণী করে যাচ্ছে। তারা মূদ্রাস্ফীতির হার অনুমান করছে ৪.৮%। শুধু এ দুটো তথ্য দেখে চোখ বন্ধ করে বলা যায়, আমাদের অর্থনীতির চমৎকার শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। কোনরকম আতঙ্কজনক মূদ্রাস্ফীতি ছাড়া। সারা দুনিয়ার অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখা যায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি আর মূদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এক গাছের দুই ফল। এরা একসাথে বাড়ে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে উল্টা। এই উল্টাপাল্টা ব্যাপারটি আমাদের অর্থনীতির জন্য আশির্বাদ।

আগেই বলেছি, বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার চমৎকার ও নিয়মিতভাবে ৬% আশেপাশে। এটাকে চমৎকার বলাটাকে অনেকেই মানবে চাইবেন না। বলবেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দুই অঙ্কের বা ন্যূনতম ৭% এর বেশি হওয়া উচিত। আসলে কোন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শ্রমশক্তির এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের ওপর নির্ভর করে। এদেশের বিগত ২৫ বছরের শ্রমশক্তির বৃদ্ধির হার এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারের গড় যথাক্রমে ২.২৩% এবং ২.৭৪%। ২০১৪ সালে এ বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২.১৩% এবং ৩.৫৮%। হার দুটো যোগ করে আমরা প্রত্যাশিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার পাই ৫.৭১%। এর অর্থ হলো ইতোমধ্যে আমাদের অর্জিত জিডিপি বৃদ্ধির হার প্রত্যাশিত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৭.৪%। মনে রাখা উচিত, বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনেক সময় মূদ্রাস্ফীতি উৎসে দেয়। তখন দ্রব্যমূল্য বাড়ে এবং সুদের হারও বাড়ে।

২০১৫ সালে আমাদের বেসরকারি বিনিয়োগ কম ছিল। যদি সুদের হার কমে যায়, অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে। সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বহুমাত্রিক পদক্ষেপে মাধ্যমে এ সমস্যা নিরসনে তৎপর।

আমাদের সামগ্রিক বেকারত্বের হার বেশ কম যা ৫% এর আশেপাশে। কিন্তু আমাদের যুব বেকারত্বের হার প্রায় ৪৭%। এটা চিন্তার বিষয়। কারণ, যুব বেকারত্ব সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ আরো বাড়ানো উচিত। সে কারণেই আমাদের মূদ্রাস্ফীতি অবশ্যই কম রাখতে হবে। সে বিচার বিশ্লেষণে আমাদের অর্থনীতি সঠিক পথে এগুচ্ছে।

আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বছরের জন্য জিডিপিতে উৎপাদন খাতের আবদান ২% বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে এ হার ৩০.৪%। এ বৃদ্ধি পরিকল্পনাটি আমাদের সরকারের যুগোপযোগী পরিকল্পনা সিদ্ধান্ত এবং বেকারত্বের হার কমানোর জন্য খুবই দরকারি। কিন্তু এর জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শক্ত পদক্ষেপ ও নজরদারী দরকার। সরকার পদক্ষেপ নিবে তার রাজস্ব সংক্রান্ত নীতির মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করবে মূদ্রানীতির মাধ্যমে।

২০১৬ সালের মূদ্রানীতি হচ্ছে একটি বিনিয়োগ সহায়ক মূদ্রানীতি। মূদ্রাস্ফীতির হার কমানোর মাধ্যমে সুদের হার কমিয়ে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ তাল মিলিয়ে যাচ্ছে। বেকারত্বের হার কমানোর জন্য সরকার তার রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান তৈরি করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তাই এ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকারি রাজস্ব ব্যয়কে ২১% এ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় একদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদের হার কম রাখার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়চ্ছে অন্য দিকে বাংলাদেশ সরকার রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরি করছে। আমাদের মূদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতি একটি আরেকটির পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে।

গত জুনে দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি দেখেছি। এর পরিমাণ ছিল প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার। অনেকেই খারাপ আশংকা করেছিলেন। কিন্তু নভেম্বরেই আমরা আবার ২ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্তে পৌঁছে গেছি। সাময়িক সমস্যাটি হয়েছিল বাণিজ্য ঘাটতির জন্য। যার পরিমাণ ছিল প্রায় ৯.৫ বিলিয়ন ডলার। য ঘাটতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বেশির ভাগ আমদানি হয়েছিল মূলধন জাতীয় ব্যয় যেমন যন্ত্রপাতি কেনার জন্য। এ ধরনের আমদানি উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং নিকট ভবিষ্যতেই এর ফল পাওয়া যায়। বেশি পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানি আমাদের বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। এটি আমাদের দেশে কর্মসংস্থান তৈরিতে সহায়তা করে যাচ্ছে।-চিত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এর তথ্য থেকে।

আমাদের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক রেমিটেন্স। প্রায় ১ কোটি প্রবাসী তাদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। গত বছর এই রেমিটেন্সের হার একটু কম ছিল। কিন্তু সরকার তার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নতির মাধ্যমে মালয়েশিয়ার সাথে চুক্তিতে এসেছে। দেশটি আগামী তিন বছরে বাংলাদেশ থেকে ১৫ লক্ষ জনশক্তি নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে তারা লোকবল নেওয়া শুরু করেছে। বিরতির পর কুয়েত আমাদের দেশ থেকে আরো জনশক্তি নেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। অন্যান্য দেশগুলোর সাথে এরকম সম্পর্কের উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। পদক্ষেপ

গুলো সফল করার মাধ্যমে রেমিটেন্স বৃদ্ধির জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ নির্দেশকগুলো থেকে বোঝা যায়, আগামী বছরগুলোতে আমাদের অর্থনীতিতে রেমিটেন্স উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়বে।

সেই অর্থে বলতে গেলে আমাদের অর্থনীতির অন্যতম সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সাম্প্রতিক শেয়ারবাজার সংকট। এখন পর্যন্ত আমাদেরকে এ সঙ্কট তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা মার্কেটের ওপর বিশ্বাস আনতে পারছেন না। এ কারণে বাংলাদেশ সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক-এর কোনও পদক্ষেপ আপাত দৃশ্যমান অবদান রাখতে পারছে না। শেয়ারমার্কেটের এ অবস্থার কারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে তরল অর্থ বাড়ছে। বিনিয়োগকারীরা শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করার চেয়ে টাকা ব্যাংকে রাখাকে নিরাপদ মনে করছেন বেশি। সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার চেষ্টা করছে সমাধানের। এর ফলশ্রুতিতে আগামী কয়েক বছরে আমাদের শেয়ার মার্কেট ও স্থিতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আইএমএফ পুরো বিশ্বের জন্য অর্থনীতির বৃদ্ধির হার অনুমান করছে ৩.১%। যদিও এটি গত বছরের তুলনায় ০.৩% কম, তবুও বলা যায় সামগ্রিক বৃদ্ধির হার যথেষ্ট স্থিতিশীল। এই বৃদ্ধির হার অনুমান করা হয়েছে প্রধানত ব্রিকস (ইজওঈব) দেশসমূহ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে। তেলের দাম অব্যাহত হ্রাসের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে পণ্যের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে। তেলের দাম অব্যাহত হ্রাসের মূল কারণ তেলের সরবরাহ বৃদ্ধি। ইরানের সাথে নিউক্লিয়ার চুক্তি ইরানের তেলকে বিশ্ব বাজারে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। খাতব পদার্থের মূল্য সমহারে হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে উৎপাদন খরচ কমে যাবে। রপ্তানী আয় ও দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এ গতিপথের জন্য আমাদের অর্থনীতি সামনে অনেক বেশি সুফল ভোগ করবে। বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে। সম্ভাব্য একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে টাকা অন্যান্য উন্নত দেশের মূদ্রার তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়ে যেতে পারে। ফলে আমাদের রপ্তানীকারকদের উন্নত দেশের বাজারের মার্কেটে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হবে। এখানে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমাদের রপ্তানী আয়ের সিংহভাগ আসে গার্মেন্টস শিল্প হতে। কর্মসংস্থান তৈরিতে এখাতের অবদান অপরিমীম। গার্মেন্টস শিল্প গত কয়েক বছরে রানা প্লাজা এবং তাজরিন ফ্যাশানের মত বেশকিছু দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। ওই দুর্ঘটনাগুলোর জন্য গত কয়েক বছর এ খাত থেকে আয় বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে গেছে। পরবর্তিতে, দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরকার এ খাতের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারের শক্তিশালী নজরদারি, পরিবেশগত সচেতনতা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এর নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে বিনিয়োগের পুনঃঅর্থায়ন স্কিম, এ দেশেই প্লামি ফ্যাশান এর মত গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে যা সারাবিশ্বের মধ্যে অন্যতম পরিবেশ ও শ্রমিকবান্ধব তৈরি পোশাকের প্রতিষ্ঠান। ইমেজ পুনরুদ্ধারে এখানে আমাদের কিছু সময় দিতেই হবে। যদি দুর্ঘটনাগুলোকে প্রতিরোধ করা যায়, সামনের বছরগুলোতে এই শিল্পে ভালো প্রবৃদ্ধি আশা করতে দোষ নেই। ইউনাইটেড স্টেটস ফ্যাশান ইন্ডাস্ট্রি এসোসিয়েশন (টেক্সওআ) এবং রোড আইল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গার্মেন্টস শিল্প সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বলেছে। ম্যাকিন্সে (গপশরহংবু) আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার ৭-৯% অনুমান করেছে এবং ২০২০ সালের মধ্যে আমাদের গার্মেন্টস রপ্তানি উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়বে। তবে তারা আমাদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরিসহ বেশকিছু চ্যালেঞ্জের কথা বলেছে।

এবার সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়নের দিকে নজর দেয়া যাক। দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচন (যদিও লক্ষ্যের এখনও কিছুটা নিচে), প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ, বিদ্যুতায়ন, এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার খুবই আন্তরিক। ব্যাপক ব্যাত্যয় না হলে আমাদের অর্থনীতি সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে সামনের পাঁচ বছরে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান সেক্টর :

বাংলাদেশের বাজারে রয়েছে ৫৬ টি ব্যাংক, ৩৩ টি নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কিছু বিদেশী প্রতিষ্ঠান আর অসংখ্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা। হয়তো আরো কিছু ব্যাংক আসছে। ব্যাংকগুলোতে বিরাজমান তারল্য সমস্যা এখাতে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যাংকগুলোতে প্রয়োজনের বেশি তরল অর্থ বিদ্যমান। এটি অর্থনীতির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কিছু পরিমাণ তরল অর্থ কোন ব্যাংকের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করে। কিন্তু যখন তা প্রয়োজনের চেয়ে ঢের বেশি হয় তখন ব্যাংকগুলোকে ঐ তরল অর্থের জন্য জমাকারীদেরকে অর্থ দিতে হয়। তারা কোথাও বিনিয়োগ করতে পারে না। টাকা অলস পড়ে থাকে। এতে ব্যাংকিং সেক্টর এর স্থিতিশীলতা বিঘ্ন হয়। বর্তমান অবস্থার পিছনে কিছু কারন হিসেবে উল্লেখ করা যায়ঃ

➤ বিগত বছরের তুলনামূলক ধীর গতির বেসরকারি বিনিয়োগ।

➤ ব্যাংকিং সেক্টর কিছু প্রতারণা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে খুব বেশি সতর্ক করে দিয়েছে। এটি অনেক সময় বিনিয়োগে বাধা সৃষ্টি করে।

শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগকারীদের আস্থার অভাব।

শেয়ার মার্কেট ধ্বসের পর নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ, (যদিও ঐ পদক্ষেপ গুলো দরকার ছিল মূদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য)।

অতিরিক্ত তারল্য এই উপরোক্ত কারণগুলোর সম্মিলিত ফলাফল। গত বছর বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও বৃদ্ধি করেছে এই তারল্য সমস্যা রোধের জন্য। যথাযথ ফলাফলের জন্য আরো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার দরকার। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, আজ থেকে দু-তিন বছর পর যখন বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে তখন সাথে সাথে অর্থের চাহিদাও বাড়বে। ফলে, এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আমাদের বর্তমান মূদ্রানীতি অনুযায়ী, অর্থনীতি চাঙ্গা করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে অর্থ সরবরাহ ১৫% বৃদ্ধি করবে। ধারণা হতে পারে, এই অর্থ বৃদ্ধির কারনে মূদ্রাস্ফীতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু আমাদের ঈচও বক্সে খাদ্য উপাদান হচ্ছে ৬০%। সামনের বেশ কিছু বছর বিশ্ববাজারে খাদ্য মূদ্রাস্ফীতি কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আমরা এই অর্থ সরবরাহের ধাক্কা সহজেই মোকাবেলা এবং এর সুফল ভোগ করতে পারবো।

সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর সাথে সাথে রয়েছে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এ দুই উন্নয়ন পরিকল্পনা যদি সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা হয় তবে আমাদের অনেকগুলো সমস্যার সমাধান একসাথে হতে পারে। বিদ্যুৎ এবং রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন যে কোন দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া ফলশ্রুতিতে, দেশে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, শেয়ার মার্কেট গতিশীল হবে এবং অতিরিক্ত তারল্য সমস্যা কমে যাবে।

বিগত কয়েক দশক ধরে আমাদের ব্যাংকিং খাত বলার মত উন্নতি করে আসছে। ১৯৯৯ সালের পর প্রতি বছর ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো চমৎকার উন্নতির হার বজায় রেখেছে। এই খাতের উন্নতি কিছু আনুপাত দ্বারা পরিমাপ করা যায়। যেমন গ২ টি জিডিপি আনুপাত। যা এই খাতের স্থিতি প্রকাশ করে। এই আনুপাত ১৯৮০ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ১২% থেকে ৫৫% এ এসে পৌঁছেছে। আবার কুঋণ আনুপাত হ্রাস পেয়ে ২০১১ সালে মাত্র ৬.১% এ এসে দাঁড়িয়েছে। যা ১৯৯৯ সালে ৪১% ছিল। যদিও ২০১১ সাল থেকে সেটি আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মোটেও আশঙ্কাজনক কিছু নয়। কুঋণ বৃদ্ধির প্রধান কারনগুলোর মধ্যে রয়েছে হল মার্ক, বেসিক ব্যাংক ও বিসমিল্লাহ গ্রুপ ইত্যাদি সমস্যা। এই তিন সমস্যা মোট কুঋণ ১% অবদান রেখেছে। তবে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক এগুলোর বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েছে এবং চেষ্টা করছে ভবিষ্যতে এধরনের সমস্যাগুলো যথাযথভাবে রোধ করতে। এগুলোকে প্রতিরোধ করা গেলে নিকট ভবিষ্যতে ব্যাংকিংখাত দৃশ্যমানভাবে হুঁপুটি হবে। ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাাপ্ততা আশাব্যঞ্জক। তাই নিকট ভবিষ্যতে ব্যাংকিং খাতের দেউলিয়া হবার সম্ভাবনা নেই বলেই চলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর উপার্জন ক্ষমতা ভালভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ধারা অনুসারে আমাদের দেশের এ খাত সামনের বছরগুলোতে দিন দিন আরো ভালো করবে।

দেশে ব্যাংকিং খাতের সেই অর্থে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এ খাতের প্রতিযোগিতা খুব বেশি। ছোট এ বাজারে ৮৯ টি নিবন্ধিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর সাথে সাথে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদেশি ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিচ্ছে যা প্রতিযোগিতাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। যদিও ঋণ প্রদানের অনুমতি দেয়া হচ্ছে, ঋণ বর্টন হচ্ছে না। ২০১২ এবং ২০১৩ সালে অনুমোদিত ঋণের যথাক্রমে মাত্র ৩৫% ও ২৫.৩% ঋণ বন্টিত হয়েছে। এটিও একটু মাথা ঘামানোর বিষয়। কারন, আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো বাইরে থেকে ঋণ আদায়ের জন্য দরকারি কাগজ দাখিল করতে পারছে না। কিন্তু তা দিয়েই আবার বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নেয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথাযথ পদক্ষেপের নজর দিচ্ছে বলে জানা যায়।

২০১৪ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশে ব্যাসেল থ্রি নীতি(ইআরউই ৩৩)ও বাস্তবায়ন করছে। এ নীতি মূলত ২০০৮-০৯ সালের বিশ্ব মন্দার পর ব্যাংকিং খাত কে আরো মজবুত করার জন্য। এই নীতি বাস্তবায়ন করার পর আমাদের ব্যাংকিং খাত আরো বেশি নিরাপদ হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যাংকিং খাতের ধর্মই হলো যত বেশি স্থিতি তত বেশি খরচ। তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে এটি আমাদের ব্যাংক গুলোর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অন্যতম সফলতম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আমাদের অর্থনীতির স্থিতিশীল উন্নতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মডেলস্বরূপ। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর নজরদারি মজবুত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু ক্ষুদ্র উপযোগী নিয়ন্ত্রণ মডেল বাস্তবায়ন করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ধন্যবাদ পাওয়ার মত। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন ইবাউঈ, ওউজঅ, গজঅ, জওবঈ একসাথে করে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান করার চিন্তা করছে। এটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি দিবে এবং অর্থনীতির উন্নতি বেগবান করবে।

সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত সামনের পাঁচ বছর একটি স্থির গতি সম্পন্ন প্রবৃদ্ধির হার উপভোগ করবে। এর সাথে সাথে

আমাদের সামগ্রিক অর্থনীতিও নিকট ভবিষ্যতে কোন বাঁধা ছাড়াই সামনের দিকে এগিয়ে যাবে দেশ এগিয়ে যাবে কাংখিত লক্ষ্যের দিকে। উন্নত বাংলাদেশ তখন কোন কল্পনা পরিকল্পনা হিসেবে আখ্যায়িত করার সুযোগ থাকবে না। উন্নত বাংলাদেশই আমাদের ভবিষ্যত।

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্প্রসারণ কোন পথে

পনেরো কোটি লোকের বাংলাদেশে কমপিউটার আছে ক'জরে? বছরে কি পরিমাণ কমপিউটার বিক্রি হয়? হার্ডওয়্যারের বাজার কতো টাকার? সফটওয়্যারের বাজারই বা কতো টাকার? আমরা বছরে কতো টাকার সফটওয়্যার ও সেবা রফতানি করি?

এতগুলো প্রশ্নের মাঝে শুধু শেষ প্রশ্নটির একটি নির্ভরযোগ্য জবাব পাওয়া যায়। হয়তো একটু চেষ্টা করলে বাংলাদেশে আমদানিকরা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পরিমাণ কি তা জানা যাবে। হয়তো সফটওয়্যার আমদানির তথ্যাবলীও জানা যাবে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির বাজারটির আকার কি সেটি জানা বা বুঝা খুবই কঠিন হবে। কার্যত অবশিষ্ট প্রশ্নগুলোর কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য কারো কাছে নেই।

কিন্তু কেউ যদি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রকৃত পরিচয় জানতে চান তবে তার জন্য এই তথ্যগুলো আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন।

এবার ডিসেম্বর মাসে আমি যখন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন করি তখন বার বার আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে একটি দাবির কথা শুনেছি, আমাদের কমপিউটারের বাজার বাড়তে হবে। তারা বলেছেন, কাছাকাছি জনসংখ্যার দেশ পাকিস্তানের তথ্যপ্রযুক্তি বাজার আমাদের তিন-চারগুণ। ভারতের সাথে কেউ তুলনা করার সাহস পান না। কেউ কেউ মনে করেন, নেপাল বা ভুটান আমাদের চাইতে শক্ত অবস্থান তৈরি করে ফেলেছে। পাশের দেশ মিয়ানমার সামরিক শাসনের যঁতাকলে পিষ্ট হয়ে এগিয়ে আসতে পারছে না বটে-তবে ই-গভর্নেন্স বা শিক্ষায় কমপিউটারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রযাত্রা ঈর্ষণীয়। আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সংকটটিও ভয়াবহ। দেশে বিপুলসংখ্যক কমপিউটার বিক্রেতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কমপিউটারের বাজার না বাড়ায় প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে গলাকাটা। আমাদের কমপিউটার ব্যবসায়ীরা তাই খুব সঙ্গত কারণেই বড় আকারের একটি বাজার সৃষ্টি করতে চান। আমাদের দেশের একজন বৃহৎ আমদানিকারকের মতে ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত আমাদের কমপিউটারের বাজার শতকরা ২০ থেকে ৫০ ভাগ বেড়েছে। ২০০৪ ও ২০০৫-এ সেই বৃদ্ধির গতি কমতে থাকে। তবে বাজার তখনও বাড়ছিলো। ২০০৬ সালে তথ্যপ্রযুক্তির বাজার ঋণাত্মকভাবে কমে যায়। ২০০৭-এ সেই বাজার বাড়লেও সেটি কেবল ২০০৬-এ কমে যাওয়াটা পরণ করতে সক্ষম হয়। এর অর্থ দাঁড়ায় ২০০৭ সালের শেষে আমাদের কমপিউটার বাজার ২০০৫ সালেই দাঁড়িয়ে ছিলো। তার মতে, ২০০৮ সালের জানুয়ারিতে কমপিউটারের বাজার বেড়েছে। ফেব্রুয়ারির গতিও ভালো ছিলো। আমার নিজের বিবেচনায় মার্চ-এপ্রিল-মে-জুন এই চার মাসে বাজারের গতি আরো উর্ধ্বমুখী থাকবে। এর একটি অন্যতম কারণ হলো, এই সময়ে সরকারের কেনাকাটা হয়ে থাকে। তবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়কালে কমপিউটারের বাজার নাও বাড়তে পারে, হয়তো স্থিতিশীল থাকবে। এর কারণ সরকার এই সময়ে কেনাকাটা করে না। তবে অক্টোবর থেকে বাজারের উর্ধ্বগতি অব্যাহত থাকবে বছরজুড়ে। অবশ্য এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের সবাইকে কিছু ইনপুট দিতে হবে। আমি সঠিক তথ্য না জানলেও এটি দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, ২০০৮ এবং ২০০৯ সালের মধ্যে আমাদের কমপিউটারের বাজার দ্বিগুণ করতে না পারলে ব্যবসায় হিসেবে এই খাত রুগ্ন হবে এবং জাতীয় উন্নয়ন মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। আমি দৃঢ়ভাবে এটিও বলতে পারি, উপযুক্ত পরিকল্পনা করা হলে এবং সেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হলে ২০০৮ সালে শতকরা ৪০ ভাগ এবং ২০০৯ সালে শতকরা ৭০ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য কমপিউটার শিল্পকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। সরকারকেও কিছু প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

সরকারের করণীয়কে আমি কিছু অনুচ্ছেদে বর্ণনা করতে চাই। সচরাচর আমরা তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে বড় ধরনের রচনা লিখি এবং যা লিখি তার প্রায় কোনোটাই বাস্তবায়িত হয় না। সেজন্য আমাদের প্রয়োজন কম অর্থ শক্তিশালী ও সৃষ্টি কর্মসূচি। আমি নিচে আমাদের এই খাতের একটি ক্ষুদ্রতম এজেন্ডা প্রকাশ করছি।

এখন ইন্টারনেট হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির সবচেয়ে বড় বাহন। সরকারকে যেকোনো মূল্যে ঘরে ঘরে ইন্টারনেট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সৌভাগ্যবশত এখন আমাদের হাতে সেই সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হয়ে এখন অভ্যন্তরীণ ব্যাকআপও তৈরি করেছে। অন্যদিকে সরকার আর্ন্তজাতিকভাবে বিকল্প সাবমেরিন ক্যাবল লাইন হিসেবে মিয়ানমারের মাধ্যমে সি-মি-উই-৩-এ যুক্ত হতে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিটি আনন্দদায়ক। এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে, ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের সময় নামমাত্র মূল্যে ও সাধারণ মানুষকে স্বল্পমূল্যে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ দিতে হবে। স্মরণ রাখা ভালো, আমাদের প্রাপ্ত ব্যান্ডউইডথের শতকরা ৮০ ভাগ এখন অপচয় হয়। সাধারণ মানুষের জন্য এই ব্যয় মাসিক ২০০ টাকা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাসিক ৫০ টাকা ধার্য করা যেতে পারে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য কমপিউটার নেই সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি কমপিউটার কিনলে দু'টি ফ্রি এমন পদ্ধতিতে সরকারে পক্ষ থেকে কমপিউটার দিতে হবে। সারাদেশে টেলিসেন্টার বা ডিজিটাল পাড়াকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। দেশের ভেতরে অভ্যন্তরীণ ব্যান্ডউইডথ ব্যয় শন্যের কোটায় নামাতে হবে। ইন্টারনেটের লেনদেন বৈধ করতে হবে এবং আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৬ কার্যকর করতে হবে। সরকার একশ ডলারের ল্যাপটপ কিনে বিতরণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারে শিক্ষা খাত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অথচ এই খাতটি দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত হয়ে রয়েছে। আমার মতে ২০০৯ সালের মাঝে দেশের সব হাইস্কুলে কমপিউটার পৌঁছাতে হবে। ২০০৯ সালের মাঝে সব ছাত্রছাত্রীর জন্য কমপিউটার জ্ঞান বাধ্যতামূলক ও ২০১১ সালের মাঝে কমপিউটার সাক্ষরতা বাধ্যতামূলক ও ২০১৫ সালের মাঝে কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এজন্য আগামী বছরের পাঠ্যক্রমে কমপিউটার সম্পর্কিত তত্ত্বীয় জ্ঞান পাঠ্য করতে হবে। প্রতিটি ক্লাসের বিজ্ঞান বইতে এসব অধ্যায় যোগ করা যায়। ২০১১ সালে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার ল্যাব থাকা এবং প্রতিটি ছাত্র ও শিক্ষকের কমপিউটার জ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। অন্যদিকে ২০১৫ সাল থেকে প্রতিটি স্কুলের প্রতিটি ছাত্রের জন্য কমপিউটার শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমি নিজে মনে করি, এই সময়সীমা একটি বিলম্বিত সময়রেখা। কার্যত ২০১০ সালের মাঝে যদি আমরা কমপিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে পারি, তবেই এই জাতির সমৃদ্ধি হবে। কিন্তু যেহেতু সরকারের মাঝে, শিক্ষাবিদদের মাঝে, রাজনীতিবিদদের মাঝে বা জনগণের মাঝে সেই সচেতনতা নেই, এই কারণে আমি সময়সীমাকে ২০২০ সালে নিয়ে গেছি।

এখন থেকে কমপিউটার শিক্ষিত নয় এমন কাউকে সব সরকারি চাকরি, পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনী ইত্যাদিতে যোগদান করতে দেয়া যাবে না। অন্ততপক্ষে এমনটি করতে হবেই যে সরকারি চাকরিতে যোগদানের আগে, বাছাই হবার পর কমপিউটার সাক্ষরতা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই পর্যায়ে অপারেটিং সিস্টেম, অফিস অ্যাপ্লিকেশন ও বেসিক ইন্টারনেট ব্যবহার করতে জানা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এখন যারা সরকারি চাকরিতে আছে তাদেরকেও দুই বছরের মাঝে কমপিউটারে দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক করতে হবে। অন্যথায় প্রমোশন স্থগিত থাকবে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। একটি ডিজিটাল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও তথ্য সংরক্ষণ ডিজিটাল করতে হবে। এজন্য সর্বোচ্চ ২০১০ সাল পর্যন্ত সময় নেয়া উচিত।

আয়কর রিটার্নসহ ব্যবসায়ের হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও লেনদেন বাধ্যতামূলকভাবে কমপিউটারকেন্দ্রিক করতে হবে। তবে কমপিউটারের নামে ক্যাশ রেজিস্টার ব্যবহারের পশ্চাদমুখী সিদ্ধান্ত বাস্বায়ন করা যাবে না। তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন খাতে আগামী ১০ বছর উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ১০ ভাগ বরাদ্দ করতে হবে। সরকারের ২-৪ লাখ টাকা বিভাগ বা মন্ত্রালয়প্রতি বরাদ্দকে উত্সাহিত করে কোনোভাবেই আমরা একটি ডিজিটাল সরকার গড়ে তুলতে পারবো না। সেজন্য উন্নয়ন বাজেটের একটি বড় অংশ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ করতে হবে।

সরকারের এই কাজগুলোই দেশে কমপিউটারাইজেশনের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং বেসরকারি খাতকে ব্যাপকভাবে এই খাতে অবদান রাখতে হবে। বেসরকারি খাত বা কমপিউটার ব্যবসায়ীদের কমপিউটার ব্যবহার করার জন্য কিছু অতি প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে।

কমপিউটার গেমস, শিক্ষামূলক সফটওয়্যার, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ের সফটওয়্যার, কৃষি ও শিল্পের জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যার ইন্টারনেটের জন্য স্থানীয় বা বাংলাভাষার কন্টেন্ট তৈরি করে জনগণের কাছে পৌঁছাতে হবে। এটি এখানে উল্লেখ করা দরকার, সফটওয়্যার শিল্প এখন থেকে দুই যুগ আগে যেমনটি ভাবতো এখনও তেমনটি ভাবছে। সফটওয়্যার শিল্প মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়নি। সরকারও এ বিষয়ে নীরব। ফলে নতুন নতুন সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে না। প্রকৃতভাবে ছোট এবং মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যার তাদের মতো করে তৈরি করা হয়নি। শিক্ষামূলক সফটওয়্যার বলতে গেলে বাজারে নেই-ই। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে এক সময় সাধারণ মানুষ এই প্রশ্ন তুলবে, কমপিউটার কিনে কি ছেলেমেয়েকে কেবল গেম খেলতে দেখাবো, না তারা ইন্টারনেটে পর্নো সাইটে প্রবেশ করবে? আমি মনে করি এই খাতে সরকারের যেমন পাঠ্যপুস্তক গুলোকে সফটওয়্যারে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করতে হবে, তেমনি বেসরকারি খাতকে অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের বাইরে নানা ধরনের সলিউশন নিয়ে হাজির হতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই খাতে আমরা তেমন কোনো অগ্রগতি সাধন করতে পারিনি। অবিলম্বে এই খাতে বেসরকারি খাত এগিয়ে আসুক এটিই সকলের প্রত্যাশা।

কমপিউটার খাতকে কমপিউটার পণ্য ও সেবার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে হবে। ক্রেতা যেন কোনোভাবেই প্রতারিত না হয় বা সে যেন তার কমপিউটার নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয় তার জন্য তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে। বেসরকারি খাত বা কমপিউটার বিক্রেতাদের পাইরেসি করে সফটওয়্যার বিতরণ করা বন্ধ করতে হবে। বলা যায়, সব ধরনের মেধাস্বত্বের পাইরেসি বন্ধ করতে হবে। অন্যদিকে কমপিউটারের নকল পণ্য বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

কমপিউটার প্রযুক্তিকে সারাদেশের মানুষের কাছে ‘তার জন্য প্রয়োজনীয়’ এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এখনও এই পণ্যটিকে বিলাস পণ্য বা বড় লোকের পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই ধারণাটিকে অমূলক প্রমাণ করার জন্য দেশব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মকান্ড চালাতে হবে।

যদি এমনটি হয়, সরকারি খাত ও বেসরকারি ব্যবসায়ীরা উভয়েই তাদের জন্য নির্ধারিত কাজ করেন তবে মাত্র দু'বছরে আমাদের কমপিউটার বাজার দ্বিগুণ হবে এবং এই ভিত্তির ওপর আমাদের একুশ শতকের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

মিয়ানমারের সাম্প্রতিক দাঙ্গা বনাম মানবতা

মিয়ানমার বর্তমান বিশ্বে মূলত বেশী পরিচিত তাদের নেত্রী অং সান সুচির জন্য। দীর্ঘ সময় ধরে সামরিক জাভা দ্বারা গৃহবন্দী থাকার পর, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাঁকে মুক্ত করা হয়। সাম্প্রতিক নির্বাচনেও তার জয় লাভ করা, ২৪ বছর পর তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ- সব মিলিয়ে ধরে নেয়া হয়েছিল যে, দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশটিতে শান্তির গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার অবসন ঘটতে চলেছে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যজনক এই যে, গত বিশ দিন ধরে এই দেশটিতে যা ঘটে চলেছে- তাকে সভ্য মানুষরা নাম দিয়েছে—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা!! আমি বলি, ধর্মকে ব্যবহার করে একটি হত্যা যজ্ঞ!!

পৃথিবীর কোন ধর্মতে কি আছে- আসুন মানুষ হত্যা করি, ঘর- ফসল জ্বালিয়ে দেই, নারী ধর্ষণ করি, শিশুকে মেরে ফেলি??!! না, কোন ধর্ম বাণীতেই হত্যার স্থান নেই, অমানবিকতার স্থান নেই। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান— কোন না কোন ভাবে সব ধর্মের মূল বাণী শান্তি, মানবতা!

অথচ গত কদিনে আমাদের পাশের এই দেশটিতে যা হচ্ছে, সোজা ভাষায় মিয়ানমারের সংখ্যাগুরুদের (বৌদ্ধ সম্প্রদায়) সাথে সংখ্যালঘুদের (মুসলমান এবং বাঙালী) উপর নির্যাতন।

যে সম্প্রদায়ের উপর এই অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন চলছে, তাদের সম্পর্কে জানতে গিয়ে নেটে চার্চ দিয়ে রীতিমতো হা হয়ে গেলাম। মিয়ানমারের পশ্চিমে রাখাইন রাজ্যের প্রায় ৮ লক্ষ্য রোহিঙ্গার বসবাস। কিন্তু তারা যেন, স্বাধীন দেশে থেকেও পরাধীন একটা জাতি। এই অত্যাচার, এই নিপীড়ন বছরের পর বছর ধরে মুখ বুঝে সহ্য করে চলেছে।

অত্যন্ত কঠোর আইন ব্যবস্থা তাদের জন্য। এমনকি তাদের গতি সীমিত করে রাখা হয়, তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ খুবই কম, স্বাস্থ্য সেবা বলে কিছু নেই! নিজ দেশেই জীবিকার জন্য অন্য কোথাও গেলে তাদের রোহিঙ্গা পরিচয় গোপন রাখতে হয়, নিজ গোত্রের বাইরে বিয়ে করা রীতিমত অপরাধ! নিজ দেশেই এরা যাযাবরের মতো থাকে! থাকার জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই, পেশা নেই, নাগরিক কোন অধিকার নেই!! ৮ লক্ষ্য রোহিঙ্গাকে ধর্মীয় ও ভাষাগত কারণে সংখ্যালঘু করে সুবিধাবঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

সূত্রপাতঃ

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ৩ জন রোহিঙ্গা মুসলিম দ্বারা একজন বৌদ্ধ নারীর ধর্ষণ ও খুন, এবং পরে এজন্য আরও ১০ জন রোহিঙ্গা পুরুষ কে হত্যার রেশ ধরেই এই দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে।

৮ জুন মুঞ্চ টাউন হলে একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু তার বক্তৃতায় রাখাইন সম্প্রদায় ও মুসলমান জাতিকে “সন্ত্রাসী” বলে আখ্যা দিলেই এই উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করে। গত কয়দিনের এই দাঙ্গায় সরকারী হিসেবে কমপক্ষে ২৫ জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন। কিন্তু বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা নাকি আরও অনেক। গৃহহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় ১ লাখ মানুষ। প্রায় ১,৬৬২ টি ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি অনেক নারীই ধর্ষিত হছেন। কোথায় ছিল তাদের প্রশাসন!?! বহিঃবিশ্বে এই দাঙ্গার খবর খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা হয়নি! যেন এতো খুব স্বাভাবিক! প্রায় দেশেই হয়!!

দাঙ্গার কিছু ছবি, আমাদের বিবেক যেখানে ঘুমায়।



মূলত রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অধিবাসী। তাই রোহিঙ্গারাও নিজেদের মিয়ানমারের নাগরিকরূপেই ভাবতে চায়, কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, মিয়ানমার সরকার এই জাতিকে এখনো নিজেদের দেশের নাগরিক স্বীকৃতি দিতে নারাজ। বিভিন্ন সময়েই তাই এরা মিয়ানমার, বাংলাদেশ, মালেশিয়া সহ সীমান্ত দেশগুলোতে যখন যেখানে সুযোগ পায় সেখানে বসবাস গড়ে তোলে!!



কি ভয়ানক কথা!!

এদের প্রায় সবাই মুসলমান, বাংলা এবং আরাকানি ভাষার সংমিশ্রণে মূলত এরা কথা বলে। আমাদের চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সাথে অনেক টাই মিলে যায়। তাছাড়া কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, টেকনাফ, এবং নাফ নদীর উপকূলে এদের অনেক বড় একটি জনপদ আছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, এই রোহিঙ্গারা আমাদের প্রতিবেশী। ভাষা, ধর্ম, জীবিকায় এদের সাথে অনেক খানি মিল রয়েছে। আমাদের উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের সাথে।

অতঃপর

প্রতিবেশী এই নিপীড়িত অসহায় মানুষ গুলোকে আমরা আমাদের সীমানায় আমরা প্রবেশ করতে দিচ্ছি না। কারণ হিসেবে আমাদের রাষ্ট্র বলছে, আমাদের জনসংখ্যা এমনিতেই অনেক বেশী, তাছাড়া এই অনুপ্রবেশকারীরা হয়তো পরবর্তীতে তাদের নিজেদের জায়গায় ফিরে নাও যেতে পারে! মিয়ানমার সরকার এদের আর ফেরত নাও নিতে পারে। এবং কূটনৈতিকভাবে বলা হচ্ছে, মিয়ানমার সরকার বা জাতিসংঘ এখনো কাগজে কলমে এই উদ্বাস্তু মানুষগুলোকে আশ্রয় দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কে অনুরোধ করেনি!!

আমি রাষ্ট্রের এসব কলা কৌশল বুঝি না। শুধু জানি শত শত মানুষ বড় আশা ভরসা নিয়ে, জীবন বাজি রেখে কেবল প্রান বাঁচানোর আশায় বাংলাদেশে ছুটে আসছে! তারা মানে এদের সাথে আমাদের ভাষায়, ধর্মের মিল আছে, অন্তত এরা আমাদের দুঃখ দুর্দশা বুঝবে। আমাদের আশ্রয় দেবে!

নৌকা, ট্রলার যে যেভাবে পারছে একটু আশ্রয়ের জন্য ভিড় করছে সেন্টমার্টিন, টেকনাফ সহ উপকূলবর্তী জায়গা গুলোতে। সরকারের কড়া নজরদারী নাকি রয়েছে, যে কোন মূল্যের এই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যস্ত “বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড” মানুষে ঠাসা এক একটা ট্রলার আসে আর আমরা তাদের “পুশআপ” করি! এদের মধ্যে একেকটা দল নাকি তিন চার দিন ধরে সমুদ্রে ভাসছে! সপ্তাহ খানেক ধরে না খেয়ে আছে। আশ্রয়প্রার্থী বেশীরভাগ মানুষই নারী, শিশু এবং বৃদ্ধ। এ কোন বিশ্ব? এ কোন মানবতা? এ কোন রাজনৈতিক কলা কৌশল আমি জানি না! মানুষ বড় নাকি ধর্ম, দেশ, নাকি রাজনীতি? ৭১ এ আমরাও তো আশ্রয়হীন ছিলাম, অন্য দেশে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে ছিলাম দিনের পর দিন। আমাদের তো এই বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা টা রয়েছে! আমরা কিভাবে এমন করে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি!!

বোধ করি দারিদ্রতার পরে ধর্মীয়, জাতিগত হাঙ্গামা, দাঙ্গা এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ! এবং বর্তমান বিশ্বে এই একটি সমস্যার সমাধান হলেই মনে হয় বাদ বাকী সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমরা কেন ভুলে যাই সবার রক্তের রং লাল, সবার চোখের পানিই বর্ণহীন। সব ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, জাতি, গোষ্ঠীতে ভালোর সাথে মন্দও আছে। একজন দুজন মানুষের পাপের জন্য পুরো একটা জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠীকে কেন ভুগতে হবে!

সুস্থ সবল, কর্মক্ষম মানুষ কিভাবে একটা দেশের বোঝা হতে পারে? তাছাড়া নজরদারি যখন রয়েছেই তখন হিসেব রেখেই তো এই অসহায় মানুষগুলোকে আশ্রয় দেয়া যেতে পারে। আমাদের দেশের সরকারসহ, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মানবিক দৃষ্টি কামনা করি। সেই সাথে মিয়ানমার সরকারকে বিশ্ব সমাজ চাপ প্রয়োগ করা হোক, এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য।

দক্ষিণ এশিয়ায় সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতা

গত ১০ ফেব্রুয়ারি সংবাদপত্রগুলোয় ছাপা হয় একটি প্রতিবেদন। এতে বলা হয়, ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়ার পর চতুর্থ স্থানটি দখল করে নেবে ভারত। ওই সময় দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যয় ৬৫ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে পৌঁছবে। ৫ ফেব্রুয়ারি অন্য এক সংবাদে বলা হয়, ভারত চীনের সীমান্তজুড়ে নতুন একটি পার্বত্য কোর গঠন করবে এবং এ বাহিনী গঠনে খরচ হবে ৬৯ হাজার কোটি রুপি। ভারতের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকায় এ খবর ছাপা হয়েছিল। আর ওই পত্রিকার সূত্র ধরে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায়ও সংবাদটি ছাপা হয়। এর আগে বাংলাদেশ রাশিয়ার কাছ থেকে যে ৮ হাজার কোটি টাকার অস্ত্র ক্রয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, তাও কোনো কোনো মহলে সমালোচিত হয়েছে। অবশ্য ভারতের ৬৯ হাজার কোটি রুপির পাশাপাশি বাংলাদেশের ৮ হাজার কোটি টাকা সমান্যই বলতে হবে। পাকিস্তানও তার অস্ত্র সম্ভার বাড়িয়েছে।

ভারত উৎক্ষেপনকৃত অগ্নি-৫ মিসাইল তবে ভারতের এ অস্ত্র ক্রয়ের সিদ্ধান্তটি দেশটিতে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। প্রথমত, ভারতে দারিদ্র্য অনেক বেশি। গেল সপ্তাহেই দারিদ্রের একটি করুণ কাহিনী সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। এক মা তার ১১ বছরের মেয়েকে মুম্বাইয়ের এক পতিতালয়ে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। মেয়েটি বুদ্ধি করে পুলিশের কাছে যাওয়ায় তা জানাজানি হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, চীন যখন ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দিচ্ছে, তখন বিপুল অর্থ ব্যয়ে একটি বাহিনী গঠনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। নিঃসন্দেহে ভারতের এ সিদ্ধান্ত শুধু চীন-ভারত সীমান্তেই উত্তেজনা ছড়াবে না, বরং তা পাকিস্তান সীমান্তেও উত্তেজনা বাড়াবে। সূক্ষ্মভাবে দেখলে দেখা যাবে, উপমহাদেশে পাক-ভারত এক ধরনের অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে। ভারত সাম্প্রতিক সময়ে অগ্নি-৫ ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে, যা পারমাণবিক অস্ত্র বহন করতে সক্ষম। ভারতের অগ্নি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালানোর পর পাকিস্তান হাতেফ গজনবি নামক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছিল। অগ্নির মতো হাতেফও পারমাণবিক বোমা বহনযোগ্য। অগ্নির পর ভারত নতুন ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ ও পাকিস্তান হাতেফ-৯ নামে আরো দুই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে দেশ দুটো এক ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এতে দেশ দুটোর দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি ব্যাহত হতে বাধ্য।

এর কি আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল? প্রশ্ন হচ্ছে, বিশাল এক জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রতার মধ্যে রেখে দুই দেশের এ ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি কার বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে? পাঠকদের একটা ধারণা দিয়ে রাখি। একটা দূরপাল্লার (যেমন অগ্নি-৫) মিসাইলের দাম ৫ লাখ ৬৯ হাজার থেকে ৬ লাখ ডলার। অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৫ কোটি টাকা। একটি ব্রুজ মিসাইলের (সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপযোগ্য) দাম ১ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকা) আর বিমান থেকে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের (যা ভারত এরই মধ্যে অর্জন করেছে) ৬ লাখ ডলার। এ অর্থ সামরিক খাতে ব্যয় না করে তা হাসপাতাল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজে ব্যবহার করা যেত। এমনকি ভারতে চরম দরিদ্রতম রাজ্য হিসেবে পরিচিত (দারিদ্র্যের কারণে যেখানে মাওবাদীদের তত্পরতা বেশি) মধ্য প্রদেশে, উত্তর প্রদেশ কিংবা ঝাড়খণ্ডে ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্প চালু করতে পারত। ভারত তা করেনি। মুম্বাইয়ের চাকচিক্যময় ছবি দেখে ভারতের সব মানুষের জীবনযাত্রার মান বিচার করা যাবে না। ভারতে ১ লাখ ৮৩ হাজার কৃষক ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে গত ১০ বছরে আত্মহত্যা করেছে— এ রকম একটি সংবাদ সম্প্রতি পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। পাকিস্তান থেকে এ ধরনের সংবাদ তেমন একটা শোনা যায় না। এ কারণেই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক অমর্ত্য সেন বলেছিলেন এমডিজি (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস) অর্জনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ভারতের চেয়ে ভালো।

সাম্প্রতিক সময়ে ভারত প্রতিরক্ষা খাতে যথেষ্ট ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছে। সিপিরি (SIPRI) বার্ষিক গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত ২০১৫ সালের মধ্যে প্রতিরক্ষা খাতে ৮০ বিলিয়ন ডলার খরচ করবে। জিডিপিতে প্রতিরক্ষা খাতে প্রবৃদ্ধির হার আড়াই থেকে ৩ শতাংশ। ২০০০ সালের পর প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে ৬৪ শতাংশ। এ সময়সীমায় ভারতে যে অস্ত্রসস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে, তার মধ্যে রাশিয়া একাই সরবরাহ করেছে ৮২ শতাংশ। অনেকেরই স্মরণ থাকার কথা, ভারত এরই মধ্যে তার নৌবহরে পারমাণবিক শক্তিচালিত বিমানবাহী জাহাজ অন্তর্ভুক্ত করেছে। ভারত মহাসাগরে অন্যতম নৌশক্তিরূপে আবির্ভূত হতে চায় দেশটি। ফরেন পলিসি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চীনের নৌবাহিনীতে যেখানে জাহাজের সংখ্যা ১৩৫, সেখানে ভারতের জাহাজ রয়েছে ১০৩টি। অর্থাৎ প্রায় কাছাকাছি। ভারতের উদ্দেশ্য যে কী, তা সহজেই অনুমেয়। পাঠক, স্মরণ করার চেষ্টা করুন, প্রেসিডেন্ট ওবামার ভারত সফরের সময় যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র কেনার জন্য চুক্তি করেছিল। চুক্তি অনুযায়ী ১১ বিলিয়ন ডলার দামে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ১২৬টি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান সরবরাহ করবে। যেখানে জনগোষ্ঠীর অর্ধেক মানুষ ন্যূনতম টয়লেট সুবিধা পায় না, ৩১ শতাংশ জনগোষ্ঠীর দৈনিক আয় ১ দশমিক ২৫ সেন্টের নিচে (যা কিনা জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত অতিদরিদ্রের মানদণ্ড), সেখানে শত শত কোটি রুপি ভারত ব্যয় করছে অস্ত্র খাতে। এরই মধ্যে প্রমাণ হয়েছে যে, অগ্নি-৫ উৎক্ষেপণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। যুক্তরাষ্ট্র চায়, ভারত এ অঞ্চলে অন্যতম পারমাণবিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হোক। সুদূরপ্রসারী এক মহাপরিকল্পনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করেছে। তার ট্যাগটি মূলত চীন, চীনকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা। এ লক্ষ্যেই দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অক্ষ গড়ে উঠছে। ভারত এখন আর পাকিস্তানকে অন্যতম শত্রু বলে মনে করে না। ভারতের অন্যতম শত্রু এখন চীন। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের স্বার্থ এখানে এক ও অভিন্ন।

সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। গেল বছর বাংলাদেশ ঘুরেও গেছেন সাবেক মার্কিন ফার্ম লেডি আর সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন। হিলারি ক্লিনটনের বুড়িতে যে নিরাপত্তার বিষয়টি ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় যে মার্কিন কৌশল অর্থাৎ ভারত-যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক ও সামরিক বলয়, সে বলয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। ভারতকে দিয়ে পারমাণবিক বোমা বহনযোগ্য অগ্নি-৫ ও আকাশ উৎক্ষেপণ এ কৌশলেরই একটি অংশ। ভারতকে চীনের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো কিংবা ভারতকে ৩০ বছরের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনীতিতে পরিণত করার উদ্যোগ কতটুকু সফল হবে বলতে পারব না, কিন্তু যে দেশ তার দারিদ্র্য দূরীকরণে কোনো বড় কর্মসূচি নিতে পারে না কিংবা কৃষকের আত্মহত্যা রোধ করার উদ্যোগ নিতে পারে না বা অগ্নি-৫ মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করে তারা আমাদের জন্য কোনো ‘মডেল’ হতে পারে না। আগামী দিনে ভারতে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যেমন বাড়বে, তেমনি বাড়বে কন্যাশিশুর ভ্রূণ হত্যার প্রবণতা; একটি সভ্য সমাজে যা কল্পনাও করা যায় না। অগ্নি-৫ উৎক্ষেপণ ছিল একটি প্রহসন। আর পাকিস্তানের পরিস্থিতি যে ভারতের চেয়ে ভালো, তা বলা যাবে না। পাকিস্তান বাহ্যত আরেকটি ‘তালেবান রাষ্ট্র’ পরিণত হতে যাচ্ছে। একুশ শতকে এসেও দেশটির কোনো কোনো প্রদেশে মেয়েদের শিক্ষা সীমিত। তালেবান জঙ্গিরা মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে— এ রকম সংবাদ আমরা একাধিকবার পাঠ করেছি। পাকিস্তানের মতো দেশে যেখানে তারা জঙ্গি তত্পরতা দমন করতে পারছে না, সেখানে শাহীন (১ হাজার ৮০০ মাইল দূরপাল্লা) কিংবা হাতেফ গজনবির (১৮০ মাইল দূরে আঘাত হানার ক্ষমতাসম্পন্ন) মতো মিসাইল উদ্ভাবন করে পাকিস্তান পারমাণবিক প্রতিযোগিতাকে উসকে দিল। পাকিস্তান বা ভারতের এ থেকে লাভবান হওয়ার কিছু নেই। এতে দুই দেশের দারিদ্র্য আরো বাড়বে। আর লাভবান হবে যুক্তরাষ্ট্র। অস্ত্র ব্যবসায় তাদের প্রসার ঘটবে। এরই মধ্যে খবর বেরিয়েছে, ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬৬ কোটি ডলার ব্যয়ে ১৪৫টি হালকা কামান আমদানি করেছে। একসময় তথাকথিত ‘নিরাপত্তা সুরক্ষা’র নাম করে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে ১০০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে সাহায্য করেছিল (বিবিসি, ডিসেম্বর ১৬, ২০১০)। এখানে বলা ভালো, ভারত ও পাকিস্তান এনপিটি চুক্তিতে সই করেনি। পারমাণবিক অস্ত্র সীমিতকরণে উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ভারতের ক্ষেত্রে তার নীতির যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। উপমহাদেশে আগামী দিনগুলোয় এ প্রতিযোগিতা বাড়বে বলেই মনে হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় এ পারমাণবিক প্রতিযোগিতায় অন্য দেশগুলোও আক্রান্ত হতে পারে। প্রভাববলয় বিস্তারের রাজনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো দুই ব্লকে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে। এতে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হতে বাধ্য। বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮১ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৫৪৯ মিলিয়ন (প্রতিদিনের আয় ১ ডলার ২৫ সেন্ট হিসেবে)। ২০০৫ সালে তা দাঁড়ায় ৫৯৫ মিলিয়ন। বর্তমান হিসাব অনুযায়ী এ সংখ্যা ৬৫০ মিলিয়নের কাছাকাছি। পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে, ২৫০ মিলিয়ন শিশু অপুষ্টির শিকার। ৩০ মিলিয়ন শিশু কোনো দিন স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পায় না। মোট নারী জনগোষ্ঠীর তিন ভাগের এক ভাগ রক্তশূন্যতায় ভোগে। ভারতে প্রতি তিনজনের একজন দরিদ্র। ১২১ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারতে অর্ধেক জনগোষ্ঠীর জন্য টয়লেট সুবিধা নেই। প্রতিদিন ভারতে মারা যায় পাঁচ হাজার শিশু। এ পরিসংখ্যান কোনো আশার কথা বলে না। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে দারিদ্র্য কমেনি। অথচ দুটি বড় দেশ ভারত ও পাকিস্তান আজ কোটি কোটি ডলার খরচ করছে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবনে। দক্ষিণ এশিয়ার এ মুহূর্তে সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য দূর করা, জাতিগত দ্বন্দ্বের অবসান, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং সেই সঙ্গে জেন্ডার সমতা আনা। ব্যাপক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করাও জরুরি। দক্ষিণ এশিয়ার নেতারা এদিকে দৃষ্টি দিলে ভালো করবেন।

লেখক: অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১০ তিউনিসিয়ার এক বেকার কম্পিউটার গ্র্যাডুয়েট মোহাম্মদ বওকুজিজি নিজের শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে যে 'বিপ্লবের' সূচনা করেছিলেন, তার সফল সমাপ্তি ঘটেছে ২৩ অক্টোবর ২০১১ একটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। এই নির্বাচন গণতান্ত্রিক তিউনিসিয়া পুনর্গঠনে একটি বড় ভূমিকা রাখবে। এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তিউনিসিয়ায় একটি জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে, যারা দেশটির জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে। একই সঙ্গে জাতীয় পরিষদ দেশটির জন্য একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেবে। সংবিধান রচিত হওয়ার পর আগামী বছর সেখানে আবার নির্বাচন হবে। গত বছর যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তিউনিসিয়ায়, তা আরব বিশ্বে এক গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিল, যাকে বলা হচ্ছে 'আরব বসন্ত', অনেকটা সাবেক চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগে সংঘটিত হওয়া 'প্রাগ বসন্ত'-এর সঙ্গে যার তুলনা করা যায়। ১৯৬৮ সালের 'প্রাগ বসন্ত' ছিল সাবেক সোভিয়েত আধিপত্যের বিরুদ্ধে এক বড় প্রতিবাদ। আর 'আরব বসন্ত' অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এক প্রতিবাদ। পার্থক্য হচ্ছে এক জায়গায় 'প্রাগ বসন্ত' সফল হয়নি। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক সমাজে পরিবর্তন আসেনি। এসেছিল অনেক পরে, ১৯৮৯ সালে। কিন্তু 'আরব বসন্ত' পরিবর্তন আনছে। ইতিমধ্যে তিউনিসিয়ায় বেন আলী ২৩ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান হয়েছে। মিসরে ৩০ বছরের একদলীয় শাসনের অবসান হয়েছে। হোসনি মুবারক এখন ইতিহাসের অংশ, দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর এখন বিচার হচ্ছে। কিন্তু লিবিয়ায় পরিবর্তনটা এসেছে ভিন্নভাবে। সেখানে তিউনিসিয়া কিংবা মিসরের মতো গণ-অভ্যুত্থান হয়নি। বিদেশি শক্তির সামরিক হস্তক্ষেপ গাদ্দাফিকে ক্ষমতাসীন করেছো। গাদ্দাফি নিজের জীবন দিয়ে বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ করে গেলেন। ইয়েমেন আর সিরিয়ায়ও 'আরব বসন্ত'-এর ঢেউ লেগেছে। ইয়েমেনে আলী আবদুল্লাহ সালেহ আর সিরিয়ায় বাশার আল আসাদের পতন এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু যে বিষয়টি বড় বেশি করে আলোচিত হচ্ছে, তা হচ্ছে 'আরব বসন্ত' কী ধরনের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে পুরো আরব বিশ্বে? কোন শক্তি এখানে ক্ষমতাসীন হচ্ছে? এসব দেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকাই বা কী? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এখন এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। বলতে দ্বিধা নেই, পুরো আরব বিশ্বে যে ধরনের সমাজব্যবস্থা চালু ছিল, তাকে কোনো মতেই গণতন্ত্রসম্মত বলা যাবে না। তিউনিসিয়ায় ব্যক্তি বেন আলী ও তাঁর পরিবার ক্ষমতা পরিচালনা করতেন। Democratic Constitutional Rally নামক একটি রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যানারে বেন আলী ২৩ বছর ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। মিসরেও একই ধারা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

অতিসম্প্রতি তিউনিসিয়ার নির্বাচনের পর সেখানে নতুন এক রাজনৈতিক ধারার জন্ম হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কেননা নির্বাচনে ইসলামপন্থী হিসেবে পরিচিত দল এনানহদার বিজয় নতুন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিতে যাচ্ছে তিউনিসিয়ায়। ১৯৫৬ সালে দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৮৭ সাল থেকে বেন আলী ছিলেন ক্ষমতায়। মধ্য ষাটের দশকে এনানহদা নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর চলতি বছরের মার্চ মাসে দলটির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। দলটির শীর্ষ নেতা রশিদ আল ঘানুচি দীর্ঘদিন ছিলেন লন্ডনে। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার পরই তিনি তিউনিসিয়ায় ফিরে আসেন। এনানহদা কটরপন্থী কোনো ইসলামিক দল নয়। একসময় দলটি মিসরের নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক ব্রাদারহুডের রাজনীতি অনুসরণ করত। ১৯৮১ সালে দলটির জন্ম হয়েছিল। তখন দলটির নাম ছিল Islamic Tendency Movement। পরে ১৯৮৯ সালে এনানহদা বা Awakening Movement নাম ধারণ করে। দলটি ইসলাম আর গণতন্ত্রের সমন্বয়ে নতুন একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। দলটির সঙ্গে তুরস্কের Justice and Development Party'-র অনেক মিল রয়েছে। এনানহদার নেতারা এটা স্বীকারও করেন। তাঁরা তিউনিসিয়ায় একটি 'তুরস্ক মডেল' অনুসরণ করতে চান। ঘানুচি নিজেই বলেছেন, 'In Turkey and Tunisia there was the same movement of reconciliation between Islam & modernity and we are the descendants of this movement'। ঘানুচির বক্তব্যের মধ্য থেকে এটা বোঝা যায়, এনানহদা আধুনিকতার বিরোধী নয়। এমনকি এবার নির্বাচনে এমন অনেক মহিলা এই দল থেকে নির্বাচিত হয়েছেন, যাঁরা হিজাব পরেন না এবং পর্দাও করেন না। এনানহদা বহুদলীয় গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সুশাসনে বিশ্বাসী। তিউনিসিয়ায় ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত হয়েছিল Personal Status Code, যেখানে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে সমতা আনা হয়েছিল। সেখানে পুরুষদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা সমঅধিকার ভোগ করেন। এনানহদা এই Personal Status Code-এর বিরোধী নয়। ঘানুচির মতে, এই Personal Status Code হচ্ছে 'as an acceptable interpretation of Islam'। ঘানুচির এই অভিমত যেকোনো ইসলামী মৌলবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁকে পার্থক্য করবে। মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষ করে পারস্য অঞ্চলে নারীদের অধিকার সীমিত। বহুবিবাহ সেখানে স্বীকৃত, আর নারীরা পুরুষের মতো সমঅধিকার ভোগ করেন না। তিউনিসিয়ায় এ থেকে পার্থক্য ছিল। এখন ইসলামপন্থী হিসেবে পরিচিত এনানহদাও সমঅধিকারের পক্ষে। তিউনিসিয়ায় নারীদের চাকরি করার ব্যাপারে কোনো বাধানিষেধ নেই। তারা স্বামীর অনুমতি না নিয়েই নিজেরা ব্যবসা করতে পারেন, ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। হিজাব পরার ব্যাপারেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যা যেকোনো আরব বিশ্বে অকল্পনীয়। তিউনিসিয়ায় রাজনীতি ও স্থানীয় সরকারে নারীদের প্রতিনিধিত্বের হার ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ, যার সঙ্গে নরডিকভুক্ত দেশগুলোর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সমাজে নারীদের এই অবস্থান অন্য কোনো আরব বিশ্বে দেখা যায় না। এমন একটি দেশে ইসলামপন্থী একটি দলের নির্বাচনে বিজয় সংগত কারণেই নানা প্রশ্নের জন্ম দেবে। ঘানুচি হতে যাচ্ছেন তিউনিসিয়ার পরবর্তী নেতা। তাঁকে একজন সমাজবিজ্ঞানী চিহ্নিত করেছেন এভাবে—'modernist', but with deep roots in its Arab-Islami identity'। এটাই হচ্ছে আসল কথা। ঘানুচি কটর নন, আধুনিকমনস্ক এক মানুষ, যিনি এরাবিয়ান ও ইসলামিক ঐতিহ্য ধারণ করেন। তিনি আধুনিক গণতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে 'বিপ্লব'-পরবর্তী তিউনিসিয়ায় নতুন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপহার দিতে চান। সম্ভবত তিনি হতে যাচ্ছেন 'তিউনিসিয়ার 'এরদোগান'। তুরস্কের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী এরদোগান তাঁর আদর্শ। তুরস্কের মডেল তিনি অনুসরণ করতে চান তিউনিসিয়ায়। তবে তিউনিসিয়ার পটপরিবর্তন মিসরের নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে কতটুকু প্রভাব ফেলবে, সেটা একটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু মিসরের প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্নতর। সেখানে 'ইসলামিক ব্রাদারহুড' একটি শক্তিশালী ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। সমাজের সর্বত্র এদের সমর্থকগোষ্ঠী রয়েছে। দলটি নিষিদ্ধ থাকলেও ভিন্ন সংগঠনের নামে এর কর্মীরা সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসছিলেন। এখন পরিবর্তিত

পরিস্থিতিতে এরা একটি শক্তি। মুবারকবিরোধী আন্দোলনেও এরা অংশ নিয়েছিল। ২৮ নভেম্বর ২০১১ সেখানে সংসদ নির্বাচন। ওই নির্বাচনে এনাহদার মতো 'ইসলামিক ব্রাদারহুড' যে ভালো ফল করবে, তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না।

তবে মিসরের সমস্যাটা অন্যত্র। ১১ ফেব্রুয়ারি (১১) হোসনি মুবারকের পদত্যাগের পর ফিল্ড মার্শাল হোসেন তানতাবির নেতৃত্বে ২৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি সামরিক জাস্তা সেখানে ক্ষমতা পরিচালনা করে আসছে। এখন শোনা যাচ্ছে, তানতাবি নিজেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আগামী বছরের শেষের দিকে অথবা ২০১৩ সালের প্রথমদিকে সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সামরিক জাস্তাও চাচ্ছে নয়া সংবিধানে তাদের একটা সাংবিধানিক স্বীকৃতি। এখন তানতাবির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিসরের বিশ্বাসকে একটা প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিতে পারে। আরব বিশ্বে একটা পরিবর্তন আসছে। গত ৬০ বছরের আরব বিশ্বের রাজনীতিতে তিনটি ধারা লক্ষণীয়। ১৯৫২ সালে জামাল আবদুল নাসেরের মিসরের ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল প্রথম ধারা। তিনি আরব জাতীয়তাবাদী রাজনীতির জন্ম দিয়ে আরব বিশ্বের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ধারার সূচনা হয়েছিল ১৯৬৭ সালে, যখন আরব বিশ্বের কয়েকটি দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে আরব বিশ্বে ইসরায়েলি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৃতীয় ধারার সূচনা হয়েছিল ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামিক বিপ্লবের পর। ইরানি বিপ্লব ইরানকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। এই বিপ্লব ওই সময় আরব বিশ্বে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। এখন 'আরব বসন্ত' চতুর্থ একটি ধারার সূচনা করল। 'তিউনিসিয়ায় 'জেসমিন বিপ্লব' একটি পরিবর্তনের সূচনা করল। ইসলামপন্থী কিন্তু আধুনিকমনস্ক একটা নয়া নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে আরব বিশ্বে। এনাহদার বিজয় এ কথাই প্রমাণ করল। দৈনিক কালের কণ্ঠ। ২০ নভেম্বর ২০১১। ড. তারেক শামসুর রেহমান অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং কিছু কথা

সারা বিশ্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে যুদ্ধের ১০ বছর পার করল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারে বিমান বিধ্বস্ত করে ভবন দুটি ধ্বংস করার পর যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, ১০ বছর পার করার পর সেই যুদ্ধের অবসান হয়েছে—তা বোধ হয় বলা যাবে না। কেননা ওবামা প্রশাসন আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিলেও সেখানে যুদ্ধ চলছে। ইরাকে মার্কিন সেনা নেই বটে। কিন্তু আত্মঘাতী বোমা সংস্কৃতির সেখানে জন্ম হয়েছে। আর লিবিয়ায় গাদ্দাফির পতন সেখানে দীর্ঘস্থায়ী এক গৃহযুদ্ধের আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। ২০০১ সালে টুইন টাওয়ারে হামলার পাশাপাশি আরেকটি বিমান হামলা হয়েছিল ভার্জিনিয়ায় পেন্টাগনের সদর দপ্তরে। চতুর্থ বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল পেনসিলভানিয়ায়। আল-কায়েদা নামে একটি সংগঠন এই হামলার দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছিল। এরপর জানা গেল আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনের নাম। গত ১০ বছর যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী আল-কায়েদার বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ' পরিচালনা করেছে। গত ১ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদ শহরের একটি বাড়িতে অবস্থান নেওয়া বিন লাদেনকে হত্যার মধ্য দিয়ে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'র একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটেছে বটে। কিন্তু 'যুদ্ধ' এখনো শেষ হয়নি। এমনকি ওবামা নিজেও এই যুদ্ধের সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেননি।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কী পেল? ১০ বছরের হিসাব-নিকাশ যদি মেলানো যায় তাহলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোষ্ঠী এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাভবান হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি। ডেভিড ডি গ্র (David de Graw) Global Research-এ লিখিত একটি প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, এই যুদ্ধের মোট খরচ গিয়ে দাঁড়াবে ছয় ট্রিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪৪৪ কোটি লাখ টাকার সমান)। চিন্তা করা যায়, কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। সাধারণ করদাতারা এই অর্থ পরিশোধ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় এই যুদ্ধের খরচের একটি হিসাব দিয়েছে। তাদের ভাষায়, এই খরচ ৩ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন ন্যানসি এ ইউসুফ (Nancy A. Youssef) তাঁর এক প্রবন্ধে The True Cost of Afgan Iraq War is Anyone's Guess (Me Clatchy-এর প্রতিবেদন, ১৫ আগস্ট ২০১১)। অথচ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, প্রতি ছয়জন মার্কিনের মধ্যে একজন দরিদ্র। পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটি শিশু দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। কৃষকদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ দরিদ্র। এশীয়দের মধ্যে দারিদ্রের হার ১২.১ শতাংশ। তাদের চাকরি নেই। বুশ তথা ওবামা প্রশাসন তাদের জন্য ওই অর্থের একটি অংশ দিয়ে চাকরির ব্যবস্থা করতে পারত। সামাজিক খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে পারত। তা তারা করেনি। অথচ 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' নিয়েও নানা কথা আছে। কারা শুরু করল, কেন করল—অনেক প্রশ্নেরই কোনো জবাব নেই। দীর্ঘ ১০ বছর পরও একটি নয়, দুটি নয়—চার-চারটি বিমান ছিনতাই হলো। গোয়েন্দারা টের পেল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে টুইন টাওয়ারে দুটি বিমান বিধ্বস্ত হলো। দেখা গেল, ভবন দুটি ধসে পড়েছে, অথবা গলে গেছে। কোনো ধরনের বিস্ফোরক ছাড়া কি এত উঁচু ভবন একসঙ্গে ধসে নিচে পড়ে যেতে পারে? তাহলে কি কোনো শক্তি এমন কোনো বিস্ফোরক ব্যবহার করেছিল, যাতে করে পুরো ভবন ধসে পড়ে? কোনো বিমান যদি বিধ্বস্ত হয়, তাহলে বড়জোর ওই ভবনের কয়েকটি তলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, পুরো ভবনটি ধসে পড়ার কথা নয়। শুধু দুটি ভবনই ধসে পড়ল, পাশের ভবনগুলো দাঁড়িয়ে থাকল, একটুও ক্ষতি হলো না কিংবা কাত হয়ে পড়ল না—এটা কি সম্ভব? ওই দুটি ভবন বেছে নেওয়ার কারণই বা কী? আশপাশে তো আরো অনেক ভবন ছিল। এটা করা হয়েছিল কী এ কারণে যে ভবন দুটি ছিল বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদর দপ্তর। এখানে যেকোনো হামলা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবে। পেন্টাগনে যে বিমানটি বিধ্বস্ত হলো, ওই বিমানের যাত্রীদের কোনো ছিন্নভিন্ন দেহ পাওয়া যায়নি। সাধারণত বিমান বিধ্বস্ত হলে মৃতদেহ পাওয়া যায়—এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে পাওয়া গেল না কেন? এমনকি বিধ্বস্ত বিমানের কোনো ছবিও দেখা যায়নি। পেনসিলভানিয়ার এক মাঠে চতুর্থ যে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণও আমরা পাইনি কোনো দিন। ওই বিমানে কতজন যাত্রী ছিল, কয়টি

মৃতদেহ পাওয়া গেছে—এসব কোনো তথ্যই কারো কাছে নেই। পাঠক লক্ষ করুন, কোনো বিমান যদি বিধ্বস্ত হয়, তাহলে প্রথমেই খোঁজ পড়ে ব্লাক বক্সে, যেখানে সর্বশেষ কথোপকথন রেকর্ড হয়ে থাকে। যতদূর মনে পড়ে, বিধ্বস্ত চারটি বিমানের একটিরও 'ব্লাক বক্স' উদ্ধার করা কিংবা পাওয়া যায়নি। এটা কি ইচ্ছাকৃত? নাকি কোনো তথ্য গোপন করার উদ্দেশ্যেই এটি করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক টুইন টাওয়ারে হামলায় তিন হাজার ব্যক্তি প্রাণ হারালেও (বাংলাদেশি পাঁচজনসহ) একজন ইহুদিও মারা যায়নি। এটা কি কাকতালীয়, নাকি অন্য কিছু? অভিযোগ আছে, বিমান হামলার পাঁচ মিনিট আগে সব ইহুদি এই ভবন ত্যাগ করে। এসব প্রশ্নের কোনো জবাব গত ১০ বছরে আমরা পাইনি। কিন্তু ওই হামলার পর বিশ্বকে বদলে যেতে দেখেছি আমরা। আফগানিস্তান দখল করে নিয়েছিল মার্কিন বাহিনী ২০০১ সালে। সেই দখলীস্বত্ব আজও বজায় রয়েছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলা হলেও, মার্কিন সেনাবাহিনী সেখানে থাকবে। কেননা মধ্যএশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের (গ্যাস ও তেল) ব্যাপারে আগ্রহ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। আফগানিস্তান থেকে সেই সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের। বেলুচিস্তানের মরুভূমিতে রয়েছে একটি বিমান ঘাঁটি, যা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করছে। বেলুচিস্তানের সীমান্তে রয়েছে ইরানের একটি প্রদেশ 'সিস্তান বেলুচিস্তান'। আরব সাগর ঘেঁষা গাওদারে চীনারা তৈরি করছে গভীর সমুদ্রবন্দর। যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বেলুচিস্তানের গুরুত্ব অনেক বেশি।

আফগানিস্তানের পাশাপাশি ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র দখল করে নিয়েছিল ইরাক। অত্যাধুনিক মারগাস্ত্র (ডগউ) রয়েছে—এই অভিযোগ তুলে দেশটি দখল করে নিয়েছিল। ২০১০ সালে এসে সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে সত্য (৫০ হাজার সৈন্য রয়ে গেছে প্রশিক্ষণের জন্য)। কিন্তু ইরাকি সম্পদ (তেল) চলে গেছে মার্কিন কম্পানিগুলোর হাতে। ইরাকি তেলের পয়সায় এখন মার্কিন কম্পানিগুলো বিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত। ২০১০ সালে এসে সারা আরব বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে এক ধরনের গণ-আন্দোলন, যাকে বলা হচ্ছে 'আরব বসন্ত'। এই আরব বসন্ত কার জন্য, কিসের জন্য—এটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা শাসকরা (বেন আলী, হোসনি মুবারক, আলী আবদুল্লাহ সালেহ) উৎখাত হয়েছেন বটে। কিন্তু ক্ষমতা সাধারণ মানুষের কাছে ফিরে আসেনি। সর্বশেষ গাদ্দাফিরও পতন হয়েছে। লিবিয়াকে বলা হয় উত্তর আফ্রিকায় যাওয়ার দরজা বা ষ্ঠেঃবধি। লিবিয়া যদি নিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহলে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর (নাইজার, সাদ, গিনি বিসাঁউ) দেশগুলোকেও নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। আফ্রিকায় ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে AFRICOM আফ্রিকান কমান্ড। বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করার যে মানসিকতা, তা সামনে রেখেই পতন ঘটানো হলো গাদ্দাফি সরকারের।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'যুদ্ধ' শুরু করেছিল বুশ প্রশাসন। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়ে ওবামা সেই যুদ্ধ বন্ধ করেননি। মার্কিন সমরাস্ত্র কারখানাগুলোতে উৎপাদন বেড়েছে। বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষ করে আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইরাক—সর্বত্রই আমেরিকার কম্পানিগুলোর রমরমা ব্যবসা। নাইন-ইলেভেন এই ব্যবসার একটি ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ফিনিয়ান কানিংহামের প্রবন্ধ '9/11 paved the way for America's permanent war of Aggression'-এ এ কথাই বলা আছে। আর মিসেল চসডোভস্কি তো স্পষ্ট করে বলেছেন, 'alleged Jihadi plotters were the product of us state terrorism.' ... অনলাইনে চমস্কির বই ৯/১১ : was there an alternative (seven stories press) কেউ পড়ে দেখতে পারেন। তাই 'নাইন ইলেভেন' নিয়ে যে অসংখ্য প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা, ১০ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও আমরা এর পূর্ণ জবাব খুঁজে পেলাম না। ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যু হয়েছে সত্য, কিন্তু আল-কায়েদা ধ্বংস হয়ে যায়নি। তারা তাদের স্ট্র্যাটেজিতে পরিবর্তন এনেছে। অঞ্চল ভিত্তিতে আল-কায়েদা এখন সংগঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে। যেমন-সৌদি আরবভিত্তিক Al-Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP), রিয়াদে ২০০৩ সালে হামলার জন্য যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছে। ২০০৪ সালে ইরাকে সংগঠিত হয়েছে AQI বা Al-Qaeda in Iraq। ২০০৭-এ জন্ম হয়েছে Al-Qaeda in Islamic Magreb (AQIM)। ছোট ছোট সেল-এ বিভক্ত হয়ে তারা এখন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, যাকে বলা হচ্ছে 'Spider Web'। মাকডসার জালের মতো সংগঠিত হচ্ছে, আবার তারা ধ্বংসও হচ্ছে। এরপর অন্য এক জায়গায় গিয়ে তারা সন্ত্রাসের জাল বুনছে, মাকডসারা যেমনটি করে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে একরকম যোগাযোগ ছাড়াই এই জিহাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনার তত্ত্ব দিয়েছেন আল-কায়েদার একজন তাত্ত্বিক আবু মুসা বিন আল সুরি (The Global Islamic Resistance)। নোয়াম চমস্কি তাই লিখেছেন, The Jihadi movement could have been split and undermined after 9/11 if the 'crime against humanity' had been approached as a crime (was war only answer to 9/11? nation of change, 5 september, 2011)। এটাই হচ্ছে মোদ্রাকথা। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ডকে সত্যিকার অর্থেই মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ব্যবহার করা হয়েছে গোষ্ঠীস্বার্থে তথা ব্যবসায়িক স্বার্থে। ইরাক তার বড় প্রমাণ। ইরাকের তেলের পয়সায় এখন সেখানে পুনর্গঠনের কাজ চলছে। আর এককভাবে কাজ পেয়েছে মার্কিন কম্পানিগুলো। একই ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এখন লিবিয়ায়। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' একটি জনগোষ্ঠীকে টাঙেটি করে করা হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিভিন্ন চোখে দেখা হতো। এখন পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হয়েছে, এটা সত্য। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 'নাইন-ইলেভেন'-এর আগের অবস্থায় আর ফিরে যায়নি। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' একটি কালো অধ্যায়ে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে চলা এই 'যুদ্ধ' প্রকারান্তরে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব করার প্রয়াসেই রচিত। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করা যায়নি। বরং তা আরো বেড়েছে। সারা বিশ্ব যখন টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী হামলার দশম বর্ষ পালন করছে, তখন কাবুলের কূটনীতিকপাড়ায় তালেবানদের হামলা (১৩ সেপ্টেম্বর) এ কথাই প্রমাণ করল আবার।

চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে কিছু কথা

চলতি জুলাই মাসে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক তথা চীনের রাজনীতি আবারও আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় আলোচনায় এসেছে। চীন যখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালন করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফের চেয়ারম্যান এডমিরাল মুলেন চীন সফর করেছেন। এডমিরাল মুলেনের ওই সফর ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ওই সফরে এডমিরাল মুলেন চীনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল চ্যান পিংদের সাথে বৈঠক, হাসিমুখে ফটোসেশনে অংশ নিয়েছেন বটে, কিন্তু স্পষ্টতই যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মাঝে বিভিন্ন ইস্যুতে দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। এডমিরাল মুলেন এমন এক সময় চীনে গেলেন যখন দক্ষিণ চীন সফরে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়া নিয়ে বেইজিং ও ওয়াশিংটন বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। ফিলিপাইন ও ভিয়েতনামের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি একটি সামরিক মহড়ায় অংশ নেয়, যা কীনা চীন ভালো চোখে দেখেনি এবং চীন এই যৌথ মহড়াকে ‘চূড়ান্ত অসংগত’ বলে মনে করছে। মুলেনের সফরের সময় জেনারেল পিংদের একটি মন্তব্যও এডমিরাল মুলেনকে একটি বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। জেনারেল পিংদে বলেছিলেন, সামরিক খাতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় কমানো উচিত। তিনি একথাও বলেন যে, ব্যয় কমিয়ে সেই অর্থ দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ব্যয় করা উচিত। দক্ষিণ চীন সফরে তেল ও গ্যাসসমৃদ্ধ কিছু এলাকা রয়েছে, যা একই সাথে চীন, ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনও দাবি করছে। সুতরাং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ চীন খুব ভালো চোখে দেখেনি। ২০০৭ সালের পর এই প্রথম কোন উর্ধ্বতন মার্কিন সেনা কর্মকর্তা বেইজিং সফর করলেন। কিন্তু সফর সফল হয়নি। তবে এডমিরাল মুলেন বেইজিং-এ স্বীকার করেছেন চীন এখন বিশ্বশক্তি। এটাই হচ্ছে মোদ্যাকথা। চীন এখন বিশ্ব রাজনীতি তথা অর্থনীতিতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। আর চীনকে এ পর্যায়ে উন্নীত করতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। যেখানে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সফল হয়েছে। বলা ভালো চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল ১৯২১ সালের ১ জুলাই, চীনের সাংহাই শহরে। যুগের পরিক্রমায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতেও পরিবর্তন এসেছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এখন আর ধ্রুপদী মার্কসবাদ অনুসরণ করে না। চীন এখনও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহুদলীয় রাজনীতি শুরু করেনি। অর্থনীতিতে পরিবর্তন আসলেও, কমিউনিস্ট পার্টির একক কর্তৃত্ব চীনা সমাজে এখনও বহাল রয়েছে। এ জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মত চীন ভেঙ্গে যায়নি। এখনও টিকে আছে। কিন্তু টিকে থাকতে পারেনি সোভিয়েত ইউনিয়ন। দুটি বড় দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মাঝে পার্থক্য এখানেই। তাই চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে যে আগ্রহ থাকবে, এটা বলাই বাহুল্য। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি যেমনি একদিন (১৯৩৪) লং মার্চের নেতৃত্ব দিয়ে বিপ্লবকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি আজও স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থায় ‘নয়া চীন’কে নেতৃত্ব দিচ্ছে। প্রায় ৮ হাজার মাইলব্যাপী ওই লং মার্চে অংশ নিয়েছিল প্রায় ১ লক্ষ মানুষ। বিশ্ব ইতিহাসে সেটা ছিল এক বিরল ঘটনা। উচিয়াং, চিনশা, তাতু নদীর মতো প্রাকৃতিক বাঁধা, কিংবা জনমানবহীন লাজি বিশাল জলাভূমি পার হতে বিপ্লবীরা সেদিন উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আর আজও, সোভিয়েত ইউনিয়নের মত একটি বড় সমাজতান্ত্রিক দেশের অবর্তমানে সকল প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনকে একুশ শতকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে।

কোন পথে এখন চীন? চীন কী একুশ শতকে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারবে? চীন সম্পর্কে এসব প্রশ্ন এখন উঠেছে। চীন যখন কমিউনিস্ট পার্টির ৯০ বছরের পূর্তি উত্সব পালন করছে, ঠিক সেই সময় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৭৩-৭৭) হেনরি কিসিঞ্জার একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন চীন সম্পর্কে। কানাডার টরেন্টোতে আয়োজিত একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানে কিসিঞ্জার বলেছেন, চলতি শতাব্দীতে চীন বিশ্বের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্বের সুযোগ পাবে না। তার যুক্তি চীন অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যায় বেশি জর্জরিত থাকবে। ফলে তার পক্ষে বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ থাকবে না। যুক্তরাষ্ট্র আগামী ২৫ বছর বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে-এটাও মনে করেন কিসিঞ্জার। যদিও ওই বিতর্কে ইতিহাসবিদ নিয়াল ফাণ্ডর্সন এবং বেইজিংয়ের সিঙহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডেভিড লি কিসিঞ্জারের সাথে একমত হননি।

চীন অনেক বদলে গেছে। এক সময় যে চীন ছিল কৃষিনির্ভর, দরিদ্রতা যেখানে ছিল প্রকট, বাড়িতে রঙিন টিভি ছিল যেখানে স্বপ্ন, সেই চীন আজ বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। চীন বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বড় অর্থনীতি। যুক্তরাষ্ট্র, জাপানের পরই চীনের অর্থনীতি। ইতোমধ্যে জাতীয় উত্পাদনের দিক থেকে জাপানকেও ছাড়িয়ে গেছে চীন। আর যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে ২০২০ সালো। উত্পাদনের দিক থেকে চীনকে বলা হয় সুপার পাওয়ার। বিশ্বের যত ফটোকপিয়ার, মাইক্রোওয়েভ ও জুতা তৈরি হয়, তার তিন ভাগের দুই ভাগ উত্পাদন করে চীন। সেই সাথে বিশ্বে উত্পাদিত মোবাইল ফোনের ৬০ ভাগ, ডিভিডির ৫৫ ভাগ, ডিজিটাল ক্যামেরার ৫০ ভাগ, শিশুদের খেলনার ৭৫ ভাগ ও ৩০ ভাগ পারসোনাল কম্পিউটার একা উত্পাদন করে চীন। সুতরাং এই চীনকে বিশ্ব উপেক্ষা করে কীভাবে? পরিসংখ্যান বলে চীনে বর্তমানে বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ ২ ট্রিলিয়ন ডলার। ফরচুন ম্যাগাজিন বিশ্বের বড় বড় ৫০০টি বহুজাতিক কোম্পানির কথা উল্লেখ করেছে, তার মাঝে চীনের একারই রয়েছে ৩৭টি কোম্পানি। বিশ্বে যত জ্বালানি ব্যবহৃত হয়, তার মাঝে শতকরা ১৬ ভাগ ব্যবহৃত হয় চীনো। জ্বালানি তেলের ব্যবহারের দিক থেকে চীনের অবস্থান তৃতীয়া। প্রতিবছর কয়েক কোটি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হয়। ৩ লক্ষ ছাত্র প্রতিবছর বিদেশে পড়তে যায়। যেখানে ১৯৪৮ সালে শিক্ষার হার ছিল মাত্র ২০ ভাগ, সেখানে এখন শতকরা ১০০ ভাগই শিক্ষিত। ২১ কোটি শিশু প্রতিবছর প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি স্কুলে ভর্তি হয়। চীন ইতোমধ্যে ২০ কোটি লোককে চরম দরিদ্রতা থেকে তুলে আনতে পেরেছে। তবে চীনে এখনও দরিদ্র মানুষ আছে। বিশ্বব্যাংক প্রতিদিন আয় ১ ডলার ২৫ সেন্ট হিসাব করে দরিদ্রের যে সীমারেখা টানছে, সেই হিসাবে চীনে এখনও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২১ কোটি। চীনে এখন নতুন নতুন তাক লাগানো শহর গড়ে উঠছে। আকাশছোঁয়া সব ভবনের ছবি টাইমস ছেপেছিল ২০০৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায়। চীন বিশ্বের

রূপান্তরযোগ্য জ্বালানির বিনিয়োগের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ‘সবুজ জ্বালানি’ (অর্থাৎ সৌরবিদ্যুৎ) খাতে চীন গত বছর বিনিয়োগ করেছিল সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি ডলার, যা ছিল আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৩৯ ভাগ বেশি। বিশ্ব জুড়ে গত বছর এ খাতে বিনিয়োগ হয়েছে ২৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। চীন ২০২০ সালের দিকে এ খাত থেকে শতকরা ১৫ ভাগ বিদ্যুৎ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে চায়। চীনের ‘সবুজ জ্বালানি’ প্রকল্প উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত।

স্কুলগুলোতে শেখান হয় ‘গ্রীন লিভিং’-এর কথা। কোন কোন শহরে রাস্তার বিদ্যুৎ-এর বাতি জ্বলে সৌর বিদ্যুৎ-এ। ১৯৪৯ সালের চীনের সাথে ২০১১ সালের চীনকে মেলান যাবে না। কৃষিনির্ভর একটি দেশ এখন পরিণত হয়েছে শিল্পোন্নত একটি দেশে। কিন্তু রাজনীতি? রাজনীতিতে কী পরিবর্তন এসেছে? সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তার চীন সফরের শেষ পর্যায়ে হংকং-এ এসে বলে ছিলেন তিনি তার জীবদ্দশায় দেখে যাবেন চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে চীনে পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র আদৌ প্রতিষ্ঠিত হবে- এ ব্যাপারে সকলেই সন্দেহান্বিত। কেননা গণতন্ত্রের জন্য চীন প্রস্তুত নয়। ১২০ কোটি লোকের দেশ চীনা চীনে বাস করে ৫৬ জাতির লোক। দেশের শতকরা ৯৪ ভাগ লোকই হান জাতির। ২২ প্রদেশ, ৫টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল নিয়ে আজকের চীনা এখানে পশ্চিমা ধাঁচের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়। তাই বলে চীনকে এখন ধ্রুপদী একটি মার্কসবাদী রাষ্ট্রও বলা যাবে না। তারা অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছেন। পুঁজিবাদের বেশকিছু উপাদান (ব্যক্তিগত খাত, ইপিজেড, স্টক মার্কেট) এখন চীনে চালু রয়েছে। স্বাস্থ্যখাত পুরোপুরিভাবে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে এটা বলা যাবে না। চীন এখন যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একদিকে যেমন পাওয়া যায় ইউরোপের Social Democracy' ধারণা, ঠিক অন্যদিকে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার Corporatism ও পূর্ব এশিয়ার Neo-Authorism-এর উপাদান। এই তিনটির সংমিশ্রণে নতুন এক রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে চীনে। এটাকে ঠিক মার্কসবাদও বলা যাবে না, আবার পুঁজিবাদও বলা যাবে না। এক সময় চীনে কনফুসিয়াসের ধ্যান-ধারণা নিষিদ্ধ ছিল। আজ চীন কনফুসিয়াসকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূজা করো। কনফুসিয়াসের অনেক চিন্তাধারা চীন এখন গ্রহণ করেছে। বাজার এখন চীনের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। চীনা পণ্য এখন বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। চীনের বড় বিনিয়োগ এখন আফ্রিকাতো। গরবাচেভ যে ভুলটি করেছিলেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে, সেই ভুল করেননি চীনা নেতৃবৃন্দ। তারা চীনকে বদলে দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তেমন কোন পরিবর্তন আনেননি। এখানে পরিবর্তন আসছে খুব ধীর গতিতে। আগে অত্যন্ত ক্ষমতাবান পালটব্যুরোর সদস্যরা অবসরে তেমন একটা যেতেন না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা থাকতেন পালটব্যুরোর সদস্য হয়ে। এখন ক্ষমতাবানদের অবসরে যেতে হয়। ২০১২ সালে অবসরে যাবেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও ও প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও। ধারণা করা হচ্ছে বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট সি জিনপিং হু জিনতাও-এর স্থলাভিষিক্ত হবেন। সি জিনপিং চলতি বছরের প্রথমদিকে বাংলাদেশে এসেছিলেন। সংস্কারবাদী হিসাবেই তিনি পরিচিত। ধারণা করা হচ্ছে আজ থেকে ৩৪ বছর আগে চীনা সংস্কারের জনক দেং জিয়াও পিং যে সংস্কারের সূচনা করেছিলেন, সেই ধারায় সি জিনপিংও একুশ শতকে চীনকে নেতৃত্ব দেবেন।

এ জন্যই মাইকেল এলিয়ট (Michael Elliott) লিখেছিলেন, ‘in this century the relative power of the u.s. is going to decline, and that of china is going to rise. That cake was baked long ago (The chinese century Time, 22 january 2007)। মাইকেল এলিয়ট মিথ্যা বলেননি। চীন আজ একটি শক্তি। এই শক্তিকে অবহেলা করা যাবে না। আর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সার্থকতা এখানেই যে, তারা চীনকে আজ এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এখন এডমিরাল মাইক মুলেন বেইজিং-এ এসে চীনকে বিশ্ব শক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন বটে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নীতি প্রণেতারা চীনের উত্থানকে খুব ভালো চোখে দেখছেন না। সম্প্রতি New American Foundation (ওয়াশিংটনস্থ একটি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান) যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে একটি দীর্ঘস্থায়ী গবেষণা পরিচালনা করে। একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী চীনা কর্তৃত্বকে খর্ব করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উচিত রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। একই সাথে ইউরোপে, বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণ সীমিত করা ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে রাশিয়ার স্বার্থকে (যাকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মেদভেদেভ চিহ্নিত করেছেন zone of privileged interest' হিসাবে) সম্মান করা (Anatol lieven, us Russian Relations and the rise of china, New American Foundation 11 july, 2011)। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে চীনকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র চিন্তিত। এমনতেই নানা ইস্যুতে (তিব্বত, তাইওয়ান, চীনা মুদ্রা, বাণিজ্য ইত্যাদি) চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। কোন কোন মহল থেকে ‘চীনকে ঘিরে ফেলার’ (Containment Theory) একটি নীতির কথাও বলা হচ্ছে। মুলেনের সফরের পর চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক আরো অবনতি ঘটলো, যখন প্রেসিডেন্ট ওবামা তিব্বতের বিতর্কিত নেতা দালাই লামার সাথে ওয়াশিংটনে দেখা করেন। চীন এই বৈঠকের নিন্দা করেছে এবং মন্তব্য করেছে যে, এই ঘটনা চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সামিলা। সবমিলিয়ে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক এখন বিশ্ব রাজনীতিতে অন্যতম আলোচিত একটি বিষয়। এই দু’টো দেশের মাঝে সম্পর্কের যদি আরো অবনতি ঘটে, তাহলে তা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবেই।

আরব বিশ্বের গণতন্ত্র

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গত ১৯মে জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন তাতে আরব বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করলেও, আরব বিশ্বে আদৌ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো কীনা, কিংবা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তার স্বরূপ কী হবে এ প্রশ্নটা এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। আরব বিশ্বে বিশেষ করে আরবলীগভুক্ত ২২টি দেশে একটি ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। যার সাথে দক্ষিণ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কিংবা পূর্ব ইউরোপের বিকাশমান গণতন্ত্রের সাথে মেলান যাবে না। এখানে রয়েছে ভিন্ন এক জগৎ। একদিকে রয়েছে সামরিক বাহিনীর প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপস্থিতি (মিসর, তিউনেসিয়া, ইয়েমেন) তেমনি রয়েছে পারিবারিক উত্তরাধিকার (সিরিয়া, লেবানন)। রাজতন্ত্র কিংবা আমির শাসিত দেশ তো রয়েছেই (জর্ডান, বাহরাইন, ওমান, সৌদি আরব)। আরব বিশ্বের তেল সম্পদ এ অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। তবে তেল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার কিংবা জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশ এ

থেকে উপকৃত হয়েছে, এটা বলা যাবে না। উপকৃত হয়েছে ক্ষমতাসীনদের সাথে সম্পৃক্ত কিছু ব্যক্তি। এক্ষেত্রে সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, তেল সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও, আরবলীগভুক্ত কোমোরোস, জিবুতি, সোমালিয়া কিংবা ফিলিস্তিনের কোন তেল সম্পদ নেই। একই বিশ্বে বাস করেও সোমালিয়ার দারিদ্র্যতা চোখে লাগার মত। আবার এ অঞ্চলে ইসলামিক জঙ্গিবাদের যে উত্থান ঘটেছে তা কিন্তু সব আরব দেশে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন আলজিরিয়া, ইয়েমেন কিংবা সোমালিয়ায় ইসলামিক জঙ্গিবাদি মনোভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। সোমালিয়া কার্যত একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। তাই এ অঞ্চলের গণতন্ত্রের বিকাশ নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। ফ্রিডম হাউজ এই দেশগুলোকে নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিল। তাতে যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা কোন আশার কথা বলে না। ওবামা প্রশাসন গণতন্ত্রে উত্তরণের কথা বললেও ফ্রিডম হাউজের এই প্রতিবেদনে তাদের আশাভঙ্গ হতে পারে। ১৬৭টি দেশের গণতন্ত্রের যে বিকাশ, তাতে ইয়েমেনের অবস্থান ১৪৬, আরব আমিরাতের ১৪৮, সিরিয়ার ১৫৩, সুদানের ১৫১, লিবিয়ার ১৫৮, জিবুতির ১৫৪, মিসরের ১৩৮, আলজেরিয়ার ১০৫। শুধুমাত্র তুলনামূলক বিচারে বাহরাইনের অবস্থা ভালো, ৪৮। অর্থাৎ এখানে নির্বাচন হয়। একটি সংসদও সেখানে রয়েছে। বিরোধীদের অস্তিত্বও রয়েছে। রাজতন্ত্র থাকলেও এক ধরনের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি এখানে গড়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের সাথে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশংসা জড়িত। ফ্রিডম হাউজ এটা নিয়েও গবেষণা করেছে। তাতে দেখা যায়, (মোট ১৯৬টি দেশের মাঝে) সোমালিয়ার অবস্থান ১৮১, ইয়েমেনের ১৭৩, তিউনিসিয়ার ১৮৬, সিরিয়ার ১৭৮, লিবিয়ার ১৯৩, মিসরের ১৩০, জিবুতির ১৫৯, বাহরাইনের ১৫৩ ও আলজেরিয়ার ১৪১। তখন ওবামা যখন গণতন্ত্রের কথা বলেন, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন এসে যায় আরব বিশ্বে এই গণতন্ত্রের স্বরূপ কী। এখানে কোন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। রাজতন্ত্রের পাশাপাশি কোথাও কোথাও পারিবারিক শাসনও (সিরিয়ায়) বজায় রয়েছে। সেখানে দল ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। লিবিয়াতে গত মার্চ মাস থেকেই যুদ্ধ চলছে। সর্বশেষ ঘটনায় মিত্রপক্ষ সর্বাঙ্গিক বিমান আক্রমণ সেখানে শুরু করেছে। দীর্ঘ দু'মাসেও গাদ্দাফিকে উত্থাত করা সম্ভব হয়নি। বারাক ওবামা তার ভাষণে লিবিয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'গাদ্দাফি যখন অপরিহার্যভাবে সরে যাবেন, ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হবেন, তখন দশকের পর দশকের দুর্দশার অবসান ঘটবে এবং লিবিয়া গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হবে'। এই বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয় যে গাদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করাই হোয়াইট হাউজের উদ্দেশ্য। মাহমুদ জিবরিলের নেতৃত্বে লিবিয়ায় একটি ন্যাশনাল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। কিন্তু লিবিয়ার ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সমর্থন এই কাউন্সিলের ব্যাপারে রয়েছে। এটা মনে করারও কোন কারণ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করা মাহমুদ জিবরিল যুক্তরাষ্ট্রেই বসবাস করতেন। তাঁকে দিয়ে লিবিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। স্পষ্টতই লিবিয়া ইরাকের মত পরিস্থিতি বরণ করতে যাচ্ছে। ২০০৩ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের কোন অনুমতি ছাড়াই বাগদাদ আক্রমণ করে সাদাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর দেশটি দখল করে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে মালিকির নেতৃত্বে একটি সরকার গঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু ইরাকে জন্ম হয়েছে এক নতুন সংস্কৃতির, আত্মঘাতী বোমাবাজি। আল-কায়দার ইরাকি সংস্করণের সেখানে জন্ম হয়েছে। সেখানে এখনই ৫০ হাজার আমেরিকান সেনা রয়েছে, যদিও তারা 'কমব্যাট' বা যুদ্ধরত অবস্থায় নয়। সাদাম পরবর্তী এই যে রাজনীতি, তাকে আমরা কী গণতন্ত্র বলবো? একটা 'ভয়ের সংস্কৃতি' সেখানে জন্ম হয়েছে। আত্মঘাতী বোমাবাজদের কারণে কেউই আজ নিরাপদ নন। মালিকির অবস্থানও খুব শক্তিশালী নয়। সাদাম হয়ত অপরাধ করেছেন। তার শাসনে স্বচ্ছতা ছিল না। কিন্তু এক স্থিতিশীল ইরাক তিনি উপহার দিয়েছিলেন। আজ সেই স্থিতিশীলতা ইরাকে নেই। লিবিয়ার পরিস্থিতিও সেদিকে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় শক্তিগুলো এখন সেখানে স্থলযুদ্ধের সূচনা করতে পারে। আর তার পরিণতিতে লিবিয়া হবে আরেক ইরাক। জিবরিল মালিকির ভূমিকা পালন করতে পারেন বটে, কিন্তু প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র লিবিয়ায় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আরব বিশ্বের তেল সম্পদের কথাও ওবামা বলেছেন। এটাই হচ্ছে মোদাকথা। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। ইরাকে তেলের নিয়ন্ত্রণ এখন মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক সংস্থাগুলোর হাতে। এখন লিবিয়ার তেল সম্পদ (রিজার্ভ ৪৬.৪ বিলিয়ন ব্যারেল) উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এটাই হচ্ছে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র মূল উদ্দেশ্য। বলে রাখি বিশ্বের তেলের যে রিজার্ভ, তার ৫৬ ভাগ রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। আর এই তেল সম্পদের উপর যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিম ইউরোপ পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

পর্যবেক্ষণেরা আল-কায়দার উত্থান তথা মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের মূল কারণ হিসেবে ইসরাইলী আগ্রাসী নীতিকে দায়ী করেছেন। স্বাধীন একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেখানে সংকটকে আরো গভীরতর করেছে। বারাক ওবামা তার ভাষণে বলেছেন ইসরাইল ও ফিলিস্তিনে সীমান্তরেখা হবে ১৯৬৭ সালের লাইন অনুসারে। তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকার রয়েছে স্বাধীন একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। কিন্তু বাস্তবতা যা তা হচ্ছে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ওবামার উপস্থিতিতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন অত্যন্ত কঠোর ভাষায়। এখানেই রয়েছে মূল সমস্যা। যতদিন ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান না হবে, ততদিন মধ্যপ্রাচ্যে সংকট থাকবে। আর এই সংকটকে পুঁজি করে আল-কায়দার মত সংগঠনের জন্ম হবে এবং তাদের 'জিহাদী' তত্পরতা বৃদ্ধি পাবে। মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের এটাও অন্যতম একটি সমস্যা।

আজ বারাক ওবামা আরব বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন বটে, কিন্তু ইসরাইলের আগ্রাসী নীতি 'যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন কখনও বন্ধ করতে পারেনি। নিরীহ ফিলিস্তিনীদের হত্যা করে ইসরাইল মানবতাবিরোধী অপরাধ করলেও হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে ইসরাইলী নেতাদের বিচার করা যায়নি কখনো। আরব বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু তা হতে হবে তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে। 'চাপিয়ে দেয়া গণতন্ত্র' আরব বিশ্বের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। বিমান হামলা চালিয়ে একটি পুতুল সরকার সেখানে বসিয়ে দিয়ে তেল সম্পদকে কবজা করার নাম, আর যাই হোক গণতন্ত্র হতে পারে না।

প্রেসিডেন্ট ওবামা তার ভাষণে ইন্টারনেট বিপ্লবের কথা বলেছেন। বলেছেন ইন্টারনেট সারা পৃথিবীতে মানুষের জানালা খুলে দিয়েছে। সেলফোন ও সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তরুণ সমাজকে যে কোন সমাজের চেয়ে অধিক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক যে বিপ্লব ঘটাতে পারে, মিসর তার বড় প্রমাণ। আজ

আরব বিশ্বে গণতন্ত্রের যে ঢেউ উঠেছে, তাতে এই তরুণ সমাজ পালন করছে একটি বড় ভূমিকা। দুঃখজনক হলেও সত্য, তরুণ সমাজের একটা বড় অংশই সেখানে বেকার। তিউনিসিয়ায় গত ২৭ ডিসেম্বর ফল বিক্রেতা মোহাম্মদ বউকুজিজি নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। বউকুজিজি ছিলেন একজন বেকার কম্পিউটার গ্রাফুয়েটা পুরো আরব বিশ্বে এই তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা এখন অনেক। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আলজেরিয়ায় ২৫ বছরের নিচে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর ৪৭ দশমিক ৫ ভাগ। মৌরিতানিয়ায় এ সংখ্যা ৫৯ দশমিক ৩, মরক্কোয় ৪৭ দশমিক ৭, তিউনিসিয়ায় ৪২ দশমিক ১, লিবিয়ায় ৪৭ দশমিক ৪, মিসরে ৫২ দশমিক ৩, সিরিয়ায় ৫৫ দশমিক ৩, জর্ডানে ৫৪ দশমিক ৩, ইরাকে ৬০ দশমিক ৬, কিংবা সোমালিয়ায় ৬৩ দশমিক ৫। এরা একটি শক্তি। ক্ষমতাসীনদের একটি বড় ব্যর্থতা হচ্ছে এরা এসব তরুণ সমাজকে বুঝতে পারেননি। এরা একটি শক্তি। এরাই আরব বিশ্বে পরিবর্তনটা আনছে। আর প্রেসিডেন্ট ওবামা তার ভাষণে এদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

স্পষ্টতই আরব বিশ্ব একটি পরিবর্তনের মুখোমুখি। যুক্তরাষ্ট্র এই পরিবর্তনের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৩ সালে গঠিত হয়েছিল National Endowment for Democracy। স্টেট ডিপার্টমেন্ট বছরে ১০০ মিলিয়ন সাহায্য দেয় এই প্রতিষ্ঠানকে। এই সংস্থার মাধ্যমে আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মিসরের গণ-অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত দু'টি সংস্থা April 6 movement কিংবা kafya কিংবা বাহরাইনের Center for Human Right-এর নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র (নিউইয়র্ক টাইমস ১৪ এপ্রিল, ২০১১)। উদ্দেশ্য একটাই— এ অঞ্চলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য তরুণ সমাজকে তৈরি করা। তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া। গণতান্ত্রিক দুনিয়ার সাথে পরিচিত করা। সমসাময়িক আরব বিশ্বের যে ইতিহাস, তাতে দেখা যায় ১৯৫২ সালে মিসরে রাজতন্ত্র উত্থাতের মধ্যে দিয়ে যে 'বিপ্লব'-এর সূচনা হয়েছিল, সেটা ছিল পরিবর্তনের প্রথম ধাপ। ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের সাথে কয়েকটি আরব বিশ্বের যুদ্ধ ও তাতে ব্যাপক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় অধ্যায়ের। তৃতীয় অধ্যায় শুরু হয়েছিল ১৯৭৯ সালে ইরানি ইসলামিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে। প্রতিটি বিপ্লবই আরব বিশ্বে কিছু না কিছু পরিবর্তন ডেকে এনেছে। এখন তিউনিসিয়া ও মিসরের গণ-অভ্যুত্থান এবং সেখানকার দীর্ঘদিনের সরকারের উত্থাতের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়। এই যে বিপ্লব, এই বিপ্লব আরব বিশ্বকে কোথায় নিয়ে যায়, সেটাই দেখার বিষয় এখন।

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন এবং ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন

গত ৪ নভেম্বর কানের জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই। বিশ্বের ধনী ২০টি দেশের সরকার তথা রাষ্ট্রপ্রধানরা এই শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন এমন একটি সময় যখন সারা বিশ্বজুড়ে অর্থনীতিতে এক রকম অস্থিরতা বজায় রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বড় বড় শহরে অসমতা, বেকারত্ব আর একশ্রেণীর হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধে যখন জনমত শক্তিশালী, ঠিক তখনই প্রেসিডেন্ট ওবামা ছুটে গেলেন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে বিনোদন নগরী হিসেবে পরিচিত ফ্রান্সের কান শহরে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে। জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে গ্রিসের ঋণসঙ্কট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সেটাও ছিল আলোচনার অন্যতম বিষয়। ঋণ এখন অনেকটা অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। ইউরোপের ধনী রাষ্ট্রগুলো গ্রিসকে ১১ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েও গ্রিসের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। গ্রিসের মোট ঋণের পরিমাণ এখন ২ দশমিক ৬ ট্রিলিয়ন ডলার। এই ঋণ গ্রিস শোধ করতে পারছে না। অনেকটা দেউলিয়া হয়ে গেছে রাষ্ট্রটি। গ্রিস 'ইউরো জোনে' থাকবে কী, থাকবে না, এটা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী পাপান্দ্রু একটি গণভোট করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বাতিল করতে বাধ্য হন। এখন সর্বশেষ আস্থা ভোটে পাপান্দ্রু টিকে গেলেও তিনি পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু তা গ্রিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়ে গেছে। গ্রিসের পরিস্থিতি যখন অবনতিশীল তখন ধারণা করা হয়েছিল জি-২০ নেতারা একটি উদ্ধার অভিযানে এগিয়ে আসবেন। কিন্তু 'ফটো সেশন' এর মধ্য দিয়ে দুদিনব্যাপী জি-২০ এর শীর্ষ সম্মেলন শেষ হলো। এমনকি অসমতা, বেকারত্ব আর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বজুড়ে যে আন্দোলন চলছে সে ব্যাপারেও কোনো সিদ্ধান্ত নিল না জি-২০ এর নেতারা।

এই মুহূর্তে গ্রিসের ঋণ পরিস্থিতি যেমন আলোচনার অন্যতম বিষয়, ঠিক তেমনি আলোচনার বিষয় আমেরিকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও। যে দেশ শিশুদের ন্যূনতম অধিকার (২১ ভাগ সন্তান নির্ধারিত দরিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে) নিশ্চিত করতে পারেনি, সেই দেশ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে শুধু অন্য দেশের (আফগানিস্তান, ৬ বিলিয়ন ডলার বছরে) সেনা প্রশিক্ষণের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ৬ জনের মধ্যে ১ জন গরিব। ৪ কোটি ৬২ লাখ মানুষ বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে, শতকরা হার যা ১৫ দশমিক ১ ভাগ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার আফ্রা-আমেরিকানদের এবং হিস্পানিকদের সংখ্যা বেশি। এই হার যথাক্রমে ২৭ দশমিক ৪ ও ২৬ দশমিক ৬ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য চাকরির সংস্থান না করে, তাদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত না করে কয়েক ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে যুদ্ধের পেছনে। যুক্তরাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর একটা অংশ রয়েছে, যাদের হেলথ ইনসুরেন্স নেই। স্বাস্থ্যসেবার বাইরে রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৬ দশমিক ৩ ভাগ। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যুদ্ধের খরচ মেটাতে কর দেনা ওবামা প্রশাসনের যুদ্ধের জন্য বাজেট প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন ডলার (যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী যুদ্ধের পেছনে খরচ ৩ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার), স্বাস্থ্য বীমা নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু ওবামা প্রশাসনের নজর এদিকে নেই। যুদ্ধ তাদের দরকার। যুদ্ধ প্রলম্বিত করে করপোরেট হাউজগুলো মুনাফা লুটছে। যুদ্ধ মানেই তো ব্যবসা। সুতরাং আজ যে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

যুক্তরাষ্ট্রেই গবেষণা হচ্ছে যুদ্ধের খরচ যদি কমানো যায়, তাহলে ওই অর্থ দিয়ে সামাজিক খাতে কী কী পরিবর্তন আনা সম্ভব। পেটাগনের হিসাব মতে প্রতিমাসে আফগানিস্তান ও ইরানে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয় ৯ দশমিক ৭ মিলিয়ন ডলার, যার তিন ভাগের ২ ভাগ খরচ হয় আফগানিস্তানে। পেটাগন ইরাক ও আফগানিস্তানে

গত ৪০ মাসে খরচ করেছে ৩৮৫ বিলিয়ন ডলার, যা কি না বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্যবীমা খাতে যুক্তরাষ্ট্র খরচ করেছে গত ১০ বছর। গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু সেনাদের ব্যবহৃত গাড়ির জ্বালানি তেল (আফগানিস্তানে) বাবদ (অক্টোবর ২০১০ থেকে মে ২০১১ পর্যন্ত) যুক্তরাষ্ট্র খরচ করেছে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তেল সরবরাহ ও জনশক্তির খরচ হিসাব করা হতো, তাহলে প্রতি গ্যালন তেলের মূল্য গিয়ে দাঁড়াতে ১০০ ডলার। প্রতি বছর আফগানিস্তানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে (সেনা সদস্যদের জন্য) যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয় বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার। ২০০৯ সালে আফগানিস্তানে প্রতি মার্কিন সেনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ছিল ৫ লাখ ৭ হাজার ডলার (বছরে)। ২০১০ সালে এটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৬ লাখ ৬৭ হাজার ডলার। আর ২০১১ সালের হিসাব ধরা হয়েছে ৬ লাখ ৯৪ হাজার ডলার। এটা কংগ্রেশনাল রিপোর্ট। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ইরাকে ২০০৭ সালে প্রতি মার্কিন সেনার জন্য বছরে খরচ ছিল ৫ লাখ ১০ হাজার ডলার, ২০১১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮ লাখ ২ হাজার ডলার। ২০১১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আফগানিস্তানে যুদ্ধের খরচের জন্য বরাদ্দ দিয়েছে ১১৩ বিলিয়ন ডলার। ইরাকের জন্য বরাদ্দ ৪৬ বিলিয়ন। এখন ওবামা প্রশাসনকে যুদ্ধের জন্য যদি অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে না হতো, তাহলে এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে (১) ৫৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন শিশুর (নিম্ন আয়ের পরিবারের) স্বাস্থ্যসেবা, (২) ২৩ মিলিয়ন নিম্ন আয়ের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা (৩) ২০২ মিলিয়ন ছাত্রের বৃত্তি, (৪) ১৪ দশমিক ৩৫ মিলিয়ন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা ও (৫) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ১৪ দশমিক ২৬ মিলিয়ন আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব। সুতরাং আজকে ওয়াশিংটনে কিংবা নিউ ইয়র্কে যে আন্দোলন হচ্ছে, তার পেছনে কারণগুলো কি, তা সহজেই অনুমেয়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলেও, ওবামা প্রশাসন যুদ্ধ বন্ধের কোনো উদ্যোগ নেননি। বরং তিনি লিবিয়ায় নতুন একটি ফ্রন্ট ওপেন করেছেন। লিবিয়ায় যে যুদ্ধের সূচনা তিনি করেছিলেন তাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় যুদ্ধ হিসেবে। লিবিয়ায় গাদ্দাফির মৃত্যুর পর এখন সম্ভাব্য টার্গেট হচ্ছে সিরিয়া ও ইরান। সুতরাং আগামীতে যুদ্ধ বন্ধের কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর সঙ্গত কারণেই যুদ্ধের জন্য অর্থ বরাদ্দ বাড়তে হলে সামাজিক খাতে আরো কাটছাঁট করতে হবে। এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বয়োজ্যেষ্ঠরা আর শিশুরা।

তাদের স্বাস্থ্য সুবিধা আরো সীমিত হবে। যুদ্ধের কারণে সমাজের একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, সুবিধাভোগী একটি অংশ বরং এতে উপকৃতই হচ্ছে। ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে করপোরেট হাউজগুলো আরো ধনী হচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের ধনিক শ্রেণী, যাদের সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ১ শতাংশ, তারা দেশটির মোট সম্পদের ৩৩ শতাংশের মালিক। সুতরাং করপোরেট হাউজগুলোর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

আজ নিউ ইয়র্কের জুকেটি পার্কে (অকুপাই ও ওয়াল স্ট্রিট) শত শত তরুণ সমবেত হয়ে যে আন্দোলনের সূচনা করলেন, তার সঙ্গে কায়রোর তাহরির স্কোয়ারের আন্দোলনের বেশ মিল পাওয়া যায়। সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করে মিসরের তরুণ সমাজ একটি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। পতন ঘটেছিল হোসনি মোবারকের। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কেও তরুণরা এই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো ব্যবহার করছে। তবে পার্থক্যটা এখানেই যে এতে করে ওবামা প্রশাসনের পতন ঘটবে না। তবে ওবামা প্রশাসন নিশ্চয়ই এটা থেকে কিছু শিখবে। ২০১২ সালে সেখানে নির্বাচন। ওই নির্বাচনে অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলন কোনো প্রভাব ফেলবে না, তা বলা যাবে না। আরো একটা কথা। সারা বিশ্বব্যাপীই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বিক্ষোভ হয়েছে, রোমে, লন্ডনে, অকল্যান্ডে। গ্রিসের অর্থনৈতিক সঙ্কট রাষ্ট্রটিকে একটি 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' এ পরিণত করেছে। ইউরোপে এক মুদ্রা ইউরো এখন অনেকটা অকার্যকর। বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এই এখন বড় ধরনের হুমকির মুখে। এখন বিশ্ব নেতারা সমস্যার সমাধানে কি উদ্যোগ নেন, সেটাই দেখার বিষয়। তবে একটি বিপ্লব সেখানে আসল। এই বিপ্লবকে মার্কস বেঁচে থাকলে হয়তো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে আখ্যা দিতেন। এটা একটা সামাজিক বিপ্লব। এই সামাজিক বিপ্লব সেখানে একটি পরিবর্তন আনবে। ধনী ও গরিবের মধ্যে পার্থক্য ঘোচাতেই হবে। শ্রেণীবৈষম্য কমিয়ে আনতেই হবে। না হলে বড় ধরনের বিস্ফোরণ ঘটবে। হোয়াইট হাউজ প্রশাসন এটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবে যে এভাবে চলতে দেয়া যায় না। এভাবে বৈষম্য বজায় রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই পরিবর্তনটুকু যত দ্রুত আনা যায়, ততই মঙ্গল। সমাজতন্ত্র যেমনি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি পুঁজিবাদও এখন ব্যর্থ প্রমাণিত হলো। নতুন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা জরুরি, যেখানে কোনো বৈষম্য থাকবে না, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন হবে, আর রাষ্ট্র জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণে জি-২০ সম্মেলন কোনো আশার বাণী শোনালা না। প্রতিবারের মতো এবারোও তারা ফটো-সেশন করলেন। ওবামা অনেক আশ্বাসের বাণী শোনালা। ইতোমধ্যে অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন ৫০ দিন পার করেছে। প্রচ- শীতেও বিক্ষোভকারীদের মাঝে এতটুকু হতাশা আসেনি। বরং তা ছড়িয়ে গেছে ক্যালিফোর্নিয়াতেও। সেখানে অকল্যান্ড সমুদ্রবন্দর বন্ধ করে দিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। একই সঙ্গে খোদ ওয়াশিংটনের ফ্রিডম প্লাজাতেও ডপঃডনবৎ- ২০১১ সড়কবন্দহঃ, যা যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরিচালিত, তা পার করেছে ৩০ দিন। এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এই পরিস্থিতি আমাদের মনে কমিয়ে দেয় বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কি পরিবর্তন আসছে

অতি সম্প্রতি সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন একটি সামরিক জোটে যোগ দেয়ায় যে প্রশ্নটি এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে বাংলাদেশ কি তার সনাতন নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে? বাংলাদেশের ৪৪ বছরের রাজনীতিতে কখনো কোনো সামরিক জোটে যোগ দেয়নি। এমনকি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান ব্রেজনেভ তার 'যৌথ নিরাপত্তা' চুক্তিতে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানালেও বাংলাদেশ তাতে শরিক হয়নি। পরবর্তীতে পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন এলেও বাংলাদেশ কখনো কোনো জোটে যোগ দেয়নি। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি

অনুসরণ করে আসছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ‘কারো সাথে শত্রুতা নয়, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব’ এই নীতি অনুসরণ করে আসছে। এখন বাংলাদেশ এই জোটে যোগ দেয়ায় বাংলাদেশ এই নীতি থেকে সরে এলো কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন। উপরন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫তম অনুচ্ছেদ ‘আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা, সংহতি ও উন্নয়নের’ কথা বলা হয়েছে। অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথাও বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে তাই জোটে যোগ দিয়ে আগামীতে ‘অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় বাংলাদেশ হস্তক্ষেপ করবে কিনা, ‘শক্তি প্রয়োগে’ অংশ নেবে কিনা, এ প্রশ্ন থাকলই। যদিও জোটের পূর্ণাঙ্গ ভূমিকা কী হবে তা এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই জোটের উদ্যোগে রিয়াদে একটি কেন্দ্র হবে এবং এই কেন্দ্র সন্ত্রাস ও জঙ্গিবিরোধী তথ্য-উপাত্ত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় হবে। তবে সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা এসপিএ আমাদের জানাচ্ছে, ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামরিক অভিযান সমন্বয় ও তাতে সহায়তা করতে সৌদি নেতৃত্বাধীন এ জোট গঠন করা হয়েছে।’ বাংলাদেশ আরো যুক্তি দেখিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির অংশ হিসেবে অন্য মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশ এই কেন্দ্রে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তত্ত্বগতভাবে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার। এক্ষেত্রে সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনে তথ্য বিনিময় আমাদের অনেক সাহায্য করবে। বাংলাদেশে আইএসের কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক আছে। আইএস আছে কী নেই, এ নিয়ে সংশয় আছে। ঝাওএইউ ইনটেলিজেন্সের পক্ষ থেকে আইএসের অস্তিত্ব এবং বেশ কটি হত্যাকাণ্ড ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে আইএসের সংশ্লিষ্টতার কথা বলা হলেও বাংলাদেশ সরকার তা অস্বীকার করেছে। এখন যদি আগামীতে এই জোট আইএসের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করে, তাহলে বাংলাদেশ আইএসের টার্গেটে পরিণত হতে পারে। এতে বাংলাদেশে আইএসের হুমকি আরো বাড়বে। আল কায়দা এ অঞ্চলে (অর্থাৎ ভারত-বাংলাদেশ-মিয়ানমারে) তাদের সাংগঠনিক তৎপরতা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশে কোনো কোনো জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তাদের সরাসরি যোগাযোগের খবর আমরা জানি না। তবে স্থানীয় জঙ্গিরা যে আল কায়দা ও আইএসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে এ খবর গোয়েন্দারা আমাদের জানিয়েছে। তখন একটা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল যে, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা বেড়ে যেতে পারে। সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোটে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থ কতটুকু নিশ্চিত করতে পারবে, সে ব্যাপারে এখনই স্পষ্ট করে কিছু বলা যাচ্ছে না। এক সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ইসলামিক বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। সংবিধানের এই ধারাটি এখন আর নেই। বাতিল করা হয়েছে। ফলে সৌদি জোটে যোগদান আমাদের জন্য কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভারত কোনো জোটেই যোগ দেয়নি। ওমানও যোগ দেয়নি। কিন্তু বাংলাদেশ দিলা। এই জোটে অন্য যেসব দেশ রয়েছে সামরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে সবাই দুর্বল। বিশ্বে বাংলাদেশের সামরিক নেতৃত্ব যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছে। এখন সৌদি আরব বাংলাদেশের এই অভিজ্ঞতাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে। অথচ সৌদি আরব এখনো বাংলাদেশের শ্রমবাজার উঃঃুন্ত করে দেয়নি। ফলে জোটে যোগ দিয়ে বাংলাদেশ কতটুকু লাভবান হবে। এ প্রশ্ন থাকবেই। তবে এই জোটের ভবিষ্যৎ ইতোমধ্যে নানা প্রশ্নের জঃঃ দিয়েছে। জোটের অন্যতম শরিক পাকিস্তান কিছুটা অবাকই হয়েছে। এই জোট গঠনে এবং জোটে পাকিস্তানের নাম থাকায়। পাকিস্তানের বক্তব্য পাকিস্তানের সঙ্গে পরামর্শ না করেই এই জোটের ঘোষণা দেয়া হয়। আমি নিশ্চিত নই এই জোট গঠনে বাংলাদেশের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা আদৌ হয়েছিল কিনা। সৌদি আরব এ ধরনের একটি জোট গঠন করতে যাচ্ছে কিংবা বাংলাদেশের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা হয়েছে। এটাও আমাদের অনেকের জানা নেই। ফলে সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান যখন গত ১৫ ডিসেম্বর এই জোট প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন তখন বিষয়টি আমাদের অবাকই করেছে। এমন হয়েছে কিনা। সৌদি আরব একাই সিদ্ধান্ত নিয়ে তা জোটবদ্ধ দেশগুলোকে জানিয়ে দিয়েছে শুধু? এটা যদি সত্য হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। জোট নিয়ে পাকিস্তানের প্রশ্ন তোলা এই সম্ভাবনাটাকেই সামনে চলে এলো।

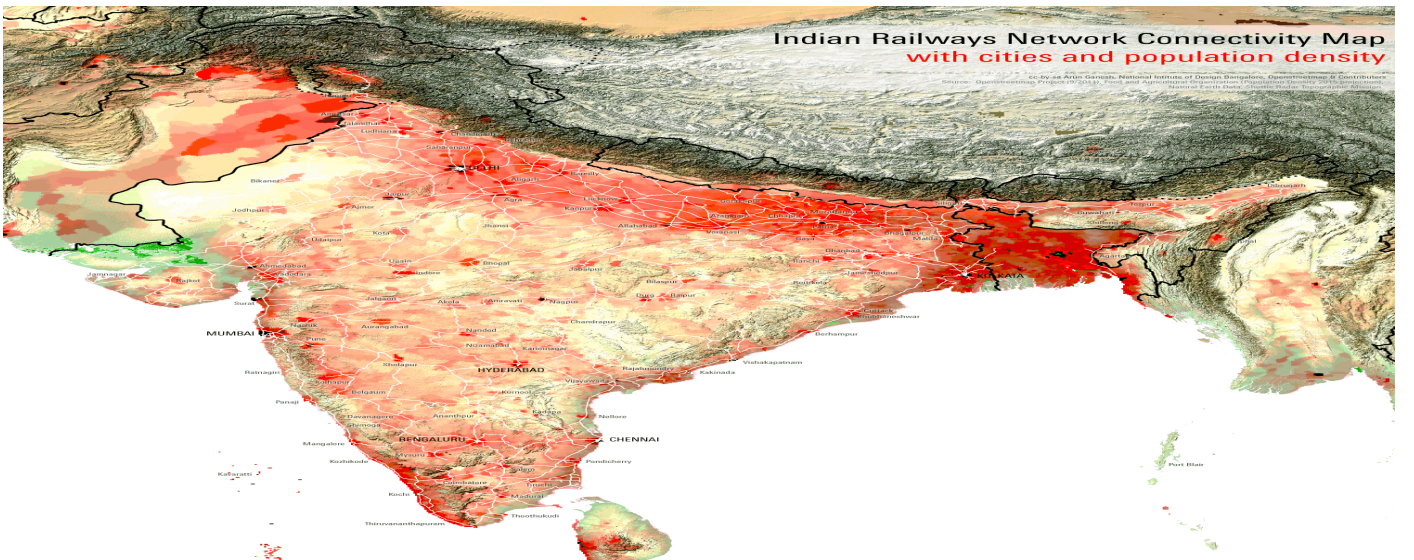
এখানে আরো একটা কথা বলা দরকার। মধ্য এশিয়ার দেশগুলো, যাদের নাগরিকদের প্রায় সবাই মুসলমান। ওই অঞ্চলের একটি দেশও জোটে যোগ দেয়নি। তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, কির্গিজিস্তান এই দেশগুলো এক সময়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতার অবসান ও সোভিয়েত রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে গেলে এই দেশগুলো স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ‘ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববোধ’ যদি অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে থাকে জোটে যোগ দেয়ার ব্যাপারে। তাহলে মুসলমান প্রধান এই দেশগুলো যোগ দিল না কেন? ইন্দোনেশিয়া বড় মুসলিম দেশ। এই দেশটিও নেই কেন? পাঠক, লক্ষ্য করুন কোন দেশগুলো যোগ দিয়েছে? বেনিন, সাঁদ, টোগো, জিবুতি, সুদান, সিয়েরা লিওন, গ্যাবন, সোমালিয়া, কমোবোয়া, মালদ্বীপ এই দেশগুলোর সন্ত্রাস দমনে আদৌ কোনো অভিজ্ঞতা নেই এবং জাতিসংঘ এই দেশগুলোকে কখনো বিশ্ব শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে আমন্ত্রণও জানায়নি। শুধু তাই নয়, সুদান, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, গিনি ইতোমধ্যে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এসব দেশে কোনো কেন্দ্রীয় সরকারও নেই। তাহলে এই দেশগুলোকে আমন্ত্রণ জানাল হলো কেন? দেশগুলো গরিব। আর্থিক ভিত্তি দুর্বল। ধনী দেশগুলোর আর্থিক সহযোগিতার ওপর দেশগুলো নির্ভরশীল। এটাকে বিবেচনায় নিয়েই কি দেশগুলোকে সৌদি আরব তার জোটে রেখেছে?

সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন এই জঙ্গি ও সন্ত্রাসবিরোধী জোটে ৩৪ দেশ যোগ দিয়েছে। এই জোটকে বলা হচ্ছে ‘ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স টু ফাইট টেররিজম’ (আইএসএএফটি)। অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেই এই জোটের জঃঃ! এখানে কোনো একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কথা বলা হয়নি। সম্প্রতি সিরিয়া ইরাকে জঃঃ নেয়া ইসলামিক স্টেট বা দায়েশ (আরবি নাম) এর বিরুদ্ধে আলাদা আলাদাভাবে বিমান হামলা পরিচালনা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট ও রাশিয়া। অনেক আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে একটি জোট ‘দ্য গ্লোবাল কোয়ালিশন টু কাউন্টার আইএসআইএলা’ এখানে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে, আইএসআইএল তথা ইসলামিক স্টেটের কথা। ৬৫টি দেশের সমন্বয়ে গঠিত এই জোটের মূল টার্গেট ইসলামিক স্টেট। এখন এর পাশাপাশি গঠিত হলো আইএসএএফটি। একটির নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অপরটি নেতৃত্বে সৌদি আরব। উভয় জোটের স্বার্থ কি এক? অর্থাৎ উভয় জোটই কি

ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে? বিষয়টি আমার কাছে অস্পষ্ট। কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জোট বাংলাদেশকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বাংলাদেশ এই জোট যোগ দেয়নি। এখন সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোট বাংলাদেশ যোগ দিল। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট যোগ দিল না কেন? নাকি ওই জোট যোগ দেয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আগে সৌদি জোট যোগ দিল? মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট যোগ না দেয়ার পেছনে বাংলাদেশের জোট নিরপেক্ষ নীতির কথা আমাকে বলতে চেয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। এক টিভি টক শোতে তিনি আমাকে এ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তবে জানিয়েছিলেন, ‘অসামরিক ও জাতিসংঘের উদ্যোগে যে কোনো উদ্যোগকে বাংলাদেশ স্বাগত জানাবো’ অর্থাৎ আমি ধরে নিয়েছি যদি কোনো ধরনের ‘মানবিক বিপর্যয়ের’ ঘটনা ঘটে সিরিয়ায়, তাহলে বাংলাদেশ মার্কিন জোটকে সহযোগিতা করবে এবং প্রয়োজনে জোট যোগ দেবে। এখন সৌদি জোট যার চরিত্র অনেকটা সামরিক, বাংলাদেশ এই জোট যোগ দিল। ফলে জোট যোগ দেয়া নিয়ে প্রশ্ন যে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। মজার ব্যাপার বেশ কিছু দেশ রয়েছে, যে দেশগুলো উভয় জোটেই আছে (জর্দান, আরব আমিরাতে, বাহরাইন, তুরস্ক, কুয়েত ইত্যাদি)। সৌদি আরব মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটেও আছে।

এই সৌদি জোট অনেক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এলো এখন। এক. সৌদি আরব নিজে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে অন্যতম নির্ধারক হিসেবে নিজেকে দেখতে চায়। অতীতের কোনো সৌদি বাদশাহ এভাবে সৌদি পররাষ্ট্রনীতি ও নিরাপত্তা ইস্যুতে কোনো বড় ভূমিকা পালন করেননি। কিন্তু বর্তমান বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজের ‘অ্যাপ্রোচ’ একটু ভিন্ন। তিনি সৌদি আরবকে দেখতে চান এ অঞ্চলের রাজনীতির অন্যতম নির্ধারক হিসেবে। তাই তার নেতৃত্বে একটি সামরিক জোটের প্রয়োজন ছিল। দুই. সৌদি আরব পারস্যীয় অঞ্চলে তার প্রভাব বাড়াতে চায়। এর প্রকাশ হিসেবে আমরা দেখেছি, ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ সৌদি আরবের হস্তক্ষেপ তথা সৌদি বিমানবাহিনীর ইয়েমেনে বোমাবর্ষণ। এর আগে লেবাননের গৃহযুদ্ধে সৌদি ট্যাংক বহরকে আমরা লেবাননে প্রবেশ করতে দেখেছি। অতীতে কুয়েতের আমির যখন ইরাকি সেনাদের দ্বারা উৎখাত হন (১৯৯০), তখন সৌদি আরব আমিরকে আশ্রয় দিয়েছিল বটে; কিন্তু আমিরের সম্মানে কোনো সেনা বা বিমান পাঠায়নি। ২০১১ সালে তিউনেসিয়ায় ‘জেসমিন বিপ্লব’ জাইন আল আবেদিন বেন আলিকে ক্ষমতাচ্যুত ও বেন আলি সৌদি আরবে আশ্রয় নিলেও সৌদি আরব তিউনেসিয়ায় হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ ক্ষমতাসীন হয়ে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আনেন। আর তারই ফলে নতুন এক ‘সৌদি আরব’কে আমরা দেখছি। তিন. সৌদি আরবের নীতি-নির্ধারকদের একটা বড় ভয় ইরানকে নিয়ে। পারস্যীয় অঞ্চলের রাজনীতিতে ইরানের ভূমিকা বাড়ছে এবং ইরানের এই ভূমিকাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন স্বীকারও করে। ইরানের সঙ্গে ৬ জাতি পারমাণবিক চুক্তি, ইরানের ধর্মীয় নেতা খামেনিকে ওবামার গোপন চিঠি লেখা ইত্যাদি প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে ইরানের ভূমিকাকে স্বীকার করে নিয়েছে। চার. এই জোট সিরিয়াকে রাখা হয়নি। এটা সবাই জানে সৌদি আরব চাচ্ছে সিরিয়ায় আসাদের উৎখাত। কিন্তু সৌদি পছন্দের তালিকায় আইএসও নেই। সম্প্রতি আসাদবিরোধী দলগুলোর একটি সম্মেলন হয়ে গেল রিয়াদে। সেখানে এমন অনেক দল অংশ নিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আছে। এক্ষেত্রে সৌদি আরবের ভূমিকা কী হবে এসব দল ও জোটের বিরুদ্ধে? অনেকেই জানেন ইসলামিক স্টেটের নেতৃত্বে সিরিয়া ও ইরাকের একটা অংশ নিয়ে তথাকথিত একটি জিহাদি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, যারা ওয়াহাবি মতাদর্শ ও আদি ইসলামিক রাষ্ট্রের ধ্যান-ধারণায় পরিচালিত হচ্ছে। সৌদি রাষ্ট্রের ভিত্তিই হচ্ছে এই ওয়াহাবি মতাদর্শ। এক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে আইএসের সঙ্গে সৌদি নীতি-নির্ধারকদের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও আদর্শগতভাবে মিল তো আছেই। সুতরাং সৌদি-আইএস সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। সৌদি জোট গঠন করার কথা বলা হয়েছে মাত্র। জোট এখনো তার যাত্রা শুরু করেনি। তার কমান্ডও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই জোটের সম্পর্ক কী হবে, সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। সুতরাং জোট গঠনের কথা ঘোষণা করলেও জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে।

কানেকটিভিটি : আমরা কোন পথে এগোবো?



ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের সময় স্বাক্ষরিত একটি ঘোষণা আমার বিবেচনায় যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। যে ৬৫ দফা যৌথ ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে, তার ৪১নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, উভয় প্রধানমন্ত্রী বিবিআইএনের (BBIN) আওতায় বিদ্যুৎ, পানিসম্পদ, বাণিজ্য, ট্রানজিট ও কানেকটিভিটি খাতে সহযোগিতার সুযোগ কাজে লাগাতে সম্মত হয়েছেন। এই বিবিআইএন হচ্ছে ভুটান, বাংলাদেশ, ভারত (সাত বোন রাজ্য) ও নেপালকে নিয়ে একটি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা। এই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আলোকে এরই মধ্যে ঢাকা-শিলং-গৌহাটি এবং কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। আগামীতে খুলনা-কলকাতা এবং যশোর-কলকাতা বাস সার্ভিসও চালু হবে। কলকাতা-খুলনার মধ্যে দ্বিতীয় মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেন চালুরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। রামগড়-সাবরুম সেতু নির্মাণ করছে ভারত। ফলে আগরতলার পণ্য পরিবহনে এখন এই সেতু ব্যবহার করে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করা যাবে। একই সঙ্গে ভারত আগামীতে মংলা বন্দরও ব্যবহার করতে পারবে, যে কারণে খুলনা-মংলা সড়ক সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই ভারত প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ট্রান্শিপমেন্টের মাধ্যমে ৯২ কনটেইনার পণ্য তাদের তিনটি বন্দর- চেন্নাই, কোচিন ও নভোসেবা বন্দরে নিয়ে গেছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এজন্য কোনো শুদ্ধ আদায় করেনি। এর সবই হচ্ছে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আলোকে। গত ১৫ জুন বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল আর ভুটানের মধ্যে যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহন চলাচলে একটি চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির অধীনে আগামী বছরের শুরুতে এ চারটি দেশের মাঝে যাত্রীবাহী বাস, পণ্যবাহী ট্রাক-লরি ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি চলাচল করতে পারবে। তবে ট্রানজিট ও চলাচলের অনুমতি সংক্রান্ত ফি নির্ধারণ হবে আলোচনার মাধ্যমে।

ট্রানজিট, ট্রান্শিপমেন্ট বা কানেকটিভিটি- আমরা যে নামেই বাংলাদেশ-ভারত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করি না কেন, মূল বিষয় হচ্ছে একটি- এই মুহূর্তে ভারতের এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনা আর এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশের ভূখণ্ড। বিশ্বের অন্য অঞ্চলের কানেকটিভিটি ঠিক এমনটি নয়। সেখানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সড়ক, নৌ অথবা রেলপথে যাওয়া যায়। আমরা প্রায়ই ইউরোপের কথা বলি। এটা সত্য, সড়ক পথে ইউরোপের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া যায়। আমি জার্মানি থেকে ইংল্যান্ড গেছি বেলজিয়ামের ওপর দিয়ে। সেখানে শুদ্ধ দিতে হয়। আমাদের নীতিনির্ধারকদের অনেকেই বলছেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বিবেচনা করেই শুদ্ধ নির্ধারণ হবে। অর্থাৎ শুদ্ধ এখন অবধি নির্ধারিত হয়নি। এরই মধ্যে দুই রুটে বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। তবে পুরো উদ্যমে এই সার্ভিসটি চালু হতে আরও ২-৩ মাস লাগবে। এখানে অনেক প্রশ্ন আছে। এক. বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে যে উন্নতি করতে হবে, তার ব্যয়ভার কে বহন করবে? দুই. এই দুই রুটে কি বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব বাস চালাতে পারবে?

প্রশ্নগুলোর জবাব এরই মধ্যে আমরা অনেকেই পেয়ে গেছি। এক্ষেত্রে পাঠকদের কিছু তথ্য দিতে চাই। ২০১২ সালে ট্যারিফ কমিশনের দেয়া রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করতে (যা কানেকটিভিটির জন্য প্রয়োজন হবে) প্রয়োজন হবে ৩৬ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে রেলপথে ব্যয় হবে ১৭ হাজার ৩১৮ কোটি টাকা, সড়কপথে ৯ হাজার ৪৮৭ কোটি টাকা, নৌপথে ৪ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা, মংলা বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ২ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় হবে বাকি ৪৮৯ কোটি টাকা। এই ব্যয়ের হার আরও বাড়বে। এতে বাংলাদেশের লাভ কতটুকু? পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন সূত্র বলছে, ভারতের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পণ্য পরিবহনে সর্বোচ্চ ৭৬ থেকে সর্বনিম্ন ১২ শতাংশ খরচ সাশ্রয় হবে। লাভটা ভারতের বেশি, আমাদের কমা কিন্তু ব্যয়ভার আমাদের। বিআইডিএসের গবেষক কেএএস মুরশিদ তার এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, ট্রানজিট থেকে বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ লাভ সীমিত। তবে বিনিয়োগটা করতে হবে বাংলাদেশকেই। মোদির ঢাকা সফরের সময় ভারত যে আমাদের ২০০ কোটি ডলারের ঋণপ্রস্তাব দিয়েছে, তার একটা অংশ ব্যয় হবে এ খাতে। বাংলাদেশকে সুদসহ মূল টাকা ফেরত দিতে হবে। এই ঋণের ধরন নিয়ে এরই মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠলেও প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং জানিয়ে দিয়েছেন, এই ঋণের সঙ্গে কোনো শর্ত যুক্ত নেই। আমরা আশ্বস্ত হয়েছি বটে, কিন্তু ভারতের এক্সিম ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক যদুভেন্দ্র মাথুরের বক্তব্য যখন টাইমস অব ইন্ডিয়ায় পড়ি (যা বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায়ও ছাপা হয়েছে), তখন কিছুটা খটকা লাগে বৈকি! মাথুর উল্লেখ করেছেন- ভারত যে ঋণ দেয়, এই ঋণচুক্তির শর্তানুযায়ী ঋণের অর্থে নেয়া প্রকল্পগুলোর অন্তত ৭৫ শতাংশ যন্ত্রপাতি ও সেবা ভারত থেকে নিতে হবে। এসব পণ্য ও সেবার উৎপাদন প্রক্রিয়া হবে ভারতেই। শুধু বাংলাদেশই নয়, এই শর্তে নেপাল, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপও মোট ৬০০ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছে। আর টাইমস অব ইন্ডিয়া আমাদের জানাচ্ছে, নতুন ঋণের টাকায় বাংলাদেশে নেয়া প্রকল্পগুলোকে কেন্দ্র করে ভারতে নতুন করে ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

আমরা কানেকটিভিটির বিরুদ্ধে নই। কানেকটিভিটি এ যুগের চাহিদা। এখানে আমরা আমাদের স্বার্থ দেখতে চাই। আমরাও চাই সড়কপথে আমাদের পণ্য নেপাল ও ভুটানে যাক। চুক্তি একটা হয়েছে বটে, তাতে আমরা কতটুকু উপকৃত হলাম- এর হিসাব-নিকাশ করা যাবে আরও কিছুদিন পর, যখন পুরোদমে কানেকটিভিটি কার্যকর হবে। এটি যদি শুধু দুপক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে। কানেকটিভিটির আওতায় আমরা চীনের কুনমিংও যেতে চাই। কিন্তু তা কি সম্ভব হবে আদৌ?

এই দ্বিপক্ষীয় কানেকটিভিটি ও থিম্পুতে চারদেশীয় মোটর ভেহিকল এগ্রিমেন্ট (এমভিএ) স্বাক্ষরিত হওয়ায় এটা এখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ভারত চারদেশীয় উপ-আঞ্চলিক জোট বিবিআইএনকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। এই উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা এখন সার্কের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে কি-না, এটা এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্র ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের কাছে এটাও একটা প্রশ্ন যে, ভারত বিবিআইএনকে বেশি গুরুত্ব দেয় ও তা কার্যকর

করায় বিসিআইএম জোটের ভবিষ্যৎ কী? ভারত কি এখন চাইবে বিসিআইএম নিয়ে এগিয়ে যেতো বিসিআইএম হচ্ছে অপর একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা। এই জোটে আছে বাংলাদেশ, চীন (ইউনান প্রদেশ), ভারত (সাত বোন রাজ্য) ও মিয়ানমার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালে তার চীন সফরের সময় এই বিসিআইএম করিডোরের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এটাকে অনেকে কুনমিং উদ্যোগও বলেন। এখানে চীনের স্বার্থ বেশি, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলাদেশেরও স্বার্থ রয়েছে।

চীন ২০০৩ সালে প্রথম কুনমিং উদ্যোগের কথা বলেছিল, যা পরিবর্তিত হয়ে বিসিআইএম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। মজার ব্যাপার, ভারত এ ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার পরই এই জোটের ধারণা শক্তিশালী হয়। এ জোটটি কার্যকর হলে কুনমিং (ইউনান প্রদেশের রাজধানী) থেকে সড়কপথে বাংলাদেশ ও ভারতেও আসা যাবে এবং পণ্য আনা-নেয়া যাবে। এর ফলে চীনা পণ্যের দাম কমে যাবে। দ্বিতীয়ত, ২০২০ সালের মধ্যে আসিয়ানে সৃষ্টি হচ্ছে মুক্তবাজার, যার ফলে বাংলাদেশ ও ভারতের পণ্য প্রবেশাধিকারের পথ সহজ হবে। বিসিআইএমের আওতায় কুনমিং থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সড়ক হবে। তিনটি রুটে ইউনান প্রদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারত সংযুক্ত হবে। নর্থ রুটে কুনমিং থেকে মিয়ানমারের মিতকিহা হয়ে ভারতের লেদো পর্যন্ত সংযুক্ত হবে। এ রুটে বাংলাদেশ সংযুক্ত হবে না। এই রুটটি অনেক কঠিন। সাউথ রুটে ইউনান থেকে বাংলাদেশের গভীর সমুদ্রবন্দর সোনাদিয়া পর্যন্ত সংযুক্ত ছিল। কুনমিং, মান্দালয় (মিয়ানমার) ও অ্যাওয়ে (মিয়ানমার) হয়ে এই রুটটি চট্টগ্রামে প্রবেশ করবে। পরে ঢাকা হয়ে কলকাতা যাবে। এখন সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত না হওয়ায় (ভারতের আপত্তির কারণে) এই প্রস্তাবিত রুটটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

তৃতীয় প্রস্তাবিত রুটটি হচ্ছে মিডল রুট। এই রুটটি ভালো এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটাই প্রাচীন সিল্ক রুট। কুনমিং-ভামো-লাশিও-তামু (মিয়ানমার)-ইমফল (ভারত)-সিলেট-ঢাকা ও কলকাতা হচ্ছে এই রুট, যা কি-না কংক নামেও পরিচিত। অর্থাৎ কুনমিং থেকে কলকাতা। অনেকের স্মরণ থাকার কথা, এই রুটে (২৮০০ কিলোমিটার) একটি মোটর র্যালি (২০১৩) চালু হয়েছিল।

বিসিআইএম জোটের সম্ভাবনা ছিল বিশাল। কারণ এই চারটি দেশের রয়েছে বিপুল তেল ও গ্যাস সম্পদ (মিয়ানমার), রয়েছে শক্তিশালী অর্থনীতি (চীন ও ভারত), রয়েছে শিল্প (চীন), শক্তিশালী সার্ভিস সেক্টর, রয়েছে বিশাল অব্যবহৃত জমি (মিয়ানমার) এবং সমুদ্রবন্দর (বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার)। ফলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক দৃশ্যপট বদলে যেতে পারে আগামীতে, যদি বিসিআইএম জোটকে কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়। আঞ্চলিক অর্থনীতি তো বটেই, বিশ্ব অর্থনীতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করতে পারে এই জোটা। এই চারটি দেশের সম্মিলিত জিডিপি পরিমাণ ৫ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার, যা কিনা বিশ্ব জিডিপি ১০ ভাগ। ১৯৯১ সালে বিসিআইএমের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল যেখানে ১.২ বিলিয়ন ডলার, সেখানে ২০১১ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৯০.২১ বিলিয়ন ডলারে। ১ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ক্ষয়ির কিলোমিটার এলাকা আর ২৮৮ কোটি মানুষের বাস এই বিসিআইএম জোটভুক্ত দেশগুলোতে। পূর্বে রয়েছে কুনমিং আর পশ্চিমে কলকাতা। ভেতরে মান্দালয় আর ঢাকা। ভারত এ জোটের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছিল এ কারণে যে, এতে করে আগামী দিনে ভারতের আসিয়ানের সদস্যপদ পাওয়া সহজ হবে। ভারত ২০০৭ সালে আসিয়ানের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এরই মধ্যে ভারত আসিয়ানের ডায়লগ পার্টনারের মর্যাদা লাভ করেছে (বাংলাদেশের অবস্থান আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরামে)। ডায়লগ পার্টনারের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে পূর্ণ সদস্য। তাই এ জোটের ব্যাপারে ভারতের আগ্রহ ছিল, যাতে করে দেশটি তার পণ্য নিয়ে শুল্কমুক্ত সুবিধা গ্রহণ করে আসিয়ান বাজারে প্রবেশ করতে পারে। এখন নরেন্দ্র মোদি সরকার বিসিআইএম নিয়ে আদৌ এগিয়ে যাবে কি-না, সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তার আগ্রহ বেশি বিবিআইএন জোট নিয়ে। ফলে বিসিআইএম জোট নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকে গেল।

এরই মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, ভারত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে ভারত ও চীন এক ধরনের সূক্ষ্ম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। ভারত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি, নৌ তৎপরতা এবং জিবুতিতে একটি নৌঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগ, এমনকি হামবানতোতায় চীনা সাবমেরিনের উপস্থিতি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। ফলে শ্রীলংকায় সরকার পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এমনকি ভারত মহাসাগরভুক্ত সিসিলি, মরিশাসে ভারত নৌঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্ট শি জেন পিং ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড-এর যে মহাপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাতে ৬০ দেশকে তিনি চীনের প্রভাব বলয়ের আওতায় আনতে চান। এর মধ্যে ভারত মহাসাগরভুক্ত দেশগুলোও রয়েছে। এটা সেই পুরনো সিল্ক রোডেরই আধুনিক সংস্করণ। ভারত এতে উদ্বিগ্ন। ফলে ভারত তার সেই পুরনো কটন রুট নিয়েই চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে চীন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হলেও এই প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা দেশ দুটির মাঝে এক ধরনের আত্মস্থানীয়তা সৃষ্টি করবে। এতে করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও প্রভাবিত হতে বাধ্য। তাই বিবিআইএন জোট নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হলেও এ অঞ্চলে ভারতীয় কর্তৃত্ব বাড়বে। চীনের প্রভাব এর মাঝ দিয়ে সংকুচিত হবে। তাই খুব স্পষ্ট করেই বলা যায়, বিসিআইএম জোটের বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এখানে চীনের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বাড়বে, এটাই মনে করেন ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা। ভারতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কোনো সিদ্ধান্তে যাবে না ভারত। আর বাস্তবতা হচ্ছে, বিবিআইএন বিকশিত হলে সার্ক দুর্বল হয়ে যাবে এবং সার্ক একটি কাণ্ডজে সংগঠনে পরিণত হবে মাত্র।

এই মুহূর্তে কতজন মানব সন্তান মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া উপকূল এবং আন্দামান সাগরে ভাসছেন এর পরিসংখ্যান কারো কাছেই জানা নেই। এদের মাঝে কতজন রোহিঙ্গা, কতজন বাংলাদেশি এটাও আমরা জানি না। তবে সংবাদপত্রে নিত্যদিন বের হচ্ছে এদের খবরা বের হচ্ছে দু' মাসেরও অধিক এরা সাগরে ভাসছেন, ছোট ডিঙি নৌকায় পানি, খাদ্য ছাড়া। যাদের ভাগ্য ভালো, তাদের আশ্রয় মিলেছে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের শরণার্থী শিবিরে। আর দুর্ভাগ্য যাদের, তাদের অনেকেই চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছেন সাগরে। কিন্তু এর সমাধান কোন পথে আমরা কেউই জানি না। সংবাদপত্রগুলো আমাদের জানাচ্ছে উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের মাঝে মালয়েশিয়ায় ৮০৩ জন এবং ইন্দোনেশিয়ায় ২৩৮ জন বাংলাদেশির পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। আর যারা সাগরে ভাসছেন, তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত ১৮ মে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনিফাহ আমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, ৩১ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। কিন্তু হতভাগ্য বাংলাদেশি অভিবাসীদের প্রত্যাবর্তন কিংবা সাগরে ভাসা মানব সন্তানদের উদ্ধারের ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই তাতে। এখানে প্রশ্ন অনেক। এই মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে একটি চক্র। এরা যেমন আছে বাংলাদেশ-মিয়ানমারে, ঠিক তেমনি আছে থাইল্যান্ডে আর মালয়েশিয়ায়। ২৩ মে ২০১৫ তারিখে পত্রিকান্তরে প্রকাশ, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মতে, 'মানব ব্যবসায়' জড়িত পুরো থাই সমাজ। পাচারকারীরা মূলত টাংগেট করেছিল রোহিঙ্গা নারী-পুরুষদের, যারা মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের বাসিন্দা। মিয়ানমারে গত বেশ ক' বছর ধরেই এক ধরনের 'এথনিক ক্লিনসিং' অর্থাৎ অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলমানদের আরাকান থেকে উৎখাত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মিয়ানমারকে একটি 'বৌদ্ধ রাষ্ট্র' পরিণত করতে চায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। আর এদের মদদ জোগাচ্ছেন মিয়ানমারের শাসক চক্র। বৌদ্ধ ধর্ম শক্তির ধর্মা এরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু আরাকানে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড এর প্রমাণ করে না। মিয়ানমারের শাসকচক্র মনে করেন রোহিঙ্গার মূলত চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং তারা 'অবৈধভাবে' আরাকানে বসবাস করছেন! অত্যন্ত কৌশলে এদের বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে ঠেলে দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে একাধিকবার। এরপর একটি 'চক্র' এদের কৌশলে মালয়েশিয়া পাচার করার উদ্যোগ নেয়। এর সঙ্গে যোগ হয় বাংলাদেশের মানব পাচারকারীরা। বাংলাদেশিরাও চাকরির আসায় যেতে চান মালয়েশিয়ায়। কৌশলে পাচারকারীরা এদের বড় সাম্পানে তুলে দিয়ে পরে থাইল্যান্ডের পাচারকারীদের হাতে তুলে দেয় এবং মুক্তিপণ দাবি করা হয়। সমস্যাটা তৈরি হয়েছে এভাবেই। রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বাংলাদেশিদেরও নেয়া হয় এবং পরে তাদের কাছে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। রোহিঙ্গাদের বলা হয়েছিল মালয়েশিয়ায় আশ্রয় দেয়ার কথা। এখানে মিয়ানমার সরকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা হয়েছে, তা হচ্ছে সমুদ্রে উপকূলবর্তী এলাকায় নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের যোগসাজশে এই মানব পাচার চলে আসছিল। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা নিয়েও খবর বের হয়েছে। এই মানব পাচারের ঘটনা যে এই প্রথম ঘটল, তা নয়। এর আগেও ঘটেছে। কিন্তু তা প্রকাশ পেয়েছে কমা। এবারই সম্ভবত ব্যাপক মানবপাচারের ঘটনা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে স্থান পেয়েছে। এখানে আরো একটা বিষয় দৃষ্টিকটু। এই মানব পাচারের ঘটনা নৌবাহিনী কিংবা কোস্টগার্ডের চোখ এড়িয়ে গেল কিভাবে? কোস্টগার্ডের না হয় সমুদ্রে থাকার বড় জাহাজ নেই। কিন্তু নৌবাহিনী? সমুদ্রসীমায় টহল দেয়া, বিদেশি মাছ ধরা ট্রলারদের বাংলাদেশি সমুদ্রসীমায় প্রবেশে বাধাদান, সমুদ্র সীমান্ত রক্ষা। এসবই তো নৌবাহিনীর কাজ। তাদের তো গভীর সমুদ্রে যাওয়ার জাহাজ রয়েছে। অতি সম্প্রতি নতুন নতুন জাহাজ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে। লেবাননে শান্তি মিশনেও গিয়েছিল নৌবাহিনী। তাহলে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সাগরপথে যে মানব পাচার হচ্ছে, তা তাদের দৃষ্টিতে আসল না কেন? স্থানীয় কমান্ডার কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছিলেন? দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কি চার্জ গঠন করা হবে এখন? আরো দুর্ভাগ্য আমাদের যে এই ঘটনায় বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক নষ্ট হয়েছে। ভাবমূর্তি উদ্ধারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি ভূমিকা নেয়, সেটাই দেখার বিষয় এখন। যারা সাগরে ভাসছেন, তাদের অনেকেরই নাগরিকত্ব এখনো চিহ্নিত হয়নি। যারা শরণার্থী শিবিরে আছেন এবং যাদের নাগরিকত্ব চিহ্নিত হয়েছে, তাদের অবিলম্বে ফিরিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেয়া উচিত। যারা রোহিঙ্গা এবং সাগরে ভাসছেন, ১৯৫১ সালের শরণার্থী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও ১৯৯৮ সালের উদযুক্ত সংক্রান্ত আইন, এমনকি এ সংক্রান্ত ১৯৬৭ সালের প্রটোকল অনুযায়ী সাগরে ভাসমান মানুষগুলো এখন 'শরণার্থী' হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য। জাতিসংঘ এদের দায়িত্ব নেবে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলো (এক্ষেত্রে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া) এসব শরণার্থীকে গ্রহণ করতে বাধ্য। রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের করণীয় কিছু নেই। আসিয়ানের দায়িত্ব এক্ষেত্রে বেশি। মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ করার দায়িত্বটি নিতে হবে আসিয়ানকে। মিয়ানমারকে বাধ্য করতে হবে রোহিঙ্গাদের ওপর সব ধরনের নিপীড়ন বন্ধ করতে। রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন যদি বন্ধ হয় তাহলে মানব পাচার হ্রাস পাবে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি সিদ্ধান্তের দিকেও আমরা তাকাতে পারি। ভূমধ্যসাগরে অতিক্রম করে গত প্রায় এক বছর ধরে শত শত আফ্রিকান অভিবাসী ইতালিতে প্রবেশ করেছে এবং করার চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে যারা ঢুকে পড়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট একটি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। অর্থাৎ এদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ২৮টি দেশের সর্বত্র পুনর্বাসন করা হবে (যদিও ব্রিটেনের টোরি সরকারের তাতে আপত্তি রয়েছে)। আসিয়ান এ ধরনের একটি কর্মসূচি নিতে পারে। বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টিকে কিভাবে দেখছে, জানি না। কিন্তু এত বড় মানবিক বিপর্যয়ের পরও তাদের কোনো কর্মকাণ্ড আমার চোখে পড়েনি। রোহিঙ্গাদের নিয়ে আমাদের প্রচুর সমস্যা। কয়েক লাখ রোহিঙ্গা এখন কক্সবাজারে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে। এদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আমাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। একাধিকবার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়েছে। তাতে ফলাফল শূন্য। এখন মানবপাচারের ঘটনার পর বাংলাদেশ মিয়ানমারের সঙ্গে অতি দ্রুত আলোচনা শুরু করবে কিনা, তাও অস্পষ্ট। এটা সত্য, আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। বিসিআইএম জোট কিংবা বিমস্টেক জোট বাংলাদেশ ও মিয়ানমারেও আছে। আমাদের স্বার্থ আছে। কিন্তু মানব পাচারের ঘটনায় আমরা কি চুপ করে থাকব? এর দায়ভার বাংলাদেশ একা কেন নেবে? পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অতি দ্রুত কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

এক. রোহিঙ্গা সংক্রান্ত বিষয়টি আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোকে জানানো মিয়ানমারের একটা প্রোপাগান্ডা আছে যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশি। এরা যে বাংলাদেশি নয়, তা স্পষ্ট করা এবং আসিয়ান নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে মিয়ানমারের ওপর ‘চাপ’ প্রয়োগ করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা। দুই. অবিলম্বে মিয়ানমারের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটি ‘সংলাপ’ শুরু করা। প্রয়োজনে বিমস্টেক জোটকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা। তিন. ইইউর স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে আসিয়ান নেতৃবৃন্দকে এ ব্যাপারে রাজি করানো এবং রোহিঙ্গাদের আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। চার. বাংলাদেশের নৌবাহিনীকে আরো সক্রিয় করা এবং বাংলাদেশ থেকে সব মানব পাচার রুট মনিটর করা ও বন্ধ করা। পাঁচ. বাংলাদেশিরা যারাই এ মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত তাদের আইনের মুখোমুখি করা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। ছয়. মানব পাচার সংক্রান্ত যে আইনটি রয়েছে তা বেশ দুর্বল। এই আইনটি সংশোধন করে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর ব্যবস্থা সংবলিত আইন প্রণয়ন করা। সাত. মিডিয়ার সাহায্য নিয়ে মালয়েশিয়াতে যে অবৈধ কাজের সুযোগ নেই, তা বারে বারে বলা। সরকার উপজেলা চেয়ারম্যানদেরও এ কাজে ব্যবহার করতে পারে। এতে করে মালয়েশিয়া সম্পর্কে সব বিভ্রান্তি দূর হতে পারে। আট. একটি বিশাল তরুণ প্রজন্ম এখন বেকার। স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া। ক্ষুদ্র ঋণের সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে পারে সরকার। সাগরে শত শত মানুষের ভেসে থাকার ঘটনা একটা মানবিক বিপর্যয়। আমরা যদি মনে করি পশ্চিমা শক্তি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে ‘বড় ভূমিকা’ নেবে, এটা আমাদের ভুল ধারণা। বসনিয়া, হারজেগোভিনায় সার্বরা যখন মুসলমানদের উৎখাত অভিযান শুরু করেছিল, তখন একটা পর্যায়ে ন্যাটোর বিমান করে সার্বিয়ায় বোমা হামলা পর্যন্ত চালিয়েছিল। কেননা তখন তাদের স্বার্থ ছিল। কিন্তু মিয়ানমারকে তারা ‘বাধ্য’ করার কোনো উদ্যোগ নেবে না। কেননা মিয়ানমার তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। মিয়ানমারের থেইন সেইন সরকার এখন সব কিছু ‘খুলে’ দিয়েছে। তথাকথিত ‘গণতন্ত্র’ নির্মাণ করছে সামরিক জাভা! গভীর সমুদ্রে রয়েছে প্রচুর গ্যাস ও তেল। এই গ্যাস ও তেলের ব্যাপারে আগ্রহী মার্কিন তেল কোম্পানিগুলো। ভারত ও চীন মিয়ানমারের গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত। এই গ্যাস ভারত নিয়ে যাবে পাইপ লাইনের মাধ্যমে। বিশাল বিনিয়োগ নিয়ে আসছে মার্কিন কোম্পানিগুলো। কোকোকোলা তাদের নতুন প্লাস্ট খুলেছে। মার্কিন দূতাবাস আবাবো চালু করা হয়েছে। ওবামা দু’-দু’বার মিয়ানমার সফর করেছেন। অঙ্কের হিসাবটা অনেক সোজা। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতির সমালোচনা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। আজ ওবামা প্রশাসন আরাকানে রোহিঙ্গাদের যে মানবাধিকার লঙ্ঘন রয়েছে, এ কথাটা বলবে না। কেননা তারা দেখছে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ। এখানে সাগরে ভাসমান মানব সন্তানদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি খুব বড় করে প্রাধান্য পাবে বলে আমার মনে হয় না। এমনকি ‘গণতন্ত্রের উজ্জ্বল তারকা’ অং সান সুচিও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। তার স্বপ্ন ভবিষ্যতে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট হওয়া। তাই বিদেশ সফরে গিয়ে থেইন সেইন সরকারের কথারই প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছিলেন রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের নাগরিক নন। ফলে পশ্চিমাদের স্বার্থের কাছে মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা বলি হচ্ছেন! সাগরে ভাসা মানুষদের বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশকেই আজ বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে হবে। জিটুজি পর্যায়ে আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় রোহিঙ্গা সমস্যাটি তুলে ধরা প্রয়োজন। মানবপাচারের ঘটনায় বিশ্ব মিডিয়ায় বাংলাদেশ প্রসঙ্গটি এসেছে। এতে করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের এতদিনের যে অর্জন, তা এখন নষ্ট হওয়ার পথে। তাই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি সেগুনবাগিচায় ‘আটকে’ থাকে, সেটা হবে আমাদের জন্য দুঃখের। সাগর ভাসা মানুষদের উদ্ধার করা প্রয়োজন। সরকার এক্ষেত্রে ‘চুপ’ করে বসে থাকতে পারে না।

চীন-ভারত দ্বন্দ্ব বাংলাদেশ কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে



বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে একটি প্রশ্ন বারবার উচ্চারিত হচ্ছে, আর তা হচ্ছে—এশিয়ার দুই বৃহৎ শক্তি চীন ও ভারতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব কি বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে? অর্থাৎ বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় চীনের অর্থায়নে কি শ্লথগতি আসবে? ভারত ও চীনের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে যে দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্ব মূলত ভারত মহাসাগরে প্রভাব বলয় বিস্তারকে কেন্দ্র করে। চীন যখন তার মেরিটাইম সিল্ক রোডের নামে ভারত মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলে তার প্রভাব বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে, ঠিক তখনই মোদি সরকার প্রাচীন ‘কটন রুট’কে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছে। অনেকেই স্মরণ করতে

পারেন গত মাসে মোদি মরিশাস, সিসিলি ও শ্রীলঙ্কা সফর করেছেন। তার মালদ্বীপ সফরেও যাওয়ার কথা ছিল। এর অর্থ পরিষ্কার ভারত মহাসাগরে ভারত তার প্রভাব ও সামরিক কর্তৃত্ব বাড়াচ্ছে। কেননা ভারত মহাসাগরে চীনা নৌবাহিনীর উপস্থিতি ও টহল বৃদ্ধি ভারতের নিরাপত্তাকে এক ধরনের হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে শ্রীলঙ্কায় বিগত রাজাপাকসে সরকারের সময় হামবানতোতা গভীর সামুদ্রিক বন্দরে চীনা সাবমেরিনের উপস্থিতি এবং মালদ্বীপের সীমানায় চীনা সাবমেরিনের অবাধ চলাচল ভারতের সামরিক গোয়েন্দাদের একটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। চীন ও ভারত সাম্প্রতিক সময়ে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করলেও ভারত মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলে উভয় শক্তিই এক ধরনের 'প্রভাব বিস্তার করার' প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে। প্রভাব বিস্তার করার এই যে প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতায় এ অঞ্চলের দেশগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে যাবে। চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। আর ভারত ইতোমধ্যে অন্যতম একটি অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ফলে ভারত তার 'ক্ষমতা প্রয়োগ' করতে শুরু করেছে। ফলে এ অঞ্চলে ভারতের ভূমিকা আগামীতে চীনা স্বার্থকে আঘাত করবে। ভারতের নীতি নির্ধারকরা এখন প্রকাশ্যেই বলছেন তারা এ অঞ্চলে চীনের উপস্থিতি 'সহ্য' করবেন না। ভুবনেশ্বর আইএআর সম্মেলনে (মার্চ ২০১৫) এই মেসেজটিই তারা দিয়েছেন। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এটা একটা নয়া দিক। সিসিলি ও মরিশাসের সঙ্গে একাধিক প্রতিরক্ষা চুক্তি ও এ দুটি দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার সিদ্ধান্ত, শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় প্রভাব বাড়ানো এবং ভবিষ্যৎ এ 'জাফনা কার্ড' ব্যবহার করা প্রমাণ করে ভারত ভারতীয় মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলে তার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে চায়। ইতিহাসের ছাত্রা জানেন ভারত প্রাচীনকালে তার 'কটন রুট' ব্যবহার করে এ অঞ্চলের দেশগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক বৃদ্ধি করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে প্রাচীন যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতা বিকাশে ভারতীয় পণ্ডিতরা একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। হাজার বছর আগে দক্ষিণের চোল বংশের রাজা রাজেন্দ্র চোলের আমলে নৌ-বাণিজ্যে ভারত শক্তিশালী ছিল। ওই সময় ভারত মহাসাগরকে চোল হ্রদ বলা হতো। ভারতীয় নৌ-বাণিজ্যের যে প্রাচীন রুট, তাতে দেখা যায় ভারত, পাকিস্তান, কুয়েত, মিসর, আফ্রিকার মাদাগাস্কার, আবার অন্যদিকে শ্রীলঙ্কা হয়ে সুমাত্রা, জাভা (মালান্দ্রা প্রণালি), হংকং, জাপান পর্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্য রুট সম্প্রসারিত ছিল। মোদি সরকার এই 'কটন রুট'কেই নতুন আঙ্গিকে সাজাতে চায়। প্রাচীনকালে ভারতীয় তুলা তথা সুতা এই সমুদ্র পথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেত। একদিকে চীনা নেতা শি জিন পিং তার 'সিল্ক রুট'-এর ধারণা নিয়ে ভারতীয় মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলে চীনের কর্তৃত্ব যেমন প্রতিষ্ঠা করতে চান, এর প্রতিপক্ষ হিসেবে ভারত তার পুরনো 'কটন রুট'-এর ধারণা প্রমোট করছে। দ্বন্দ্ব্বতা তৈরি হবে সেখানেই। বাণিজ্যনির্ভর এই দ্বন্দ্ব্ব, শেষ অবধি পরিণত হবে সামরিক দ্বন্দ্ব্ব। চীন তার নৌবহরে বিমানবাহী জাহাজ আরো বাড়াচ্ছে। ভারতও ভারত মহাসাগরে তার নৌবাহিনী শক্তিশালী করছে। আন্দামানে নৌঘাঁটি নির্মাণ করছে। বলা হয় একুশ শতক হবে এশিয়ার তিনটি বৃহৎ শক্তি চীন, জাপান ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক একুশ শতকের বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এ ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বড় ভূমিকা রয়েছে। বৈকি জাপানের নিরাপত্তার গ্যারান্টির যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। জাপানেও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য ফিলিপাইনের ক্ষেত্রেও। ফলে এ অঞ্চলে চীনের সঙ্গে যে বিপদ (জাপান ও ফিলিপাইনের সঙ্গে) তাতে যুক্তরাষ্ট্র একটি পক্ষ নিয়েছে। সম্প্রতি চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শি জেন পিং যে নয়া সিল্ক রুটের কথা বলেছেন তা 'অন্য চোখে' দেখছে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকদের ধারণা, এতে বিশাল এক এলাকাজুড়ে চীনা কর্তৃত্ব, প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ইতিহাসের ছাত্রা অনেকেই জানেন, ২১০০ বছর আগে চীনের হ্যান রাজবংশ এই 'সিল্ক রুট'টি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই 'সিল্ক রুট'-এর মাধ্যমে চীনের পণ্য (সিল্ক) সুদূর পারস্য অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এর মধ্য দিয়ে আজকের যে মধ্যপ্রাচ্য সেখানেও চীনের প্রভাব বেড়েছিল। চীনের নয়া প্রেসিডেন্ট এর নামকরণ করেছেন 'নিউ সিল্ক রুট ইকোনমিক বেল্ট'। এটা চীনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত। একই সঙ্গে একটি 'মেরিটাইম সিল্ক রুট'-এর কথাও আমরা জানি। যা কিনা চীনের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর একটা যোগসূত্র ঘটিয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই মেরিটাইম সিল্ক রুটের ধারণাও কয়েকশ' বছরের। এই মেরিটাইম সিল্ক রুট ধরে চীনা এডমিরাল ঝেং হে (মা হে) ১৪০৫ সাল থেকে ১৪৩৩ সাল এই ২৮ বছর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে চীনা পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৪২১-১৪৩১ সালে তিনি দুবার তৎকালীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। চীন এই নৌরুটটি নতুন করে আবার ব্যবহার করতে চায়। তবে কয়েকশ' বছরের ব্যবধানে এই অঞ্চল অনেক বদলে গেছে। চীন আর একক শক্তি নয়। ভারত তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। আর যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সঙ্গে নিয়েই তার নিজের স্বার্থ আদায় করতে চায়। ফলে এটা স্পষ্ট নয় ভারত-চীন সম্পর্ক আগামীতে কোন পর্যায়ে গিয়ে উন্নতি হবে। কেননা ভারত মহাসাগরে চীন ও ভারতের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে। মৎস্য সম্পদ থেকে শুরু করে জ্বালানী সম্পদ ও জ্বালানী সম্পদ সরবরাহের অন্যতম রুট হচ্ছে এই ভারত মহাসাগর। পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতির কারণে এই সামুদ্রিক রুটের গুরুত্ব বাড়ছে। এই সামুদ্রিক রুটের গুরুত্ব অনুধাবন করতেই চীন এ অঞ্চলে তার নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়িয়েছে। এর ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের স্বার্থও বিঘ্নিত হচ্ছে। ভারত তাই এ অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোতে তার নৌবাহিনীর উপস্থিতি ও কর্তৃত্ব বাড়াচ্ছে। ফলে এক ধরনের 'স্নায়বিক যুদ্ধ' শুরু হয়েছে এশিয়ায় প্রভাবশালী এই দেশ দুটির মধ্যে। আগামী মে মাসে নরেন্দ্র মোদি বেইজিং যাবেন। ভারতীয় মহাসাগরভুক্ত অঞ্চলে ভারতীয় তৎপরতা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় হয়তো স্থান পাবে না। কিন্তু চীনা নেতারা বিষয়টি জানেন ও বোঝেনও। মোদি নিজে চীনের ব্যাপারে যতই আগ্রহী থাকুন না কেন, ভারতে একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্রও আছে এবং ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা পৃথিবীর শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর একটি। এরা ভারতের স্বার্থকে সব সময় 'বড়' করে দেখতে চায়। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ইতোমধ্যে ভারতের এক ধরনের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের স্ট্র্যাটেজিস্টদের চোখ এখন ভারত মহাসাগরের দিকে। ভারত মহাসাগরে শুধু যে বিশাল সম্পদই রয়েছে, তা নয়। বরং বিশ্বের 'কার্গো শিপমেন্ট'-এর অর্ধেক পরিবাহিত হয় এই ভারত মহাসাগর দিয়ে। সেই সঙ্গে ৩ ভাগের ১ ভাগ কার্গো ব্যবহৃত জ্বালানী তেলের ৩ ভাগের ২ ভাগ এবং ৪ ভাগের ৩ ভাগ ট্রাফিক পৃথিবীর অন্যত্র যেতে ব্যবহার করে ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপথ। পৃথিবীর আমদানিকৃত পণ্যের (তেলসহ) শতকরা ৯০ ভাগের পরিচালিত হয় এই সামুদ্রিক রুট ব্যবহার করে। সুতরাং এই সমুদ্র পথের নিরাপত্তার প্রশ্নটি তাই গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি করে। ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য ভারত-চীন দ্বন্দ্ব্ব আক্রান্ত হবে এ অঞ্চলের দেশগুলো। বাংলাদেশের

পররাষ্ট্রনীতির জন্য এই চীন-ভারত দ্বন্দ্ব নতুন একটি ‘জটিলতার’ জন্ম দিয়েছে। কেননা বাংলাদেশের বর্তমান সরকার চীন ও ভারতের সঙ্গে ‘ভারসাম্যমূলক’ কূটনীতি অবলম্বন করেছে। যদিও অনেকই বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের কূটনীতি বেশি মাত্রায় ভারতনির্ভর। প্রধানমন্ত্রী ২০১০ সালের মার্চে চীনে গিয়েছিলেন। ওই সফরে তিনি কুনমিং-ও গিয়েছিলেন এবং কুনমিং-কক্সবাজার সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এখন এই সড়ক নির্মাণের প্রশ্নটি এবং বিসিআইএম (বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার) জোটের জন্ম ও বিকাশ প্রশ্নের মুখে থাকল। কেননা চীন-ভারত দ্বন্দ্ব এই আঞ্চলিক জোটের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। চীনের ‘কুনমিং উদ্যোগ’-এর পরিবর্তিত নাম হচ্ছে বিসিআইএম জোট। এখানে চীনের স্বার্থ বেশি। এই জোট গঠিত হলে চীনা পণ্য সড়কপথে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে বিদেশে রফতানি সম্ভব হবে। অনেকে স্মরণ করতে পারবেন সোনাদিয়ার অদূরে যে গভীর সমুদ্র বন্দরটি নির্মাণ করার কথা ছিল তাতে চীন যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চীনের এটি নির্মাণ করে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা এখন পরিত্যক্ত। গভীর সমুদ্রবন্দরটি এখন নির্মিত হবে পায়রা বন্দর। একনেকে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মূল কারণ হচ্ছে ভারতের আপত্তি। ভারতের সঙ্গে তার নিরাপত্তার প্রশ্নটি তুলেছে। এমনকি ভারতের নীতি নির্ধারকরা এটাও মনে করেন এই গভীর সমুদ্রবন্দরটি নির্মিত হলে চীনা পণ্যে এ অঞ্চল ছেয়ে যাবে। এতে ভারতীয় পণ্য মার খাবে। ফলে বিসিআইএম আঞ্চলিক জোট নিয়ে প্রশ্ন থাকলই। উল্লেখ্য যে, ভুটানে চীনা দূতাবাস খোলার ব্যাপারেও ভারতের আপত্তি রয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের নিরাপত্তা, পণের অবাধ চলাচল, সম্পদের আহরণ ইত্যাদির ব্যাপারে আগামী দিনগুলোতে চীন ও ভারতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আরো স্পষ্ট হবে। ফলে এ অঞ্চলের দেশগুলো এই দ্বন্দ্ব জড়িয়ে যেতে পারো। আঞ্চলিক সহযোগিতাকে কেন্দ্র করেই বর্তমান বিশ্ব বিকশিত হচ্ছে। এখানে সামরিক দ্বন্দ্বের চেয়ে বাণিজ্যিকনির্ভরতার বিষয়টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চীন ও ভারত বড় অর্থনীতির দেশ। ভারতে দরিদ্রতা থাকলেও ভারত আঞ্চলিক শক্তি। তাই বটেই, বড় অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত। আর চীন দূর প্রতিবেশী। চীনের সঙ্গে আমাদের সীমান্তের দূরত্ব খুব বেশি নয়। দুটি দেশের উন্নয়ন থেকেই আমরা উপকৃত হতে পারি। অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য কাটিয়ে উঠে চীন ও ভারত যদি নিজেদের মধ্যে ‘সহযোগিতার সম্পর্ক’ গড়ে তোলে তাহলে এ অঞ্চলের দেশগুলো উপকৃত হবে। সেই পঞ্চাশের দশকে হিন্দি-চীন ভাই ভাই সম্পর্ক, পঞ্চকীলার ধারণা (যা ন্যামের জন্ম দিয়েছিল) এই দুটি দেশের মাঝে একটা আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। একুশ শতকে এসে বৈরিতা নয়, বরং আস্থার সম্পর্ক এ অঞ্চলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারো। এখন দেখার পালা আগামী দিনগুলোতে এই দেশ দুটি বৈরিতা কতটুকু কমিয়ে আনতে পারো।

ভারত-চীন সম্পর্ক ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি

গেল সেপ্টেম্বরে চীনা প্রেসিডেন্টের ভারত সফর এবং আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্তৃক তাকে অভ্যর্থনা প্রদানের ঘটনা পঞ্চাশের দশকের দু’দেশের সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিলেও অতি সম্প্রতি অরুনাচল প্রদেশ নিয়ে দু’দেশের আস্থার সম্পর্কে কিছুটা ঘাটতি দেখা দিয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোদি অরুনাচল সফর করেন। সেখানে তিনি রেলপথ ও বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। এর প্রতিবাদ জানিয়েছে চীনা টাইমস অব ইন্ডিয়া। খবরে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদির অরুনাচল সফরকে সমালোচনা করে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া ওই বিবৃতিতে বলা হয়, চীনা সরকার কখনোই অরুনাচল প্রদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। বেইজিংয়ের মতে চীনের অন্তর্গত তিব্বতের মনিয়ুল, লোয়ুল ও নিু সায়ুল এলাকা নিয়ে ‘তথাকথিত অরুনাচল’ প্রদেশ গড়েছে নয়াদিল্লি। ওই এলাকাগুলো এখনও ভারতের ‘অবৈধ দখলদারির’ কবলে রয়েছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এ অভিমত সঙ্গত কারণেই দু’দেশের সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলবে। অনেকেই স্মরণ করতে পারেন, কিছুদিন আগে জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুমিও কিসিদা ভারতে এসেছিলেন। সেখানে তিনি অরুনাচল প্রদেশ যে ভারতের সে ব্যাপারে বক্তব্য দিয়েছিলেন। কিসিদার ওই বক্তব্যে চীন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। চীন মনে করে, ভারত জাপানকে চীনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। আগামী মে মাসে প্রধানমন্ত্রী মোদি চীন সফরে যাবেন। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রভাব ও কর্তৃত্ব বাড়ছে। মোদি তার পররাষ্ট্রনীতিতে দক্ষিণ এশিয়াকে অগ্রাধিকার তালিকায় রেখেছেন। দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি প্রথম সফরে ভুটান গিয়েছিলেন। ওই সময় সেখানে চীনবিরোধী বক্তব্যও তিনি দিয়েছিলেন। চীন এখন পর্যন্ত ভুটানে তার দূতাবাস খোলার অনুমতি পায়নি শুধু ভারতের আপত্তির কারণে। নয়া পররাষ্ট্র সচিব জয়শংকর তার দক্ষিণ এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে ভুটান হয়ে ২ মার্চ ঢাকায় এসেছেন। এরপর যাবেন পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। ইতিমধ্যে ওবামার ভারত সফর (২৫ জানুয়ারি ২০১৫) এ অঞ্চলে নতুন এক মেরুকরণের জন্ম দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতিতে এ মেরুকরণ কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলবে। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল তথা ভারত মহাসাগর আগামী দিনে প্রত্যক্ষ করবে এক ধরনের প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা। এ দুটি অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু ‘সামরিক তৎপরতা’ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দক্ষিণ চীন সাগরে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ে একটি সামরিক ঐক্য গঠিত হয়েছে। উদ্দেশ্য চীনের ওপর ‘চাপ’ প্রয়োগ করা। অন্যদিকে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে চীন তার নৌবাহিনীর তৎপরতা বাড়িয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগর থেকে মালাক্কা প্রণালী হয়ে ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে অ্যারবিয়ান গালফ পর্যন্ত যে সমুদ্রপথ, তার নিয়ন্ত্রণ নিতে চায় চীন। কারণ এটি তার জ্বালানি সরবরাহের পথ। চীনের জ্বালানি চাহিদা প্রচুর। এদিকে ভারতও ভারত মহাসাগরে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভারতের নৌবাহিনীর ‘নিউ ইস্টার্ন ফ্লিটে’ যুক্ত হয়েছে বিমানবাহী জাহাজ রয়েছে পারমাণবিক শক্তিকালিত সাবমেরিন। আন্দামান ও নিকোবরে রয়েছে তাদের ঘাঁটি। ফলে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চীন ও ভারতের মধ্যে রয়েছে। এশিয়া-প্যাসিফিক ও দক্ষিণ এশিয়ার কর্তৃত্ব নিয়ে চীন ও ভারতের অবস্থান এখন অনেকটা পরস্পরবিরোধী। যেখানে চীনা নেতৃত্ব একটি নয়া ‘মেরিটাইম সিল্ক রুটের’ কথা বলছে, সেখানে মোদি সরকার বলছে ‘ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক করিডোরের’ কথা। স্বার্থ মূলত এক ও অভিন্ন। এ অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। আর এ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এশিয়ার এ দুটি বড় দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এটাকেই কাজে লাগাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

একসময় মার্কিন গবেষকরা একটি সম্ভাব্য চীন-ভারত অ্যালায়েন্সের কথা বলেছিলেন। জনাথন হোলসলাগ ‘ফরেন পলিসি’ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ঈযরহফরধ-র (অর্থাৎ চীন-ভারত) ধারণা দিয়েছিলেন। নয়া চীনা প্রেসিডেন্টের ভারত সফরের (২০১৪) পর ধারণা করা হচ্ছিল, দেশ দুটি আরও কাছাকাছি আসবে। কিন্তু শ্রীলংকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা, ওবামার ভারত সফর এবং চীনা প্রেসিডেন্টের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে এ সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ। নতুন আঙ্গিকে ‘ইন্ডিয়া ডকট্রিনের’ ধারণা আবার ফিরে এসেছে। এ ডকট্রিন মনরো ডকট্রিনের দক্ষিণ এশীয় সংস্করণ। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ায় অন্য কারও কর্তৃত্ব ভারত স্বীকার করে নেবে না। একসময় এ এলাকা, অর্থাৎ ভারত মহাসাগরীয় এলাকা ঘিরে ‘প্রিমাভ ডকট্রিনের’ (২০০৭ সালে রচিত। শ্রীলংকা, চীন, ইরান ও রাশিয়ার মধ্যে ঐক্য) যে ধারণা ছিল, শ্রীলংকায় সিরিসেনার বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণা এখন আর কাজ করবে না। ফলে বাংলাদেশ তার পূর্বমুখী ধারণাকে আরও শক্তিশালী করতে বিসিআইএম-র (বাংলাদেশ, চীনের ইউনান রাজ্য, ভারতের সাত বোন, মিয়ানমার) প্রতি যে আগ্রহ দেখিয়েছিল, তাতে এখন শ্লথগতি আসতে পারে। সামরিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রশ্নে ভারত এখন আর বিসিআইএম ধারণাকে প্রমোট করবে না। আর বাংলাদেশের একার পক্ষে চীন ও মিয়ানমারকে সঙ্গে নিয়ে বিসিএম ধারণাকে এগিয়ে নেয়াও সম্ভব হবে না। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে, ওবামার ভারত সফরের মধ্য দিয়ে ভারত নানাভাবে লাভবান হয়েছে। ‘পাক্সা গুজরাতি’ নরেন্দ্র মোদি জাতিগতভাবেই ব্যবসা বোঝেন। ১২১ কোটি জনসংখ্যার দেশ ভারত। জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩০ ভাগ মানুষ অতিদরিদ্র, অর্ধেক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নেই, ৩১ ভাগ মানুষের দৈনিক আয় ১ দশমিক ২৫ সেন্টের নিচে (যা জাতিসংঘ নির্ধারিত অতি দরিদ্রের মানদণ্ড)। ভারতে প্রতি তিনজনের একজন দরিদ্র। প্রতিদিন মারা যায় ৫ হাজার শিশু। আর কন্যা শিশুর হ্রাস হত্যা করার কাহিনী তো অনেক পুরনো। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছিল, ভারতে ১ লাখ ৮৩ হাজার কৃষক ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে গত ১০ বছরে আত্মহত্যা করেছে। এখানে পরিবর্তন আনতে চাচ্ছেন মোদি। তার পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হচ্ছে বিনিয়োগ বাড়ানো। আর বিনিয়োগ বাড়তেই তিনি চীনা ও মার্কিন বিনিয়োগকারীদের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। স্বভাবতই ভারতে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে। দারিদ্র্য কমবে। যদি বৈষম্য কমিয়ে আনা যায়, তাহলে ভারত আরও এগিয়ে যাবে। মোদির স্বার্থ এখানেই। তবে একটা ভয়ের কারণ আছে- চিরবৈরী দুই দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। ওবামার ভারত সফরের পরপরই ভারত পারমাণবিক বোমা বহনযোগ্য মিসাইল অগ্নি-৫ উৎক্ষেপণ করে। এ অগ্নি-৫-এর ব্যাপ্তি সুদূর চীন পর্যন্ত। ভারত এখন আর পাকিস্তানকে বিবেচনায় নিচ্ছে না। ভারতের টাগেট চীনা অর্থাৎ চীনের কর্তৃত্ব কমানো। অগ্নি-৫ নিক্ষেপের পরদিনই পাকিস্তান তার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ‘রাদ’ বা ‘ব্রজের’ পরীক্ষা চালায়। এর আগে পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা বহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছিল। ফলে দেশ দুটি আবারও এক ধরনের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষায় নিয়োজিত হয়। মোদির পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্তানের গুরুত্ব কমা। যদিও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের উপস্থিতি দেখে মনে হয়েছিল দু’দেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মোদির পররাষ্ট্রনীতিতে পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ গুরুত্ব পাচ্ছে বেশি। ইতিমধ্যে তিনি ভুটান ও নেপাল সফর করেছেন। এ মাঠেই তিনি যাবেন শ্রীলংকায়। সেখানে তিনি জাফনাতেও যাবেন। মাঠে বাংলাদেশে আসতে পারেন। চীনকে গুরুত্ব দেয়ার পেছনে কাজ করছে তার বাণিজ্যিক নীতি। তিনি চান বিনিয়োগ। তবে চূড়ান্ত বিচারে চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা এ মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না। তবে এ অঞ্চলে চীনের প্রভাব কমানোই হবে মোদি সরকারের এক নম্বর অগ্রাধিকার। মোদির পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করে বলা যায়, মোদি একটি ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছেন। একদিকে চীন, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি রাশিয়ার সঙ্গেও সমমর্যাদাভিত্তিক সম্পর্ক রক্ষা করে মোদি তার পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করছেন। রাশিয়া থেকে তিনি অস্ত্র কিনছেন। ইউক্রেন ইস্যুতে তিনি রাশিয়ার অবস্থানকে সমর্থন করেছেন (এ প্রশ্নে বাংলাদেশের অবস্থানও অনেকটা ভারতের মতো)। রাশিয়া ও চীনকে সঙ্গে নিয়ে ভারত ব্রিকস ব্যাংক গড়ে তুলছে, যা হবে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প আরেকটি আন্তর্জাতিক ব্যাংক। বাংলাদেশও এ ব্যাংকের ব্যাপারে আগ্রহী। সুষমা স্বরাজের বেইজিং সফরের সময় সেখানে ত্রিদৈশী একটি ‘মিনি সামিট’ হয়েছে। চীন, রাশিয়া ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা সেখানে মিলিত হয়েছেন। ফলে বোঝাই যায়, ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বড় ধরনের সামরিক ও পারমাণবিক সম্পর্ক গড়ে তুললেও চীন ও রাশিয়াকেও কাছে রাখতে চায়। আগামী দিনগুলোয় স্পষ্ট হবে এ সম্পর্ক কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়। একুশ শতক হবে এশিয়ার তিনটি বড় অর্থনৈতিক শক্তি- চীন, জাপান ও ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক একুশ শতকের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণ করবে। সঙ্গত কারণেই বিশ্বের বৃহৎ শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ থাকবে এ অঞ্চলের ব্যাপারে। যদিও জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ঐতিহাসিক। জাপানের নিরাপত্তার গ্যারান্টিরও যুক্তরাষ্ট্র। জাপানে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি রয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য ফিলিপাইনের ক্ষেত্রেও। ফলে এ অঞ্চলে চীনের সঙ্গে যে বিবাদ (জাপান ও ফিলিপাইনের সঙ্গে), তাতে যুক্তরাষ্ট্র একটি পক্ষ নিয়েছে। এদিকে চীনের নয়া প্রেসিডেন্ট শি জেন পিং যে নতুন সিঙ্ক রুটের কথা বলছেন, তা অন্য চোখে দেখছে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের ধারণা, এতে করে বিশাল এক এলাকাজুড়ে চীনা কর্তৃত্ব, প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ইতিহাসের ছাড়া অনেকেরই জানেন, ১১০০ বছর আগে চীনের হ্যান রাজবংশ এই ‘সিঙ্ক রোড’ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ রোডের মাধ্যমে চীনের পণ্য (সিঙ্ক) সুদূর পারস্য অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এর মধ্য দিয়ে আজকের যে মধ্যপ্রাচ্য সেখানেও চীনের প্রভাব বেড়েছিল। চীনের নয়া প্রেসিডেন্ট এর নামকরণ করেছেন ‘নিউ সিঙ্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট’। এটা চীনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত সম্প্রসারিত। একই সঙ্গে একটি ‘মেরিটাইম সিঙ্ক রুটের’ কথাও আমরা জানি, যা কিনা চীনের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর একটা যোগসূত্র ঘটিয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ মেরিটাইম সিঙ্ক রুটের ধারণাও কয়েকশ বছর আগের। এ মেরিটাইম সিঙ্ক রুট ধরে চীনা অ্যাডমিরাল ঝেং হে (মা হে) ১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ সাল- এই ২৮ বছর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে চীনা পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ১৪২১-১৪৩১ সালে তিনি দু’বার বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে এসেছিলেন। চীন এ নৌরুটটি নতুন করে আবার ব্যবহার করতে চায়। তবে কয়েকশ বছরের ব্যবধানে এ অঞ্চল অনেক বদলে গেছে। চীন আর একক শক্তি নয়। ভারত তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। আর যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সঙ্গে নিয়েই তার নিজের স্বার্থ আদায় করতে চায়। ফলে এটা স্পষ্ট নয় ভারত-চীন সম্পর্ক আগামীতে কোন পর্যায়ে গিয়ে উন্নীত হবে। কারণ ভারত মহাসাগরে চীন ও ভারতের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে। এ স্বার্থ যদি পরস্পরবিরোধী হয়, তাহলে সংঘর্ষ অনিবার্য। মে মাসে

মোদির চীন সফরের আগে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান কৈলাসের যাত্রা সহজ করতে চায় ভারত। চীন এ ব্যাপারে নমনীয় হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। এখন কৈলাসে যেতে হয় উত্তরাঞ্চলের কাঠগোদাম থেকে হেঁটো এটা কষ্টদায়ক ও পথটি দুর্গম। পথটিও দীর্ঘ। অথচ কৈলাসে গাড়িতে করে যাওয়া সম্ভব। গ্যাংটকের পাশেই নাথুলা। রাস্তাও ভালো চীনের দিকে। চীন অনুমতি দিলে গাড়িতে করেই তীর্থযাত্রীরা কৈলাসে যেতে পারবেন। মোদি নিজেও এ পথে কৈলাস যেতে চান। সুতরাং দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা প্রভাব কমাতে মোদির উদ্যোগ এবং চীনের ব্যাপারে মোদির ব্যক্তিগত আগ্রহ- এ দু'য়ের মধ্য দিয়ে আস্থার সম্পর্ক কীভাবে তৈরি হয়, সেটাই দেখার বিষয়।

পরশক্তির সম্পর্ক ও নয়া বিশ্ব



সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির বিপুল বিজয়ের পর এখানকার রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মাঝে একটা প্রশ্ন উঠেছে, পরশক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক এখন কোন পর্যায়ে উন্নীত হবে। বিশেষ করে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো এখন বেশ সতর্ক। রিপাবলিকান পার্টি এখন সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে। ফলে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির আড়ালে কংগ্রেস একটি বড় ভূমিকা পালন করবে এবং প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করবে একটি কনজারভেটিভ নীতি গ্রহণ করতে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠী আইএসের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি আক্রমণ এবং চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোর নীতি গ্রহণ করার ব্যাপারে কংগ্রেস বেশকিছু নীতি গ্রহণ করতে পারে। এমনকি আইএস দমনে ইরানের সহযোগিতা চেয়ে ওবামা খামেনিকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে আপত্তি তুলেছেন রিপাবলিকানরা। ফলে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ইরান-যুক্তরাষ্ট্র সমঝোতার সম্ভাবনাও এখন প্রশ্নের মুখে থাকল। ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। ন্যাটো রাশিয়াকে ঘিরে ফেলতে চায় ও ইউক্রেনে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য মোতায়েন করতে চায়- এ অভিযোগ রাশিয়ার দীর্ঘদিনের। ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তির পর থেকে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। সেপ্টেম্বরে (২০১৪) পূর্ব ইউক্রেনে বিদ্রোহী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে ইউক্রেনের যে চুক্তি হয়েছে, ওই চুক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য ওবামা পুতিনকে অনুরোধ করেছেন। বেইজিংয়ে ওবামা-পুতিন সৌজন্য সাক্ষাৎ হয় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ, রুশ সৈন্যরা ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করেছে। তারা বিদ্রোহীদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মাঝে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চল রাশিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। এ নিয়ে সেখানে যুদ্ধ চলছে এবং তাতে প্রায় চার হাজার নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন বলে দাবি করেছে জাতিসংঘ। এখন রাশিয়া-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক কোনদিকে মোড় নেয়, সেদিকে দৃষ্টি থাকবে অনেকের। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক। কংগ্রেস নির্বাচনে তার সমর্থকদের পরাজয়ের পর প্রথম সফর হিসেবে ওবামা চীনে যান। সেখানে তিনি এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন (অ্যাপেক) সম্মেলনে যোগ দেন। এরপর যান মিয়ানমারে ইস্ট এশিয়া সামিটে যোগ দিতে। মিয়ানমারে এটা তার দ্বিতীয় সফর। দ্বিতীয়বার নির্বাচনের পরপরই (২০১২) তিনি মিয়ানমার সফর করেছিলেন। এরপর যান অস্ট্রেলিয়ায় জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে। যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক আগামীতে কোনদিকে গড়ায়, এ ব্যাপারে বিশ্লেষকদের আগ্রহ এখন অনেক বেশি। অভিযোগ আছে, যুক্তরাষ্ট্র চীনকে 'ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলার' এক মহাপরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে চীনকে দুর্বল করাই যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নিচ্ছে 'ট্রান্সপ্যাসিফিক পার্টনারশিপ ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেণ্ট' বা টিপিপিএফটি করার। প্রস্তাবিত এ চুক্তিতে চীনকে রাখা হয়নি। অথচ এশিয়ার তথা প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি চীন। ২০০৯ সালে প্রথম টিপিপিএফটির কথা জানা যায়। এখন এ চুক্তির আওতায় আছে ১১টি দেশ- অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, চিলি, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, পেরু, সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনাম। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০১২ সালে এ অঞ্চলের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। আর সেবা খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৪২ বিলিয়ন ডলার। বিশ্ব জিডিপি ৪০ ভাগ এ অঞ্চলের। আর বিশ্ব বাণিজ্যের ২৬ ভাগ পরিচালিত হয় এ অঞ্চলে। কিন্তু চীনকে বাদ দিয়ে এ চুক্তি নানা প্রশ্নের জন্ম দেবে। আগামী বছর এ চুক্তিটি স্বাক্ষর হওয়ার কথা। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের এ উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। রিপাবলিকানরা চাইবে অতি দ্রুত এ চুক্তিটি স্বাক্ষর হোক। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, চীন এরই মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের দুটি বড় অর্থনীতির একটি জোট গঠিত হলো। দক্ষিণ কোরিয়া অনেক আগেই মধ্যম সারির অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়ার মোট রফতানির ২৬ দশমিক ০৫ ভাগ রফতানি হয়েছে চীনে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হয়েছে মাত্র ১১ দশমিক ৯ ভাগ। বলা হচ্ছে, ২০১৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার রফতানি (এ অঞ্চলে) বাড়বে ৩০০ বিলিয়ন ডলার, যা মোট রফতানির ৩৯ দশমিক ৫ ভাগ। ২০১২ সালে এর পরিমাণ ছিল ২১৫ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার। এখন প্রশ্ন থাকবে, টিপিপিএফটি চালু হলে চীন-দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্কের ওপর তা কতটুকু

প্রভাব ফেলবে? একইসঙ্গে চীন, রাশিয়া, ভারত ও ব্রাজিলকে নিয়ে ব্রিকস ব্যাংক গড়ে উঠেছে, যা কিনা বিশ্বব্যাংকের কর্তৃত্ব ও প্রভাবকে চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছে। চীন এরই মধ্যে 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক' গঠন করেছে। বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশ এ ব্যাংকের ব্যাপারে এরই মধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে চীনের এ ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্র আগামীতে খুব ভালোভাবে নেবে বলে মনে হয় না। তবে যুক্তরাষ্ট্র চীনের এ ভূমিকাকে অস্বীকার করতে পারবে না। কেননা যুক্তরাষ্ট্রে চীনের বড় বিনিয়োগ রয়েছে। চীন যুক্তরাষ্ট্রের গ্যাস ও তেল আহরণ ক্ষেত্র, রিয়েল এস্টেট ব্যবসা ও কৃষিতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। দুই দেশের মাঝে সম্পর্ক খারাপ হলে এ বিনিয়োগে তা প্রভাব ফেলবে। সামরিক ক্ষেত্রেও পারস্পরিক অবিশ্বাস আছে। চীন রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়ে 'সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন' নামক একটি সংস্থা গড়ে তুলেছে। মধ্য এশিয়ায় তথা জ্বালানি সম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থকে চ্যালেঞ্জ করছে এ সংস্থাটি। শুধু তাই নয়, পূর্ব চীন সাগরে চীন একটি 'ওয়ার ডিফেন্স আইডেন্টিফিকেশন জোন' গড়ে তুলেছে। অর্থাৎ বিতর্কিত ও তেল সম্পদসমৃদ্ধ এ অঞ্চলে চীন অন্য কারও কর্তৃত্ব স্বীকার করে না। এটা পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে আঘাত করার শামিলা। এ অঞ্চলে চীনের ভূমিকাকে অনেক পর্যবেক্ষক 'চীনা মনরো ডকট্রিন' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'মনরো ডকট্রিনের' সময় যা ছিল ইউরোপীয় শক্তি (অর্থাৎ মার্কিন এলাকায় কোনো ইউরোপীয় শক্তির জড়িত থাকাকে চ্যালেঞ্জ করা)। এক্ষেত্রে চীনা এলাকায় কোনো বিদেশি শক্তির (জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র) জড়িত থাকার বিষয়ে চীনের অপছন্দ। একইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় মহাসাগর অঞ্চলে তার নৌবাহিনীর উপস্থিতি বাড়িয়েছে। ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক স্প্রিটের ছয়টি যুদ্ধজাহাজ ভারতীয় মহাসাগরে মোতায়েন করা হবে। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, যুক্তরাষ্ট্র চীনকে 'ঘিরে ফেলার' যে নীতি প্রণয়ন করেছে, তার অংশ হিসেবেই ভারতীয় মহাসাগরে এ যুদ্ধজাহাজগুলো মোতায়েন করা হচ্ছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্র তা স্বীকার করে না। বলা ভালো, ভারত মহাসাগরে চীনের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে। চীনের জ্বালানি সম্পদের প্রায় ৬০ ভাগ চীন এ পথে আমদানি করে। চীন কোনো অবস্থাতেই চাইবে না এ জ্বালানি সম্পদ সরবরাহে কোনো বাধা আসুক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন সমুদ্রবন্দরকে একত্রিত করে চীন তার 'মুক্তার মালা' নীতি প্রণয়ন করেছে। অর্থাৎ এ অঞ্চলে চীন তার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নৌজাহাজের উপস্থিতি এক ধরনের স্নায়ুচাপ সৃষ্টি করবে চীনের ওপর। চীন এটা ভালো চোখে নেবে না, এটাই স্বাভাবিক। ফলে আগামীতে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নানা জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই পরাশক্তিগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, প্রভাব বিস্তার করার প্রতিযোগিতা নতুন করে এক 'স্নায়ুযুদ্ধের' জন্ম দিতে পারে। তবে বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে স্নায়ুযুদ্ধ সময়কার পরিস্থিতিকে মেলান যাবে না। ওই সময় বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। দুই পরাশক্তির প্রভাব বিস্তার করার মানসিকতার কারণে ওই সময়ে বড় ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনার জন্ম হয়েছিল। যুদ্ধ হয়নি বটে। কিন্তু দীর্ঘসময় বিশ্বকে একটি উত্তেজনার মধ্যে রেখেছিল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিল সত্যি; কিন্তু তা ছিল সাময়িক। ২০ বছর পর নতুন আঙ্গিকে 'স্নায়ুযুদ্ধ' শুরু হয়েছে। তবে পার্থক্যটা হলো স্নায়ুযুদ্ধে একসময়কালে পক্ষ ছিল দুটি- যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। এখন পক্ষ বেশ ক'টা। চীন, ভারত এমনকি ইরানও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর। এখন দেখতে হবে, এ শক্তিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কোন পর্যায়ে উন্নীত হয়। এখানে প্রয়োজন একটি 'রিয়েল পলিটিকসের'। অর্থাৎ বাস্তববাদী নীতি গ্রহণ করা। বিশ্ব নেতারা যদি এ বাস্তববাদী নীতি গ্রহণ না করেন, তাহলে বিশ্বে উত্তেজনা থাকবেই। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, এ বাস্তববাদী নীতির বড় অভাব। যুক্তরাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' সূচনা করে মুসলিম বিশ্বকে পদানত রাখার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছে। দেশটি আফগানিস্তানে যুদ্ধের সূচনা করে, তা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। ইরাক-সিরিয়ায় সীমিত যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। একইসঙ্গে রাষ্ট্রের সীমানাও পরিবর্তিত হচ্ছে। অন্যদিকে রাশিয়া ও চীনের ওপরও 'চাপ' বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের রাজনৈতিক দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হচ্ছে রাজনীতিতে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস কনজারভেটিভ রিপাবলিকানদের দখলে চলে যাওয়ায় বিশ্ব-রাজনীতিতে উত্তেজনার সম্ভাবনা আরও বাড়ল। Daily Alokito Bangladesh 23.11.14

দক্ষিণ তালপট্টি হারিয়ে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হলো?



প্রথমে মিয়ানমার ও পরে ভারতের সঙ্গে সমুদ্র সীমানা নির্ধারিত হওয়ার পর যে প্রশ্নটি এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে, সমুদ্রভিত্তিক বিশাল যে অর্থনীতি, তার কতটুকু আমরা কাজে লাগাতে পারব? কিংবা সমুদ্র অর্থনীতিকে বোঝা ও ব্যবহারের জন্য যে জনশক্তি আমাদের দরকার, তা কি আমাদের আদৌ আছে? দ্য হেগের সর্বশেষ রায়ের পর সবার দৃষ্টি এখন এদিকেই থাকবে। এই রায়ের পর ‘সমুদ্র জয় হয়েছে’ বলে একটি অতি উৎসাহী ভাব আমি কারও কারও মাঝে লক্ষ্য করেছি। আসলে সমুদ্র জয় করা যায় না। সমুদ্র হচ্ছে বিশাল। বিশাল এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। এই অর্থনৈতিক সম্ভাবনার খুব কম অংশই আমরা আহরণ করতে পারি। সমুদ্রের বিশাল সম্ভাবনা এখনও অনাবিষ্কৃত। আমরা সাধারণত জানি, গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস পাওয়া যায়। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মিয়ানমার গভীর সমুদ্র থেকে তেল ও গ্যাস আহরণ করছে। কিন্তু এখানে কোবালটিন ক্রাস্ট, পলিমোটালিক সালফাইড, পলিমোটালিক নডিউলস ও গ্যাস হাইড্রেটের মতো মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ সাগরের তলদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তা আহরণের প্রযুক্তি ও জনশক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া উপকূলজুড়েই রয়েছে জিরকন, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, মোনজাইট ও গারনেটসহ অনেক ধরনের খনিজ পদার্থ। ক্রুকড স্যান্ড ও হেভি মিনারেলস তো আছেই। ‘ব্লাক ডায়মন্ড’ নামে পরিচিত খনিজ হচ্ছে ইলমেনাইট। বাংলাদেশে এর প্রচুর মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বলা ভালো, হেভি মিনারেলস ব্যবহার হয় ধাতব শিল্প, বিমান ও রকেট শিল্প এবং রেডিও-ইলেকট্রনিকের মতো শিল্পে। আর গ্যাস হাইড্রেট হচ্ছে এক ধরনের বলের মতো, যা থেকে মিলবে গ্যাস। নডিউলস সালফাইড থেকে মিলবে কপার, ম্যাগনেসিয়াম, নিকেল ও কোবাল্টের মতো দুস্প্রাপ্য ও মূল্যবান খনিজ পদার্থ (যায়যায়দিন, ১৩ জুলাই ২০১৪)। সমুদ্রে প্রচুর মৎস্য সম্পদ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সাগর-মহাসাগরে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। তবে বঙ্গোপসাগরে কত প্রজাতির মাছ রয়েছে এর কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। বিচ্ছিন্নভাবে দু’একটি গবেষণা চালানো হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে পূর্ণাঙ্গ চিত্র উঠে এসেছে বলে মনে হয় না। এখানেই এসে যায় মূল প্রশ্নটি। আমরা অতীতে কখনও সমুদ্রকে গুরুত্ব দিইনি। সমুদ্রের সম্পদ যে এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, তা নয়। বরং এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারব। সমুদ্রের ঢেউ নিয়েও কথা থেকে যায়। পশ্চিমা বিশ্বে এটা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে, এই ঢেউ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। এই প্রযুক্তি বা জনশক্তি আমাদের নেই- এটা আমরা স্বীকার করতেই পারি। তবে ভবিষ্যতে যে এই প্রযুক্তি এ দেশে আসবে না, তা আমরা বলতে পারি না। পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি আসছে। পশ্চিমা বিশ্বেও সমুদ্র নিয়ে গবেষণা বাড়ছে। সুতরাং আমরাও পিছিয়ে থাকতে পারি না। আমাদের সমুদ্র সীমানা এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি। এটা নিয়ে বিতর্ক কিংবা প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে কে জয়ী হয়েছে, কে হেরে গেছে এ বিতর্ক না তোলাই মঙ্গল। এটা সত্য, সমুদ্রসীমায় একটি বড় অংশই আমরা পেয়েছি। কিন্তু পুরোটা আমরা পাইনি। যে ৬ হাজার ১৩৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় আমরা হারিয়েছি, সেখানেই রয়েছে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিপুল রিজার্ভ। তালপট্ট দ্বীপ ওই ৬ হাজার ১৩৫ বর্গকিলোমিটারের অন্তর্ভুক্ত। তবে এর আশপাশে যে অঞ্চল, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত, সেখানেও প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের অনেকে এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের নাম জানেন। অধ্যাপক রহমান একবার বলেছিলেন, ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের একটি সংস্থা দক্ষিণ তালপট্ট এলাকায় বিপুল রিসোর্সের কথা উল্লেখ করেছিল। সাংবাদিক সিদ্দিকুর রহমান এ তথ্যটি সম্প্রতি উল্লেখ করেছেন। এদিকে ফার্স্ট পোস্ট নামে ভারতের একটি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, জাতিসংঘ সমুদ্রসীমা রায়ের মাধ্যমে হাডিয়াভাঙ্গা নদী ও দক্ষিণ তালপট্ট দ্বীপের মালিকানা লাভ করায় ভারত বিপুলভাবে লাভবান হয়েছে। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, হাডিয়াভাঙ্গা নদী যেখানে সাগরে মিশেছে, সেখান থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণের একটি খাঁড়িতে ভারত ২০০৬ সালে ১০০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পেয়েছিল। হাডিয়াভাঙ্গার মজুদ গ্যাসের পরিমাণ ভারতের কৃষ্ণ-গোদাবারি অববাহিকার পুরো মজুদের প্রায় দ্বিগুণ। বাংলাদেশ গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য যে ২৮ ব্লকে এলাকাটিকে ভাগ করেছিল, তার মধ্যে ২১ নং ব্লকে অন্তর্ভুক্ত ছিল দক্ষিণ তালপট্ট। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ও টিভি টকশোতে অধ্যাপক হোসেন মনসুর (চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা) জানিয়েছেন, দক্ষিণ তালপট্ট এলাকায় জ্বালানি সম্পদ আছে (তেল ও গ্যাস) এ তথ্য তার জানা নেই। আমি জ্বালানি বিশেষজ্ঞ নই। ফলে কার বক্তব্য সত্য, এটা নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। ভারত বঙ্গোপসাগরে ১০০ টিসিএফ গ্যাস ও ২ বিলিয়ন ব্যারেল তেল আবিষ্কার করেছে। মিয়ানমার করেছে ৭.৭ টিসিএফ গ্যাস। ২০০৬ সালে ভারত সরকার তাদের ২৪টি গভীর সমুদ্র ব্লক টেন্ডার প্রদানের জন্য দরপত্র আহ্বান করে। এর মধ্যে ব্লক ডি ২৩ (৮৭০৬ বর্গকিলোমিটার) ও ব্লক ডি ২২ (৭৭৯০ বর্গকিলোমিটার) বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ১৯৯১ সালের ২১টি ব্লকের অনেক অংশজুড়ে রয়েছে। এখন নতুন রায়ের ফলে দেখতে হবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্লকগুলোর ক’টি এবার পুনর্বিবাক্য করতে হবে। মহিসোপান নিয়েও একটা বিব্রান্তি আছে। এমনকি ‘ধূসর এলাকা’ নিয়েও আছে প্রশ্ন। তবে এটা বলতেই হবে, এ রায় বাংলাদেশের জন্য বিশাল এক সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। বাংলাদেশের সালিশি আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটিও ছিল সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত। চূড়ান্ত মুহূর্তে ভারত আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই ১৯৭৪ সাল থেকেই আলোচনা চলে আসছিল। ফলাফল ছিল শূন্য। উল্লেখ্য, সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য বর্তমানে বলবৎ রয়েছে 3rd United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS III)। এটি ১৯৮২ সালে গৃহীত এবং ১৯৯৪ সালের নভেম্বর থেকে কার্যকর। ভারত ১৯৯৫ সালের ২৭ জুন ও মিয়ানমার ১৯৯৬ সালের ২১ মে UNCLOS III অনুমোদন করে। বাংলাদেশ অনুমোদন করে অনেক পরে, ২০০১ সালের ২৭ জুলাই (অনুস্বাক্ষর ১৯৮২)। নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে সমুদ্রসীমার দাবির পক্ষে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে হতো। বাংলাদেশ ২০১১ সালের জুলাইয়ের পর তথ্য-উপাত্ত জমা দেয়ার পরই আদালত এ সিদ্ধান্ত নিল। এখন আদালতের এ রায় আমাদের জন্য যেমন সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করল, ঠিক তেমনি দায়িত্বও বেড়ে গেল। সমুদ্রে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। প্রচুর তেল/গ্যাস সম্পদের পাশাপাশি খনিজ ও মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। যেহেতু মিঠা পানির মাছের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে আমাদের আমিষের একটা সম্ভাবনা হল সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ। এ সম্পদ আহরণে আমাদের পর্যাপ্ত আধুনিক ট্রলার নেই। ছোট ছোট নৌকা বা ছোট ট্রলারে করে মৎস্য আহরণ করা হয়। কিন্তু এগুলো গভীর সমুদ্রে যেতে পারে না। ফলে আমাদের এলাকা থেকে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে থাইল্যান্ড ও ভারতীয় জেলেরা। বাংলাদেশ সরকারকে এখন উদ্যোগী হয়ে বড় বড় ট্রলার তৈরি ও মৎস্যজীবীদের মাঝে সমবায়ের ভিত্তিতে বিতরণ করতে হবে, যাতে তারা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারে। দক্ষ

জনশক্তি আমাদের নেই। সমুদ্র নিয়ে গবেষণা হয় কমা। বাংলাদেশ নৌবাহিনী তাদের স্বার্থে কিছু গবেষণা করে। কিন্তু তাদের সীমাবদ্ধতা আছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুটি সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ আছে। চট্টগ্রামে একটি মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এসব সিদ্ধান্ত ভালো। বরিশাল ও পটুয়াখালী (যা সমুদ্র এলাকায় অবস্থিত) বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিভাগ চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে নৌবাহিনী ও সমুদ্র অধিদফতর থেকে অবসরে যাওয়া কর্মকর্তাদের এসব বিভাগে নিয়োগ দিতে হবে। প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে আইন অনুষদ আছে, সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে সমুদ্র আইন সংক্রান্ত একটি বিষয় চালু করতে হবে। দীর্ঘদিন পর মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে আমাদের সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হল। কিন্তু কাজ অনেক বাকি। সরকারের একটি বড় উদ্যোগের প্রতি তাকিয়ে থাকবে এখন সবাই। এখন বিজয় উৎসবের সময় নয়। এ নিয়ে কৃতিত্ব নেয়ারও কিছু নেই। আমরা ভারতের দৃষ্টান্ত দেখে শিখতে পারি। ভারতে এটা নিয়ে কোনো আলোচনাও হয়নি। লেখালেখি তেমন চোখে পড়েনি। একটা রায় হয়েছে এবং আমাদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এখন দেখতে হবে এই ‘অধিকারকে’ আমরা কীভাবে ব্যবহার করি। আমরা দুটি রায়ই পেলাম। রায়ের আলোকে অতি দ্রুত সীমানা নির্ধারণ করে সেখানে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এজন্য সমুদ্র অধিদফতরকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। একই সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের UNCLOS ডেস্কে আরও শক্তিশালী করাও জরুরি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরুণ কর্মকর্তাদের বিদেশে পাঠিয়ে এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বঙ্গোপসাগর হচ্ছে ২ দশমিক ২ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার এক বিশাল এলাকা। এর মাঝে একটা সীমিত এলাকা আমাদের। তবে এখানে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। শুধু মৎস্য সম্পদ আহরণ করে আমরা আমাদের আর্মির ঘাটতি মেটাতে পারি। আগামী দিনে বঙ্গোপসাগরের স্ট্রাটেজিক গুরুত্ব বাড়বে। একদিকে চীন, অন্যদিকে ভারত এ অঞ্চলে তাদের নৌ তৎপরতা বাড়ছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ পরিচালিত হয় এই রুট দিয়ে। আর চীনের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ৬০ ভাগ বঙ্গোপসাগরের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আগামী দিনে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব বাড়বে। এজন্য আমাদের নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। বহিঃসমুদ্রে টহল বাড়তে হবে। বঙ্গোপসাগর নিয়ে গবেষণার পরিধি বাড়তে হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকায় ‘বিস’ এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ‘বিস’ একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। তবে সেখানে বঙ্গোপসাগর নিয়ে কোনো কাজ হয় না। এখন হতে পারে। সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ান ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব। আমরা একটা ‘রায়’ পেয়েছি বলে যদি আত্মতুষ্টিতে ভুগি, তাহলে আমরা ভুল করব। আমাদের কাজ আরও বাড়ল। আমাদের যেতে হবে অনেক দূর। মহিসোপানের বিষয়টিরও সমাধান হয়নি। এটা সমাধান করবে জাতিসংঘের অপর একটি সংস্থা। ২০০ নটিক্যাল মাইল অর্থনৈতিক অঞ্চল শেষ হওয়ার পরই শুরু হয় মহিসোপান। উপরের অংশ, অর্থাৎ জলরাশি দিয়ে মহিসোপানের বিচার করা হয় না। মহিসোপানের বিচার করা হয় পানির নিচের অংশ দিয়ে, যেখানে তেল, গ্যাসসহ প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। মহিসোপানে আমাদের সীমানা নির্ধারিত হলেই আমরা মহিসোপানে অর্থাৎ সাগরের নিচে আমাদের কর্মকাণ্ড চালাতে পারব। এই মহিসোপানের সীমানা নির্ধারণের জন্য আমাদের ন্যূনতম চার থেকে ছয় বছর অপেক্ষা করতে হবে। সাধারণত ৩৫০ থেকে ৪০০ নটিক্যাল মাইলকে মহিসোপানের সীমানা ধরা হয়। বাংলাদেশ ২০১১ সালে তার মহিসোপানের দাবি জাতিসংঘে জমা দেয়। মোট ৫২টি দেশের আবেদনপত্র জাতিসংঘ বিবেচনা করছে। এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সরকারকে এখন খুব দ্রুত পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। রায়ের পর সরকার সময় পাবে ৫ বছর। নিয়মানুযায়ী কোনো দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণের পর প্রথম ৫ বছর সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল সি-বেড অথরিটিকে কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। কিন্তু ৫ বছরের পর থেকে আহরিত মোট সামুদ্রিক সম্পদের একটা অংশ এই কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমুদ্র অধিদফতরকে রেখেও একটি বৃহৎ পরিসরে পৃথক কর্তৃপক্ষ গঠন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। নৌবাহিনী থেকে অবসরে যাওয়া সিনিয়র কর্মকর্তাদের এই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জড়িত করা প্রয়োজন। এর ফলে তাদের মেধা ও যোগ্যতাকে আমরা কাজে লাগাতে পারব। একজন অদক্ষ আমলাকে দিয়ে এই কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। একটা রায় পেয়েছি। এটা নিয়ে যদি আমরা বসে থাকি, আমরা অনেক বড় ভুল করব। Daily JUGANTOR 16.07.14

কোন পথে মিয়ানমার



মিয়ানমারের সাধারণ নির্বাচনের পর যে প্রশ্নটি এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে কোন পথে এখন মিয়ানমার? অং সান সু চির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়েছে বলে ধারণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত সুচি সরকারের নেতৃত্ব দিতে পারবেন কিনা, তা স্পষ্ট নয়। এই নির্বাচন নিয়ে অনেক ‘কিন্তু’ এবং অনেক ‘প্রশ্ন’ আছে। জানুয়ারির আগে আর সংসদ অধিবেশন বসার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে, তারও পরো কেননা সংবিধান অনুযায়ী যিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি একদিকে রাষ্ট্রেরও প্রধান আবার মন্ত্রিপরিষদেরও প্রধান। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেন। যদিও মিয়ানমারের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো পদ নেই। তাহলে অং সান সুচির অবস্থান কী হবে? সংবিধান অনুযায়ী তিনি প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। কেননা তিনি একজন বিদেশিকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার দুই সন্তানের বিদেশি নাগরিকত্ব রয়েছে। এটা সুচি জানেন এবং বোঝেন। সেনাবাহিনী তাদের স্বার্থেই সংবিধানে এই পরিবর্তনটা এনেছে। এখন সুচি চাইলেও সংবিধান পরিবর্তনের কাজটি খুব সহজ হবে না। সংসদের উভয় পক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন এতে প্রয়োজনা। উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা ২২৪, যেখানে ৫৬ জন সেনাসদস্য রয়েছেন, যারা সেনাপ্রধান কর্তৃক মনোনীত। তবে উচ্চকক্ষের ১৬৮ জন (প্রতিটি রাজ্য থেকে ১২ জন করে) নির্বাচিত। ঠিক তেমনি নিম্নকক্ষের ৪৪০ জন সদস্যের মধ্যে ১১৬ জন সেনাসদস্য মনোনীত। বাকি ৩৩০ জন (প্রতিটি টাউনশিপ থেকে একজন করে) নির্বাচিত। মোট ৬৬৪ জনের মধ্যে ৭৫ শতাংশ নির্বাচিত। আর ২৫ শতাংশ মনোনীত, যারা সেনাসদস্য। এ ক্ষেত্রে ৪৪২ জন সংসদ সদস্যের প্রয়োজন রয়েছে। সংবিধানের এই ধারাগুলো পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু এ সম্ভাবনা ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। এক সংবিধানের এই ধারা মেনে নিয়ে সুচির সেনাবাহিনী ও প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের সঙ্গে একটি ‘সমঝোতা’য় যাওয়া। সমঝোতার অংশ হিসেবে অং সান সুচিকে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন পদে নিয়োগ দেওয়া। সেনাবাহিনী সংবিধান পরিবর্তনে তাদের সমর্থন দেবে না। অং সান সুচি সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনকে দ্বিতীয় টার্মের জন্য সমর্থন করবেন। প্রেসিডেন্ট থেইন সেইনের প্রথম পাঁচ বছরে টার্ম শেষ হবে ২০১৬ সালের ৩০ মার্চ। দুই শেষ পর্যন্ত সুচি যদি সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন তাহলে এক পর্যায়ে নির্বাচনটি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, ১৯৯০ সালের পরিস্থিতি আর ২০১৫ সালের পরিস্থিতি এক নয়। বিশ্ব রাজনীতি তথা আঞ্চলিক রাজনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। সুতরাং নির্বাচনটি বাতিল করার ঝুঁকি হয়তো সেনাবাহিনী নেবে না। শেষ পর্যন্ত হয়তো সুচি বাস্তবতা মেনে নেবেন। কিন্তু শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। সুচি গণতন্ত্রের কথা বলছেন বটে। কিন্তু মিয়ানমারের সমাজ ও সংস্কৃতি একটু ভিন্ন ধরনের। সংবিধান সংশোধনের (১৯৮৮) পরও সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতিই এখানে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান। অর্থাৎ মূল ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে। এখানে সুচি নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। তাতে ক্ষমতার ভারসাম্যে আদৌ কোনো পরিবর্তন হবে না। এমনকি প্রধানমন্ত্রী হতে হলেও তাকে সেনাবাহিনীর সমর্থনের প্রয়োজন হবে। নিদেনপক্ষে নিম্নকক্ষে ১১০ সদস্যবিশিষ্ট সেনাসদস্যের সমর্থন এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনী রাষ্ট্রযন্ত্রে সুচিকে কীভাবে আনবে তাও স্পষ্ট নয়। ১৯৯০ সালের নির্বাচন-পরবর্তী পরিস্থিতির মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে। সুচি অনেক দিন ধরেই চাচ্ছেন সেনাবাহিনীর সঙ্গে একটা সহাবস্থানে যেতো যারা সুচির গত এক বছরের ভূমিকা ও বক্তব্য অনুসরণ করেছেন, তারা দেখবেন তিনি সেনাবাহিনীবিরোধী কোনো বক্তব্য দেননি। কিন্তু সেনা আস্থা কতটুকু তিনি পেয়েছেন, তা নিশ্চিত নয়। মিয়ানমারের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদীরাও একটি ফ্যাক্টর। সেনাবাহিনী এই উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে প্রাচ্য-মুসলমানবিদ্বেষী ও উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীরা মা বা থা (অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রটেকশন অব রেস অ্যান্ড রিলিজিয়ন) সংগঠনের ব্যানারে সংগঠিত হয়েছে। তাদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য সুচি নির্বাচনে ১ হাজার ৭১১টি আসনের (সংসদের উভয় কক্ষ, ১৪টি রাজ্যের সংসদ ও বিভিন্ন অঞ্চল) একটিতেও কোনো মুসলমান প্রার্থী দেননি। সরকারি দল এসপিডিসিও কোনো মুসলমান প্রার্থী দেয়নি। এমনকি নির্বাচনের আগে সুচি রাখাইন স্টেট সফরে গিয়েছিলেন। কিন্তু রোহিঙ্গাদের সমর্থনে তিনি কোনো বক্তব্য দেননি। সিরিয়াস পাঠকরা লক্ষ করে থাকবেন ২০১২ সালের পর থেকে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সমস্যার ব্যাপকতা পেলে এবং শত শত রোহিঙ্গাকে নৌকাযোগে মালয়েশিয়া যাওয়ার ব্যাপারেও সুচির কোনো বক্তব্য নেই। মিয়ানমারের বর্তমান সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিচ্ছে না। মিয়ানমার সরকার মনে করে রোহিঙ্গারা মূলত বাংলাদেশের নাগরিক! অথচ ইতিহাস বলে, শত বছর ধরেই রোহিঙ্গা মুসলমানরা মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বসবাস করে আসছেন। উগ্রপন্থী বৌদ্ধরা মিয়ানমারকে একটি বৌদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাচ্ছে। সুচি এই প্রক্রিয়ার পুরোপুরি বাইরে নন। তিনি জানেন, ক্ষমতা পেতে হলে তার উগ্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে। তাই উগ্রপন্থীরা যখন মুসলমানদের হত্যা করছে, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের বাধ্য করছে বাংলাদেশে ‘পুস ইন’ করতে, তখন তিনি নিশ্চুপ। মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারেও তার কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। ক্ষমতায় থাকার জন্য তিনি যে স্ট্র্যাটেজি বহন করছেন, তা সুবিধাবাদিতায় ভরা। সর্বজন গ্রহণযোগ্য একজন নৈত্রী তিনি, এ কথাটা বলা যাবে না। ক্ষমতায় থাকার জন্য নির্বাচনের আগে একদিকে তিনি সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক ধরনের ‘সহাবস্থান’-এ গেছেন, অন্যদিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সব অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ থেকে উগ্র বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অবস্থানকেই সমর্থন করেছেন। এতে করে তিনি ‘বিজয়ী’ হয়েছেন এটা সত্য। কিন্তু সর্বজন গ্রহণযোগ্য একটি সমাজব্যবস্থা সেখানে কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হবে, সে প্রশ্ন থাকলই। মিয়ানমারের সাধারণ নির্বাচনের পর এখন অনেক প্রশ্ন সামনে চলে এলো। প্রেসিডেন্ট থেইন সেইন যে সংস্কার চালু করেছিলেন, এর অংশ হিসেবেই ওই নির্বাচনটি হলো। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না পশ্চিমা শক্তি, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বড় আগ্রহ রয়েছে মিয়ানমারের ব্যাপারে। প্রেসিডেন্ট ওবামা দু-দুবার মিয়ানমার সফর করেছেন। মার্কিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এখন মিয়ানমারে ভিড় করছে। মার্কিন বিনিয়োগ সেখানে বাড়ছে। দীর্ঘ ৫৩ বছরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সেনা শাসনের পর মিয়ানমারের ‘দুয়ার খুলে দেওয়া’ হয়েছে। সুচিকে সামনে রেখেই পশ্চিমা শক্তি তাদের স্ট্র্যাটেজি রচনা করছে। এই মুহূর্তে অত্যন্ত ক্ষমতাময় সেনাবাহিনী এই ‘পরিবর্তন’ মেনে নিলেও ভবিষ্যতে কী হবে, তা এই মুহূর্তে বলা যায় না। নয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অং সান সুচির অবস্থান কী হবে, তাও স্পষ্ট নয়। সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর পদ বিলুপ্ত হওয়ায় তিনি প্রধানমন্ত্রীও হতে পারছেন না। যদিও তিনি আভাস দিয়েছেন তার ভূমিকা হবে ‘প্রধানমন্ত্রীর উর্ধ্ব’। এ ব্যাপারেও কথা আছে। সংবিধানে এ ধরনের কোনো পদ নেই। একজন ‘সিনিয়র মন্ত্রী’ অথবা এক উপদেষ্টা হিসেবে তিনি প্রশাসনে থাকতে পারেন। এ

ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর আস্থা তিনি যতদিন পাবেন, ততদিন ‘কোনো বামেলা ছাড়াই’ প্রশাসনের অংশ থাকবেন। সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ তিনি নিতে পারেন। কিন্তু সেনাবাহিনী এই উদ্যোগকে সমর্থন করবেই এটা মনে হয় না। জনগণই যে ‘সকল ক্ষমতার উৎস’। মিয়ানমারের নির্বাচন এ কথাটা আবার প্রমাণ করল। এই নির্বাচন পার্শ্ববর্তী থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের সাংবিধানিক শক্তিকে উৎসাহিত করবে। এই প্রথমবারের মতো সংসদে কোনো মুসলিম প্রতিনিধিত্ব থাকল না। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ আরও দানা বাঁধবে। উগ্রপন্থী বৌদ্ধরা মুসলিম নিধন ও উৎখাতে এতে আরও উৎসাহিত হবে। রোহিঙ্গা সমস্যার ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পাবে। সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচিত সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর। অর্থাৎ আগামী জানুয়ারিতে সংসদ গঠন হওয়ার পর ২০২০ সাল পর্যন্ত এই সংসদ টিকে থাকার কথা। সময়টা অনেক লম্বা। নতুন সংসদ গঠিত হওয়ার আগে অন্তত এক মাস সময় থাকবে হাতো সু চি এই সময়টা কাজে লাগাবেন সেনাবাহিনী সঙ্গে একটি ‘সমঝোতা’য় যেতো। সম্ভবত এটাই তার জন্য শেষ সময়। ২০১০ সালেও একটি নির্বাচন হয়েছিল। তার দল ঠিক সময়মতো নিবন্ধন করতে না পারায় অথবা নিবন্ধন না করায় পাঁচ বছর পিছিয়ে গিয়েছিলেন সু চি। এবারও যদি তিনি ভুল করেন তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে হবে ২০২০ সাল পর্যন্ত। সময়টা অনেক বেশি। সু চির বয়স গিয়ে দাঁড়াবে তখন ৭৪-এ। এরপর তার পক্ষে আর রজনীতিতে সক্রিয় থাকা সম্ভব হবে না। সে কারণেই তিনি মিয়ানমারের সমাজে সেনাবাহিনীর ভূমিকাকে মেনে নেবেন। আমরা তার নির্বাচন বিজয়ে স্বাগত জানাই।

বাংলাদেশের জন্য মিয়ানমারে একটি বন্ধুপ্রতিম সরকার থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বমুখী পররাষ্ট্র নীতির কারণে মিয়ানমার আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সড়কপথ চালু হলে তা একদিকে যেমন আমাদের চিনের সঙ্গে সংযোগ ঘটাবে, অন্যদিকে আমরা আমাদের পণ্য নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয়ও যেতে পারব। আমাদের পণ্যের বিশাল এক বাজার সৃষ্টি হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উভয় দেশই বিমস্টেক (ইওগরএউঈ পরিবর্তিত নাম ইইওগরএউঈ) এবং ইঈওগ জোটের সদস্য। যদিও প্রস্তাবিত ইঈওগ জোটটি এখনো আলোর মুখ দেখেনি। ভুটান ও নেপাল বিমস্টেক জোটে যোগ দেওয়ায় এ জোটটি শক্তিশালী হয়েছে। এই জোটের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডে একটি মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা। মিয়ানমারের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে চট্টগ্রামে মিয়ানমারের কাঁচামালভিত্তিক ব্যাপক শিল্প-কারখানা স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষিভিত্তিক মিয়ানমারে বাংলাদেশি সারের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। মিয়ানমার সীমান্তসংলগ্ন চট্টগ্রাম এলাকায় বেশ কিছু সার কারখানা স্থাপন করে বাংলাদেশ মিয়ানমারে সার রপ্তানি করতে পারে। মিয়ানমারের আকিয়াব ও মংডুর আশপাশের অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ, কাঠ ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। এসব কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সিমেন্ট ও কাগজশিল্প বিকশিত হতে পারে। মিয়ানমারে প্রচুর জমি আনাবাদি রয়েছে। এ অবস্থায় মিয়ানমারের ভূমি লিজ নিয়ে বাংলাদেশের জন্য চাল উৎপাদনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। মান্দালয়-ম্যাগওয়ের তুলা আমদানি করতে পারে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ তার ক্রমবর্ধিষ্ণু গার্মেন্ট সেক্টরের কাঁচামাল হিসেবে তুলা মিয়ানমারের এই অঞ্চল থেকে আমদানি করতে পারে। গবাদি পশু আমদানি করার সম্ভাবনাও রয়েছে। বাংলাদেশিরা মিয়ানমারে গবাদি পশুর খামারও গড়ে তুলতে পারেন। মিয়ানমারের সেগুন কাঠ পৃথিবী বিখ্যাত। আমাদের ফার্নিচার শিল্পের চাহিদা মেটাতে পারে এই সেগুন কাঠ, যার ওপর ভিত্তি করে আমরা মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপে আমাদের ফার্নিচারশিল্পের প্রসার ঘটাতে পারি। মিয়ানমারে মূল্যবান পাথর যেমনটি রুবি, জেড আর মারবেলসমৃদ্ধ। এসব মূল্যবান পাথর আমাদের জুয়েলারিশিল্পকে সমৃদ্ধ করে ভালু এডিশনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক হতে পারে। ভারত-মিয়ানমার প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপলাইন থেকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশও উপকৃত হতে পারে। ভারতীয় কোম্পানি রিলায়েন্স মিয়ানমারে গভীর সমুদ্রে গ্যাস উত্তোলনে নিয়োজিত রয়েছে। এই গ্যাস তারা পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতে নিয়ে যেতে চায়। অতীতে এ ব্যাপারে বাংলাদেশের আপত্তি ছিল। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। বাংলাদেশ মিয়ানমারের গ্যাস ব্যবহার করে সেখানে বিদ্যুৎ তথা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, যা পরে বাংলাদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

একটি বড় ধরনের পরিবর্তনের দ্বারপ্রান্তে মিয়ানমারা এখন সেনাবাহিনী ও অং সান সু চি। উভয়পক্ষই যদি কিছু ‘ছাড়’ না দেয়, তাহলে তা মিয়ানমারের জন্য কোনো মঙ্গল ডেকে আনবে না। সেনা জেনারেলদের বুঝতে হবে মানুষ সেখানে পরিবর্তন চেয়েছে। আশার কথা, প্রেসিডেন্ট থেইন সেনইন এবং সেনাপ্রধান মিন অং হাইং সু চিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্যদিকে সু চিকেও বুঝতে হবে নির্বাচনে বিজয় মানেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়। বাস্তবতা তাকে মেনে নিতে হবে। তাই সেনাবাহিনী ও নির্বাচনে বিজয়ী এনএলডি-র মধ্যে একটি ‘সমঝোতা’ প্রতিষ্ঠিত হোক- এটাই সবার কাম্য।

যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা ঐতিহাসিক সংলাপ

দীর্ঘ ৫৪ বছরের বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে গত ২১ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার মধ্যকার আলোচনা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় ধরনের একটি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নানা কর্মকাণ্ড নতুন করে ‘মায়ুয়ুদ’-এর সূচনা করেছে, সেখানে এই দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো গুণগত পরিবর্তন ডেকে আনে কি না এ বিষয়টিই এখন মুখ্য আলোচনার বিষয়। বলা ভালো, দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র কিউবার ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখেছে। ফলে একদিকে এই নিষেধাজ্ঞা যেমন বিশ্বে কিউবার পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে না, অন্যদিকে তেমন কিউবায় কোনো বিনিয়োগও হচ্ছে না। ফলে কিউবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও সেখানে কোনো রাজনৈতিক সংস্কারও আসেনি। গেল ডিসেম্বরে বারাক ওবামা এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। আর এর রেশ ধরেই দুই পক্ষ প্রথমবারের মতো আলোচনায় বসল।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা সম্পর্ক অনেক দিন ধরেই আলোচনার একটি বিষয়। কিউবা কী আদৌ তার সমাজতান্ত্রিক নীতি পরিত্যাগ করবে, নাকি যুক্তরাষ্ট্র 'আবারও' হাভানায় সরকার উৎখাতের উদ্যোগ নেবে- এসব প্রশ্ন বারবার মিডিয়ায় ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের লেখনীতে উঠে এসেছে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে পূর্ব ইউরোপে 'সোভিয়েত ধাঁচের' সমাজতন্ত্রের পতনের রেশ ধরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন সমাজতন্ত্রের পতন ঘটল, তখন বলতে গেলে সারা বিশ্বের দৃষ্টি এক রকম নিবদ্ধ ছিল কিউবার দিকে। কেননা কিউবা ছিল সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অন্যতম সমর্থক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল কিউবার অর্থনীতির অন্যতম উৎস, সেই সঙ্গে নিরাপত্তার অন্যতম গ্যারান্টি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে কিউবা টিকে থাকতে পারবে কি না- এ প্রশ্নটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের 'আগ্রাসনের' মুখে থেকে কিউবা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না এটা নিয়েও প্রশ্ন ছিল। আরো একটি প্রশ্ন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে আলোচিত হচ্ছিল- তা হচ্ছে কিউবা কি আদৌ তার সমাজতান্ত্রিক নীতিতে কোনো পরিবর্তন আনবে? কেননা, চীন ও ভিয়েতনামের মতো দেশেও স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর পরিবর্তন এসেছে। এই দুটি দেশ এখন আর ক্ষুপদী মার্ক্সবাদ অনুসরণ করে না। তাই খুব সংগত কারণেই প্রশ্ন ছিল, কিউবা চীন বা ভিয়েতনামের পথ অনুসরণ করবে কি না?

কিউবা-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল কিউবার নিরাপত্তাহীনতা। যুক্তরাষ্ট্র কখনোই কিউবায় একটি সমাজতান্ত্রিক সরকারকে স্বীকার করে নেয়নি। বরং কিউবায় বিপ্লবের পর (১৯৫৯) কিউবা সরকার যখন লাতিন আমেরিকাজুড়ে বিপ্লব ছড়িয়ে দিতে চাইল, চে গুয়েভারা যখন 'বিপ্লব' সম্পন্ন করার জন্য কিউবা সরকারের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে বলিভিয়ায় গেলেন (সেখানেই তাঁকে পরে হত্যা করা হয়) তখন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের কাছে ভিন্ন একটি বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কখনোই চায়নি 'তার প্রভাবাধীন এলাকায়' অন্য কোনো 'শক্তি' প্রভাব খাটাকা। 'মনরো ডকট্রিন'-এর আদলে যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছে এ এলাকায় তথা লাতিন আমেরিকায় তার পূর্ণ কর্তৃত্ব। কিন্তু কিউবার বিপ্লব যুক্তরাষ্ট্রের এই 'হিসাব-নিকাশে' বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র কিউবা বিপ্লবের মাত্র দুই বছরের মধ্যে ১৯৬১ সালে ভাড়াটে কিউবানদের দিয়ে কিউবা সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা চালায়। সিআইএর অর্থে পরিচালিত এই অভিযান 'বে অব পিগস'-এর অভিযান হিসেবে খ্যাত। বলা বাহুল্য, ওই অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেমে থাকেনি। ঠিক এর পরের বছর ১৯৬২ সালের অক্টোবরে 'কিউবা সংকট' একটি পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কার জন্ম দিয়েছিল। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছিল, কিউবায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বসিয়েছে, যা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করেছে, এটা বিবেচনায় নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র একটি নৌ-অবরোধ আরোপ করে, যাতে করে কিউবায় কোনো ধরনের সামরিক মারগাস্ত সরবরাহ করা না যায়। এই নৌ-অবরোধ অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে একটি যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন দাবি করে, যুক্তরাষ্ট্রকে তুরস্ক থেকে তাদের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে নিতে হবে। দীর্ঘ ১৩ দিন এই নৌ-অবরোধ বহাল ছিল। অবশেষে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ক থেকে মিসাইল প্রত্যাহার করে নিলে সোভিয়েত ইউনিয়নও কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সরিয়ে নেয়। এর মধ্য দিয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা কমে গেলেও সংকট থেকে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র কিউবার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। দীর্ঘ ৫৪ বছর ধরে এই অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে কিউবা 'যুদ্ধ' করে আসছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পরও মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

দুই দিনের আলোচনা শেষ হলেও আশাবাদী হওয়ার মতো কোনো ঘোষণা আসেনি। খোদ কংগ্রেসের অনেক রিপাবলিকান সদস্য কিউবায় রাজনৈতিক সংস্কার না আসা পর্যন্ত বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিপক্ষে মতামত দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সদস্যদের দাবি (ডেমোক্র্যাট সদস্যসহ) কিউবায় আরো বেশি গণতন্ত্র। আরো বেশি অর্থনৈতিক উদারীকরণ। মানবাধিকার পরিস্থিতির আরো উন্নতি। একই সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কার। এটাই হচ্ছে মোদ্রা কথা। বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের শর্তে কিউবা সব কিছু 'উন্মুক্ত' করে দেবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে গর্বাচেভের সংস্কার কর্মসূচির ফলাফল তাদের অজানা নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার আনতে গিয়েই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়েছিল। চীন ও ভিয়েতনামে অর্থনৈতিক সংস্কার এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কার আসেনি। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সংস্কার কর্মসূচির 'পেরেকোইকা' বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু 'গ্লাসনস্ত' কার্যকর হয়নি। রাজনৈতিক সংস্কার আসেনি। কিউবায় কোনোটাই আসেনি। চীন তার সংস্কার কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে এখন ঋণ গ্রহণ করছে। ভিয়েতনামও কম পায়নি। যে ভিয়েতনাম প্রায় ৪০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তারাই আজ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মিত্র। ভিয়েতনামের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ৩০ বিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাকের যে বিশাল চাহিদা, তার একটা বড় অংশ ভিয়েতনাম সরবরাহ করছে। এখানে 'রাজনীতি' অগ্রাধিকার পায়নি। পেয়েছে বাণিজ্য। এখন কিউবা কী প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাও দেখার বিষয়। তবে হট করে দুই দেশের সম্পর্কে কোনো বড় পরিবর্তন আসবে না। প্রেসিডেন্ট রাওল কাস্ত্রো ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, ওবামার এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কিউবার রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসবে না। কিউবার জনগণ এখনো কিউবার সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তবে এটাও ঠিক, বিশ্বায়নের এই যুগে কিউবা 'একা একা' চলতে পারবে না। দেশটিকে 'দুয়ার উন্মুক্ত' করে দিতে হবেই। দেশের অর্থনীতির ৮০ শতাংশ এখনো সরকার নিয়ন্ত্রিত। কিছু কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসা বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে এ সংখ্যা প্রায় চার লাখ ৫০ হাজার। বেসরকারি খাত সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে ট্যুরিজম খাত। এ খাত কিছুটা উন্মুক্ত করা হয়েছে। আরো উন্মুক্ত করা হলে যুক্তরাষ্ট্রের হোটেল চেন ব্যবসায়ীরা এ খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। কিউবায় সীমিত আকারে 'ডলার বাণিজ্য' হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কিউবান আমেরিকানদের পাঠানো অর্থ এখন নিয়মিত কিউবায় আসছে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে একটা সমস্যা রয়েছে। কিউবা প্রতিদিন এক লাখ ব্যারেল তেল 'অত্যন্ত কম মূল্যে' ভেনিজুয়েলা থেকে পেয়ে আসছে। এর বিনিময়ে কিউবা ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক দিচ্ছে। এসব ডাক্তার, নার্স আর শিক্ষক এখন ভেনিজুয়েলার হয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ কাজ করছেন। পুরো ব্যয়ভার বহন করছে ভেনিজুয়েলা। প্রয়াত হুগো শাভেজ এই পরিকল্পনা শুরু করলেও বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাদুরো এই পরিকল্পনা কত দিন টিকিয়ে রাখতে পারবেন, সে প্রশ্ন ইতিমধ্যেই উঠেছে। কেননা ভেনিজুয়েলার রমরমা তেল ব্যবসার

দিন শেষা অর্থনীতি আগের মতো আর শক্তিশালী নয়। রাজধানী কারাকাসে বিশাল বিশাল ভবন খালি পড়ে আছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসছেন না। রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ছে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভেনিজুয়েলার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ভেনিজুয়েলার ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। যখন ওবামা কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করার উদ্যোগ নেন, তার ঠিক এক দিন পর ১০ ডিসেম্বর এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত থেকে কিউবার দূরত্ব মাত্র ১৪৫ কিলোমিটার। এই সাগরপথ পাড়ি দিয়ে কোনো কিউবান নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পা রাখলেই তাকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। এই অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তনের কথা বলেছে কিউবা। দূতাবাস খোলা ও কবে নাগাদ বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে, সে ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট ঘোষণা আসেনি। ফলে যুক্তরাষ্ট্র-কিউবা ঐতিহাসিক সংলাপ একটি প্রশ্নের মধ্যে থেকে গেল বৈকি!

DailyKalerkontho 01.02.15

বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ কি সত্যি সত্যিই সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকিতে রয়েছে? ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া সম্প্রতি এই প্রশ্নটি তুলেছে। ২৮ সেপ্টেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফরে আসার কথা। এখন তারা ওইদিন আসছে না। সবকিছু ঠিক থাকলে ৮ অক্টোবর প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার কথা। এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যবিষয়ক অধিদপ্তর (ডিএফএটি)। তারা নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রশ্নটি তুলেছে। এমনকি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকদের জন্য যে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ, তা জানাতেও তারা ভোলেনি। কোন কারণে ডিএফএটি এই সিদ্ধান্তটি নিল। আমরা জানি না। Global terrorism Inbox ২০১৪ ঘেঁটে আমরা দেখেছি, তাতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের বাস নেই। বরং পাকিস্তানের নাম আছে ৩ নাম্বারে (প্রথম ইরাক, দ্বিতীয় আফগানিস্তান)। তবে ডিএফএটি যখন এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেয় এবং যা ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় স্থান পেয়েছে, তাতে বহির্বিষয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় বৈকি! সন্ত্রাসবাদ একটি বৈশ্বিক সমস্যা। কিন্তু ঝুঁকির সমস্যাটা ভিন্ন। গত প্রায় ১৫ বছর ধরেই বিশ্ব এই সন্ত্রাসবাদের মোকাবেলা করেছে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাব-গভীর পরিবেশে ১১ সেপ্টেম্বর দিনটি পালিত হয়েছে। কিন্তু যে প্রশ্নটির জবাব এখনো পাওয়া যায়নি এবং বোধকরি কোনোদিন পাওয়াও যাবে না, তা হচ্ছে আসলেই কি মুসলমানরা 'টুইন টাওয়ার' হামলা ও ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল? আসলেই কি আল-কায়েদা এই পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল এবং বিশ্বব্যাপী মার্কিন আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই হামলা চালিয়েছিল? সারা বিশ্ব অনেক আগেই জেনেছে ষড়যন্ত্রকারীরা সংখ্যায় ছিল ১৯ জন, যাদের প্রায় সবাই সৌদি, ইয়েমেন ও মিসরের নাগরিক। এরা দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করে আসছিলেন এবং বিমান চালানোর প্রশিক্ষণও তারা নিয়েছিলেন। এর অর্থ পরিকল্পনা দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে তারা অগ্রসর হয়েছিলেন। মোট ৪টি বিমান তারা হাইজ্যাক করেছিলেন। এর মধ্যে ২টি বিমান (আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট এএ ১১ ও ইউনাইটেড এয়ার ফ্লাইট ১৭৫) নিউইয়র্কে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'টুইন টাওয়ার'-এ বিধ্বস্ত হয়েছিল। অন্য একটি পেনসিলভানিয়া স্টেট ও অপরটি ভার্জিনিয়া স্টেটে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বলা হয় হোয়াইট হাউসে একটি বিমান বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা কিন্তু তা পেনসিলভানিয়ায় ভেঙে পড়ে। এই বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন ২৯৯৬ ব্যক্তি, যাদের মধ্যে ২৭৫৩ জনের 'ডেথ সার্টিফিকেট' ইস্যু করা হয়েছিল। বাকিদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ারের হামলায় যারা মারা গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতরাও ছিলেন, যার সংখ্যা প্রায় ৪০ জন। গবেষকরা দেখিয়েছেন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে ষড়যন্ত্রকারীরা ৫ লাখ ডলার ব্যয় করেছিল। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল ১২ বিলিয়ন ডলারের। ইনসিওরেন্স কোম্পানি পরিশোধ করেছিল ৯ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের দাবিনামা। শুধু বিধ্বস্ত ভবন পরিকল্পনা করতে ব্যয় হয়েছিল ৭৫০ মিলিয়ন ডলার। এসব পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না। যারাই এ কাজটা করে থাকুক না কেন, এর পেছনে ছিল একটি গভীর ষড়যন্ত্র। তাহলে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল? এটা কী একটা 'ইহুদি ষড়যন্ত্র' যারা 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তারা এই ঘটনাকে একটি 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ওই ঘটনায় কোনো মুসলমান জড়িত ছিল না, এ ধরনের তথ্য আমরা জানতে পারি মার্কিন গবেষকদের কাছ থেকেই। পাঠক, Elias Davidson-এর প্রসঙ্গ 'There is no evidence that muslims committed the crime of 9-11' পড়ে দেখতে পারেন। (oPEd News, 10 January, 2008)। শুধু তাই নয়— অধ্যাপক Michel Chossudovsky'র গ্রন্থ America's war on Terrorism ও যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর পেছনের কাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক চসুডোভস্কি, যিনি কানাডাতে থাকেন এবং সেখানে একটি গবেষণা সংস্থা পরিচালনা করেন তথ্য-উপাত্তসহ দেখিয়েছেন কারা 'টুইন টাওয়ার' হামলার সঙ্গে জড়িত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বব্যাপী 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' প্রমোট করে কি কি সুযোগ-সুবিধা নিয়েছে, তারও হিসাব দিয়েছে। তার মূল্যায়ন হচ্ছে 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের যত বেশি ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে লাভ হয়েছে অনেক বেশি। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আফগানিস্তানের প্রয়াত তালেবান নেতা মোল্লাহ ওমর আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে 'আশ্রয়' দিয়েছেন, এই অভিযোগ তুলে আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি দখল করে নেয়। এর পরের ইতিহাসও সবাই জানে। ২০০৩ সালে ইরাকে মরণাস্ত্র রয়েছে (Weapons of Mass Destruction), এই অভিযোগ তুলে ইরাকে বোমা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দেশটি দখল করে নিয়েছিল। এখানেই থেমে থাকেনি যুক্তরাষ্ট্র। লিবিয়াতেও বিমান হামলা চালিয়ে দেশটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। অথচ ওসামা বিন লাদেনকে আফগানিস্তানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানের অ্যাসাটাবাদ শহরে ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে এক মার্কিন সেনা অভিযানে লাদেন নিহত হয়েছেন বলা হলেও, সম্প্রতি প্রকাশিত এক গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে অনেক আগেই লাদেন মারা যান। যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএসের অনুসন্ধানী প্রতিবেদক ড্যান রার্থাস তার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে 'টুইন

টাওয়ার হামলার একদিন আগে লাদেন ১০ সেপ্টেম্বর (২০০১) রাওয়ালপিন্ডির মিলিটারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। রার্থাস মনে করেন অসুস্থ লাদেনের পক্ষে সন্ত্রাসী হামলা চালানো ও পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে— যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৯-১১ নামে একটি কমিশন গঠন করেছিল। কমিশন ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পেছনে 'কোন শক্তি' কাজ করেছিল, সে ব্যাপারে কোনো অসুন্দান করেনি। কমিশনকে এ ব্যাপারে কাজ করতে অনুমতিও দেয়া হয়নি। ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন থাকবেই। তবে এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর আল-কায়েদা সারা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল। দীর্ঘ ১৪ বছর পরও আল-কায়েদার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়নি। এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে যে খারাপ ধারণা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। এখন আল-কায়েদার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইসলামিক স্টেটের নাম। ২১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়ে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। আফগানিস্তান ও ইরাকে সামরিক আগ্রাসন, লিবিয়া ও সর্বশেষ ঘটনাবলিতে মারা গেছেন প্রায় ১১ মিলিয়ন মানুষ। এর মধ্যে রয়েছে ইরাকে ৫ মিলিয়ন বা ৫০ লাখ, আফগানিস্তানে ৫ মিলিয়ন, সিরিয়ায় ৫ লাখ। একই সঙ্গে ইতোমধ্যে ৩০ মিলিয়ন মানুষ উদ্ভাস্তে পরিণত হয়েছে। শুধু সিরিয়ার ১১ মিলিয়ন মানুষ উদ্ভাস্তে পরিণত হয়েছে। আজ যখন হাজার হাজার সিরীয় ও ইরাকি শরণার্থী ইউরোপে প্রবেশ করছে, তখন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর ফলে মুসলিম দেশগুলোতে ভয়াবহ অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তাই সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য আসলে কী?

আমরা পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছি, যুক্তরাষ্ট্র 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা শিল্পকে চাঙ্গা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও আফগান যুদ্ধে খরচ করেছে ৬ ট্রিলিয়ন ডলার। আর ১ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে। যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের পয়সায় এই যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করা হয়। বাহ্যত Corporate Globalization-এর যুগে যুক্তরাষ্ট্রের Corporate House-গুলোর স্বার্থে এসব যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে এবং তারা লাভবান হচ্ছে। এসব Corporate House-গুলোতে জন্যই চাই যুদ্ধ। যুদ্ধ মানেই ব্যবসা। একটা দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। ইরাক যুদ্ধের পর ইরাক পুনর্গঠনের কাজ পেয়েছিল বেকটেল গ্রুপ (Bectel Group) যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে দেয়া ১০০ বিলিয়ন ডলারের কনট্রাক্ট পেয়েছিল এই সেকটেল গ্রুপ, আর সঙ্গে জড়িত ছিল তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি। এমনকি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে মার্কিন প্রশাসন ৬টি মার্কিন বৃহৎ করপোরেশনের সঙ্গে ইরাক পুনর্গঠনের কাজের জন্য গোপনে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এরাই বুশ প্রশাসনকে যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর সাদাম হোসেনকে উৎখাতের পর ইরাক তেল বিক্রি করে যুক্তরাষ্ট্রকে এই অর্থ পরিশোধ করেছিল। আজ সিরিয়ার পরিস্থিতি অনেকটা এক রকমই। হঠাৎ করেই মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ইসলামিক স্টেটের আবির্ভাব। সিরিয়ার সব তেল ক্ষেত্রগুলো এখন আইএস জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণে। এরা কালো বাজারে তেল বিক্রি করছে। তেলের ব্যারেলপ্রতি মূল্য এখন ৪০ ডলারের নিচে। ফলে লাভবান হচ্ছে মার্কিন সংস্থাগুলো। তারা এখন সস্তায় তেল পাচ্ছে, যা তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখছে। একটা ছোট শিশু আইল্যান্ডের মৃতদেহ সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। এটা ছিল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলশ্রুতি। এই যুদ্ধ ওই অঞ্চলে কোনো স্থিতিশীলতা আনতে পারেনি। কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে পারেনি। যুদ্ধও বন্ধ হয়নি। যতদিন ওই অঞ্চল অস্থিতিশীল থাকবে, যুদ্ধ বজায় থাকবে, ততই লাভ মার্কিন করপোরেট হাউসগুলোর। যুদ্ধ মানেই ব্যবসা। সুতরাং তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্র করপোরেট হাউসগুলোর স্বার্থ যেমনি উদ্ধার করছে, তাদের ব্যবসা যেমনি বেড়েছে, ঠিক তেমনি ব্যবসায়ী অঞ্চলে উত্তেজনা জিইয়ে রেখে পরোক্ষভাবে ইহুদিবাদের পক্ষেই কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এ জন্যই বোধকরি যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষক প্রফেসর চমস্কি মন্তব্য করেছেন, যে দেশগুলো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রবক্তা তারা ই মূলত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসের প্রধান মদদদাতা। তিনি সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের নামই উল্লেখ করেছেন। তাই খুব সহসাই 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর ধারণা পরিত্যক্ত হবে, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। পারস্য অঞ্চল ছেড়ে সহসাই এই যুদ্ধ সম্প্রসারিত হবে আফ্রিকায়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে এই যুদ্ধের বিস্তার ঘটান সম্ভাবনা ক্ষীণ। এখানে মাঝেমধ্যে দু'একজন আকস্মিক জঙ্গি খবর পুলিশ বা র্যাবের মাধ্যমে সংবাদপত্রে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে বৈশ্বিক জঙ্গিদের কতটুকু মেলানো যাবে, আমি তা নিশ্চিত নই।

বাংলাদেশের মানুষ ক্রিকেটপাগল। তারা ক্রিকেট পছন্দ করেন। আমি বিশ্বাস করি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট বোর্ডের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করবেন যে বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি ঝুঁকি নেই। এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর অনুষ্ঠিত হবে। এখানে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন। অতীতে আমরা বার বার দেখেছি সরকারের কোনো কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিদের উত্থানের কথা বলা হচ্ছে। কোনো কোনো টিভি চ্যানেলে নির্দিষ্ট দুই-একজন বক্তা বার বার এটা বলার চেষ্টা করেন যে বাংলাদেশ জঙ্গি ঝুঁকিতে রয়েছে। দুই-একজন সঞ্চালককেও আমি দেখেছি অতি উৎসাহ সহকারে জঙ্গি তৎপরতা ফলাও করে প্রকাশ করতে। এখন যদি ডিএফএটি ওইসব বক্তব্য, পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার ব্রিফিং আমলে নেয়, তাহলে কী তারা ভুল করবে? নিশ্চয়ই তারা অস্ট্রেলিয়ার হাইকমিশন থেকে পাঠানো এসব প্রতিবেদন আমলে নিয়েছেন। আমার মনে হয় জঙ্গিদের ব্যাপারে আমাদের আরো সতর্ক হয়ে মন্তব্য করা উচিত। ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা একটা প্রপাগান্ডা মাত্র। র্যাবপ্রধানও একই কথা বলেছেন। বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নেই এটাই হচ্ছে মুন্ডা কথা।

আমরা কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা ইরাকের পরিস্থিতিতে মেলাতে পারব না। ওইসব দেশের পরিস্থিতি আর বাংলাদেশের পরিস্থিতি এক নয়। ২০১৩ সালের পর থেকে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩৭ ভাগ হারে, আর আহতদের সংখ্যা বেড়েছে ২৮ ভাগ হারে (গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স ২০১৪)। কিন্তু বাংলাদেশ যথেষ্ট স্থিতিশীল। মৃত্যু কিংবা আহতের খবর আদৌ নেই। সরকার ও রাষ্ট্র যথেষ্ট স্থিতিশীল

এবং সরকার নাগরিকদের জানমাল নিশ্চিত করেছে। সুতরাং আজ ডিএফএটি যে বক্তব্য দিয়েছে, তা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশ আদৌ কোনো ঝুঁকিপূর্ণ দেশ নয়। বৈশ্বিক সম্ভ্রাসবাদ আছে বটে, কিন্তু তা বাংলাদেশকে স্পর্শ করেনি এবং করার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

কেননা বাংলাদেশের মানুষ সহনশীল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। মানুষ ইসলামের নামে জঙ্গি তৎপরতা পছন্দ করে না। বরং জঙ্গিবাদকে তারা ঘৃণা করে। তাই আমরা বিশ্বাস করি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল বাংলাদেশে আসবে এবং আমাদের তামিম-মুশফিকরা আবারো প্রমাণ করবে তারা বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম শক্তি। Daily Jai Jai Din 01.10.15

দুটি পর্যবেক্ষণ ও কিছু মৌলিক প্রশ্ন



বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ নিয়ে দুটি পর্যবেক্ষণের খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। প্রথম পর্যবেক্ষণটি ছিল ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি সার্ভে, যা ছাপা হয়েছিল ২ সেপ্টেম্বর। অন্য পর্যবেক্ষণটি ছিল ব্রিটেনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের, যা ১৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 'গণতন্ত্র দিবস' উপলক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল। উভয় পর্যবেক্ষণেই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় বেরিয়ে এসেছে। আইআরআইয়ের সার্ভেটি ছিল যেকোনো বিবেচনায় বেশ ইন্টারেস্টিং। গেল বছরও তারা এ ধরনের একটি সার্ভে প্রকাশ করেছিল। মূলত আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা Global strategic partners-এর পক্ষ হয়ে আইআরআই বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় এই সার্ভে পরিচালনা করে। ওই সার্ভেতে যেসব ফলাফল পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়-এক. ৬৬ শতাংশ মানুষ মনে করে সরকার জনপ্রিয় ও প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা রয়েছে ৬৭ শতাংশ মানুষের কাছে দুই. ৬২ শতাংশ মানুষ মনে করে দেশ ঠিকমতো চলছে তিন. ৭২ শতাংশ মানুষ মনে করে অর্থনীতি ইতিবাচক। চার. দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে-এটা মনে করে ৬৪ শতাংশ মানুষ। পাঁচ. ৪৩ শতাংশ মানুষ মনে করে সংসদ নির্বাচন দরকার। ছয়. ৬৭ শতাংশ মানুষ মনে করে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করা ভালো। সার্ভেতে দেখা যায়, ৬০ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে (অপছন্দ করে ২৯ শতাংশ)। অন্যদিকে ৪২ শতাংশ মানুষ বিএনপিকে পছন্দ করে (অপছন্দ করে ৪৬ শতাংশ)। ৫৯ শতাংশ মানুষ মনে করে গণতন্ত্র দেশটির জন্য ভালো। নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ-এটা মনে করে মাত্র ৩৩ শতাংশ মানুষ। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে-এটা মনে করে ৬১ শতাংশ মানুষ, আর ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে, এটা মনে করে ৬৩ শতাংশ মানুষ। আমার বিবেচনায় এই সার্ভের এটিই উল্লেখযোগ্য দিক। অর্থাৎ গণতন্ত্র চাই বটে, সেই সঙ্গে চাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য। অন্যদিকে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিশ্বের ১৬৭টি দেশের গণতন্ত্রের ধরন ও বিকাশ নিয়ে রাষ্ট্রগুলোকে র‍্যাংকিং করেছে। তাতে দেখা যায়, যেখানে স্কোর ১০-এর মধ্যে নরওয়ে ৯ দশমিক ৯৩ স্কোর নিয়ে শীর্ষে রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৫তম (স্কোর ৫ দশমিক ৭৮)। তবে ২০০৬ সালের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থানের উন্নতি হয়েছে। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৬ দশমিক ১১। মোট পাঁচটি ক্ষেত্রে সামনে রেখে এই র‍্যাংকিং করা হয়েছে। যেসব নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও বহুমুখিতা (বাংলাদেশের স্কোর ৭ দশমিক ৪২), সরকারের পরিচালনা (বাংলাদেশের স্কোর ৫ দশমিক ০৭), রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (বাংলাদেশের স্কোর ৫), রাজনৈতিক সংস্কৃতি (বাংলাদেশের স্কোর ৪ দশমিক ৩৮) ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (বাংলাদেশের স্কোর ৭ দশমিক ০৬)। ইকোনমিস্টের সার্ভেতে সরাসরি অর্থনৈতিক বিষয়টি স্থান না পেলেও আইআরআইয়ের সার্ভেতে বিষয়টি উঠে এসেছে। গণতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে যে অর্থনীতির বিষয়টি জড়িত, তা দেখা গেছে। গবেষকরা এখন এ বিষয়কে সামনে রেখে গণতন্ত্রের স্বার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতটুকু প্রয়োজন সে ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারেনা। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে এটা বহুল আলোচিত একটি বিষয়-আগে উন্নয়ন, না আগে গণতন্ত্র। ওপরে উল্লিখিত দুটি সার্ভেতে বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এসেছে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের চেউ বয়ে যায়। বিশেষ করে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে কী ধরনের সমাজ, সংস্কৃতি বিকশিত হয়, এ ব্যাপারে আগ্রহ ছিল অনেকের। দীর্ঘ ৭৩ বছর রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো একদলীয় সমাজতান্ত্রিক সরকারের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু ১৯৮৯ সালে সাবেক চেক প্রেসিডেন্ট ভাসলাভ হাভেলের নেতৃত্বে যে 'ভেলভেট রেভলুশনের' জন্ম হয়েছিল, তা বদলে দিল পূর্ব ইউরোপকে, সেই সঙ্গে রাশিয়াকেও। অবসান ঘটেছিল স্নায়ুযুদ্ধের। আমেরিকার তাত্ত্বিকদের কেউ কেউ তখন বলার চেষ্টা করেছিলেন যে 'সমাজতন্ত্র একটি ভ্রান্ত ধারণা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে' এবং লিবারেলিজমেরই জয় হলো (ফ্রান্সিস ফুকিয়ামা)। তখন থেকেই পূর্ব ইউরোপ তথা রাশিয়ার বিকাশমান গণতন্ত্র নিয়ে যেমন প্রশ্ন ছিল, ঠিক তেমনি প্রশ্ন ছিল উন্নয়নশীল বিশ্বের গণতন্ত্র নিয়েও। এখানে অধ্যাপক হানটিংটনের বিখ্যাত প্রবন্ধ (যা পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়) The clash of civilizations the next pattern or conflict-এর কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, যেখানে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন কোন 'সভ্যতা' ভবিষ্যতে টিকে থাকবে এবং উন্নয়নশীল বিশ্ব কোন বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দেবে। অধ্যাপক হানটিংটন লিখেছিলেন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নৈকট্য বিভিন্ন জাতিভিত্তিক

রাষ্ট্রগুলোকে আটটি 'সভ্যতার' ছত্রছায়ায় একত্র করবে এবং এদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তিনি অর্থনৈতিক শক্তিজোট ও আঞ্চলিক শক্তিকে একেবারে অস্বীকার করেননি। তিনি মন্তব্য করেছিলেন এভাবে, 'Economic regionalism may succeed only when it is rooted in a common civilization.' অর্থাৎ অর্থনৈতিক জোটগুলো সাফল্য লাভ করবে যদি সাংস্কৃতিক (তথা ধর্মীয়) বন্ধনটা অটুট থাকে। এখানেই রয়েছে মোদ্রাকথাটি। অর্থনৈতিক সাফল্যটিই আসল, রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রধান নয়। যদি আরো খোলাসা করে বলা যায়, তাহলে বলা যেতে পারে, গণতন্ত্র হতে পারে; তবে 'কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়নই মঙ্গল'। গণতন্ত্রকে কাটছাঁট করে যদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানো যায়, তাহলে মানুষ এই সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটিই আসল। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এর বড় প্রমাণ। মালয়েশিয়ার কথাও আমরা উল্লেখ করতে পারি। এ দেশগুলোতে সীমিত গণতন্ত্র আছে। এসব সমাজে বিকাশমান প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের সঙ্গে পশ্চিমা সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না, এটা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য, সিঙ্গাপুর বা দক্ষিণ কোরিয়ার গণতন্ত্র নিয়ে সেখানকার মানুষ খুশি।

একটি ছোট দেশ সিঙ্গাপুর। দ্বীপরাষ্ট্র। মাত্র ২৫০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে যে রাষ্ট্রটি আজ বিশ্বের উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি, তা একসময় 'জেলেদের পল্লী' হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রয়াত লি কুয়ান ইউ এই রাষ্ট্রকে কোথায় নিয়ে গেছেন, তা আজ সবাই জানে। সিঙ্গাপুরকে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজ করেছিল লি কুয়ান ইউয়ের দর্শন, যেখানে তিনি সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এই তত্ত্বটি, 'কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়ন'। সেখানে গণতন্ত্র আছে। সংসদ আছে। বিরোধী দলও আছে। তবে পিপলস অ্যাকশন পার্টির রয়েছে একক কর্তৃত্ব। একটি শিক্ষিত, দক্ষ, ব্যবসাবান্ধব এলিট শ্রেণি রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সক্রিয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিনির্মাণে (ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের মতে 'Hybrid' গণতন্ত্র) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। অনেকের মতে, কনফুসিয়াস মতবাদ সিঙ্গাপুরের অর্থনীতিকে অন্যতম একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন চীনা পণ্ডিত কনফুসিয়াস ব্যক্তি ও পরিবারকেন্দ্রিক সমৃদ্ধি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিশ্বাস করতেন (চীনে একসময় কনফুসিয়াস নিষিদ্ধ ছিল। আজ চীন কনফুসিয়াসের মতবাদ ধারণ করে)। সিঙ্গাপুর এই মতবাদ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবহার করেছে। সেই সঙ্গে যোগ্য নেতৃত্ব, রাজনীতিতে শিক্ষিত ও মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ, দুর্নীতিমুক্ত একটি সমাজ, সুশাসন ও আইনের কঠোর প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সিঙ্গাপুরকে একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছে। তথাকথিত পশ্চিমা সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র এখানে বিকশিত হয়নি। সিঙ্গাপুরের নেতৃত্ব এর প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেনি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরেকটি দেশ মালয়েশিয়া। ৬১.৩ শতাংশ অধিবাসী মুসলমান, আর ১১ শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর দেশ মালয়েশিয়া। এখানে বিকশিত হয়েছে প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র। তবে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে ব্রিটেনের গণতন্ত্রের সঙ্গে কোনো মিল নেই। লি কুয়ান ইউয়ের মতো মালয়েশিয়াকেও মাহাথির মোহাম্মদ উঠতি অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেন। এখানে রাষ্ট্রীয় দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে 'একই শক্তি'। অর্থাৎ বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত মালয়েশিয়ার জনগোষ্ঠীকে এক পতাকাতলে আনতে ও শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক শক্তির (বারিসোআ ন্যাসিওনাল বা ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বা উমনো যার মূলশক্তি) জন্ম দিয়েছিল মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ১৩টি রাজনৈতিক দলের এই ফ্রন্ট যা মালয়েশিয়ার ঐক্যের প্রতীক, দীর্ঘদিন মালয়েশিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। মাহাথির মোহাম্মদ ১৯৮১ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে ২০০৩ সালে অবসর নেন। এই ২২ বছরে তিনি মালয়েশিয়াকে অন্যতম একটি অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেন। এখানেও কাজ করেছে সেই স্পিরিট, 'কম গণতন্ত্র, বেশি উন্নয়ন'। সেখানে রয়েছে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র। মিডিয়া স্বাধীন নয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত। সংসদ আছে। বিরোধী দলের অস্তিত্বও রয়েছে। কিন্তু বিরোধী দলের বড় ভূমিকা লক্ষ করা যায় না; যদিও সংসদের নিম্নকক্ষে (Dewan Rakyat) যেখানে ক্ষমতাসীন বারিসোআ ন্যাসিওনালের আসন সংখ্যা ১৩৩, সেখানে বিরোধী দলের ফ্রন্ট (Pakatain Rakyat, ৩ দল) পেয়েছে ৮৯টি আসন। বিরোধী দলের আসন বাড়লেও তা রাজনীতিতে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের বিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নটি এসে যায়। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ছাড়া তা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সূচকগুলো একেবারে খারাপ নয়। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ ধরে রাখা, রিজার্ভ ২৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত, দারিদ্র্য কমিয়ে আনা (২৪ শতাংশ), তৈরি পোশাকে ৭৭ লাখ উদ্যোক্তা ও ২৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান, শাস্তিসূচকে ৯৮তম স্থান, ডিজিটাল স্বাধীনতায় ৬৩তম স্থান (৮৬টি দেশের মধ্যে) ইত্যাদি সূচক আশার কথা বলে। কিন্তু বড় ব্যর্থতা প্রধান বিরোধী দলকে সরকার আস্থায় নিতে পারেনি। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে যেখানে 'কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজারস' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমরা তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। সর্বশেষ ৫ জানুয়ারি (২০১৪) একটি নির্বাচন হয়েছে, যেখানে 'সব দলের অংশগ্রহণ' ছিল না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়েছে। রাজনীতি এখন হয়ে পড়েছে অনেকটা একদলীয়া। দুর্নীতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি সমাজের সর্বক্ষেত্রে এত প্রকট যে গণতন্ত্র এখানে অনেকটা 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র'-এর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এমনকি বিরোধী দলের টানা তিন মাসের আন্দোলন বাংলাদেশে একটি 'বোমাবাজির' রাজনীতির জন্ম দিয়েছে। এই রাজনীতি সুস্থ গণতন্ত্র চর্চার জন্য কোনো ভালো খবর নয়।

যাঁরা বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করেন, রাজনীতি নিয়ে সারা জীবন থাকতে চান তাঁদের কাছে এই সার্ভে বা তাদের পর্যবেক্ষণ অনেক চিন্তার খোরাক জোগাবে। আইআরআইয়ের পর্যবেক্ষণ নিয়ে (সারা দেশের মাত্র দুই হাজার ৫২৫ জনের মতামত এতে প্রতিফলিত হয়েছে) প্রশ্ন থাকলেও ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সার্ভেতে বাংলাদেশের অবস্থান অন্য ১৬৬ দেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে দ্বিমতের সুযোগ কম। এখন সার্ভেতে যা-ই উঠে আসুক না কেন, তা থেকে সরকার কিংবা প্রধান বিরোধী দল কতটুকু শিক্ষা নেবে-এটিই বড় প্রশ্ন আমাদের। Daily Kaler Kontho 20.09.15



আন্দামান সাগরে ভাসমান বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের করুণ কাহিনীর রেশ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভূমধ্যসাগরে তথা হাঙ্গেরিতে মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষ করে সিরীয় শরণার্থীদের কাহিনী এখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আলোচনার অন্যতম বিষয়। মূল বিষয়, অর্থাৎ শরণার্থী সমস্যা এক থাকলেও, উভয় ঘটনায় কিছু মিল, কিছু অমিল আছে। ছোট শিশু আয়লান কুর্দির মৃতদেহ তুরস্কের উপকূলে পাওয়া গিয়েছিল বিধায় তা মিডিয়ায় ঝড় তুলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আন্দামান সাগরে আয়লানের মতো কত রোহিঙ্গা শিশু না খেয়ে পিপাসায় মারা গেছে, তার হিসাব আমরা কোনো দিনই পাব না। সিরীয় কিংবা ইরাকি শরণার্থীদের এখন বলা হচ্ছে জবমরসব পয়ধহমব ৎবভঁমব অর্থাৎ সরকার পরিবর্তনের কারণে হাজার হাজার মানুষ উদ্ভাস্তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা যখন ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে তাদের দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন কোথাও আমি 'ধর্মীয় শরণার্থী' এ ধরনের কথা শুনিনি। তবে বাস্তবতা হলো এটা পাচারকারীরা আন্দামান সাগরে যেমনি শরণার্থীদের নিয়ে নৌকা ভাসিয়েছিল, ঠিক তেমনি ভূমধ্যসাগরেও তারা নৌকায় মানুষ তুলেছিল। এ মানব পাচারকারীরা আছে সর্বত্র তাদের সবার চরিত্র এক।

তাই প্রশ্ন অনেক। এ মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে একটি চক্র। এরা যেমন আছে বাংলাদেশ-মিয়ানমারে, ঠিক তেমনি আছে তুরস্কে, থাইল্যান্ডে আর মালয়েশিয়ায়। এখানে পাচারকারীরা মূলত প্রথমে টার্গেট করেছিল রোহিঙ্গা নারী-পুরুষদের, যারা মিয়ানমারের আরাকান প্রদেশের বাসিন্দা। মিয়ানমারে কয়েক বছর ধরেই এক ধরনের 'এথনিক ক্লিনসিং' অর্থাৎ অত্যন্ত সুকৌশলে মুসলমানদের আরাকান থেকে উৎখাত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মিয়ানমারকে একটি বৌদ্ধরাষ্ট্রে পরিণত করতে চান বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। আর এদের মদদ জোগাচ্ছে মিয়ানমারের শাসকচক্র। বৌদ্ধধর্ম শান্তির ধর্ম। এরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু আরাকানে বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড তা প্রমাণ করে না। যারা সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক, তারা লক্ষ্য করেছেন বেশ কিছু দিন ধরেই আরাকানে জন্ম নেয়া ও সেখানে বসবাসরত মুসলমান নাগরিকদের (যারা রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিত) ঘরবাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। এক বছর ধরে মিয়ানমারে নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু রোহিঙ্গাদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়া হচ্ছে না। মিয়ানমারের শাসকচক্র মনে করেন রোহিঙ্গারা মূলত চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং তারা অবৈধভাবে আরাকানে বসবাস করছেন! অত্যন্ত কৌশলে এদের বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে ঠেলে দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে একাধিকবার। এরপর একটি 'চক্র' এদের কৌশলে মালয়েশিয়া পাচার করার উদ্যোগ নেয়। এর সঙ্গে যোগ হয় বাংলাদেশের মানব পাচারকারীরা। বাংলাদেশিরাও চাকরির আসায় যেতে চায় মালয়েশিয়া। কৌশলে পাচারকারীরা তাদের বড় সাম্পানে তুলে দিয়ে পরে থাইল্যান্ডের পাচারকারীদের হাতে তুলে দেয় এবং মুক্তিপণ দাবি করা হয়। সমস্যাটা তৈরি হয়েছিল এভাবেই। রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বাংলাদেশিদেরও নেয়া হয় এবং পরে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা হয়। রোহিঙ্গাদের বলা হয়েছিল মালয়েশিয়ায় আশ্রয় দেয়ার কথা। এখানে মিয়ানমার সরকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও ছিল। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা হয়েছে, তা হচ্ছে সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের যোগসাজশে এ মানব পাচার চলে আসছিল। স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা নিয়েও খবর বের হয়েছিল। যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা অস্বীকার করেছেন। এ মানব পাচারের ঘটনা যে এই প্রথম ঘটল, তা নয়। এর আগেও ঘটেছে। কিন্তু তা প্রকাশ পেয়েছে কম। এবারই সম্ভবত ব্যাপক মানব পাচারের ঘটনা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে স্থান পেয়েছিল। এখানে আরো একটা বিষয় দৃষ্টকটু। এ মানব পাচারের ঘটনা বাংলাদেশের নৌবাহিনী কিংবা কোস্টগার্ডের চোখ এড়িয়ে গেল কিভাবে? কোস্টগার্ডের না হয় সমুদ্রে যাওয়ার বড় জাহাজ নেই। কিন্তু নৌবাহিনী? সমুদ্রসীমায় টহল দেয়া, বিদেশি মাছ ধরা ট্রলারগুলোর বাংলাদেশি সমুদ্রসীমায় প্রবেশে বাধাদান, সমুদ্রসীমান্ত রক্ষা এসবই তো নৌবাহিনীর কাজ। তাদের তো গভীর সমুদ্রে যাওয়ার জাহাজ রয়েছে। অতিসম্প্রতি নতুন নতুন জাহাজ নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে। লেবাননে শান্তি মিশনে গিয়েছিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী। তাহলে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সাগরপথে যে মানব পাচার হচ্ছে তা তাদের দৃষ্টিতে এলো না কেন? স্থানীয় কমান্ডার কি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছিলেন? আরো দুর্ভাগ্য আমাদের যে, এ ঘটনায় বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক নষ্ট হয়েছে। ভাবমূর্তি উদ্ধারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী ভূমিকা নেয়, সেটাই দেখার বিষয় এখন। আন্দামানের শরণার্থী আর ভূমধ্যসাগরের শরণার্থীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আলোচিত শিশু আয়লান কুর্দির বাবা আবদুল্লাহ গণমাধ্যকে জানিয়েছেন, তিনি পাচারকারীদের ৫ হাজার ইউরো দিয়েছেন ইউরোপে যাওয়ার পর। পাচারকারীরা সহজ একটি পথ বেছে নিয়েছিল তুরস্ক থেকে সমুদ্রপথে ছোট নৌকায় করে ইতালি যাওয়ার। অন্যদিকে, অনেকে ব্যবহার করেছেন বলকান রুট। এ 'রুট' ধরে তারা ঢুকে পড়েছিলেন হাঙ্গেরিতে। হাজার হাজার সিরীয়, ইরাকি আর আফগানের ভিড়ে গোটা বুদাপেস্টে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, কোনো সভ্য দেশের মানুষ আগে তা কখনই দেখেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে কিংবা স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পরও পশ্চিম ইউরোপের মানুষের এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। হাজার হাজার মানুষ, যাদের মাঝে আছে শিশু ও কিশোরী, তাদের সবার টার্গেট জার্মানি যাওয়া। এসব শরণার্থী এসে ইউরোপে মূলত দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপ শরণার্থীদের ব্যাপারে

সহানুভূতিশীল। অন্যদিকে, পূর্ব ইউরোপ এদের বহন করতে নারাজ। অনেক দিন থেকেই পশ্চিম ইউরোপ আফগান শরণার্থীদের আশা দিয়ে আসছিল। জার্মানিতে এ সংখ্যা এখন কয়েক লাখ, যাদের অনেকেই জার্মানির নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। আর মানব পাচারকারীরা এটাকেই ব্যবহার করছে এবং তারা সুযোগটি গ্রহণ করে সিরিয়া, ইরাক থেকে মানব সন্তান পাচারের উদ্যোগ নিয়েছে। এটা সত্য, বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়া, লিবিয়া থেকে ব্যাপকসংখ্যক মানুষের ইউরোপে অভিবাসন ঘটেছে অবৈধ পথে। তবে আফ্রিকা থেকে যারা আসছেন, তারা মূলত অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য, উন্নত জীবন, ইউরোপের জীবনযাত্রা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে ইউরোপে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করেছেন অবৈধ উপায়ে। এমন খবরও শরণার্থীদের মুখ থেকে বের হয়েছে যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ২ থেকে ৩ হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করেছেন অবৈধ পথে ইউরোপে যাওয়ার জন্য। আবার এমনও দেখা গেছে, দালালচক্র এমন শরণার্থীদের জিম্মি করে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপে যাওয়ার ব্যাপারে অভিবাসীদের আগ্রহ বেশি কেন? এর একটা কারণ আমরা খুঁজে পেয়েছি যে, ইউরোপের অনেক নেতা এসব অভিবাসীর ব্যাপারে কিছুটা আগ্রহী! এর কারণ হচ্ছে, সেখানে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার শূন্যে নেমে এসেছে। অর্থাৎ পরিবারপ্রতি জনসংখ্যা বাড়ছে না। তরুণ প্রজন্ম তাদের স্ব স্ব পেশার প্রতি এত বেশি মনোযোগী যে, পৃথিবীতে সন্তান জন্ম দেয়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ কমা ফলে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হ্রাস পাওয়ায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, কল কারখানা চালানোর জন্য লোকের প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হচ্ছে। জার্মানি একটি শিল্পোন্নত দেশ। তাদের ফ্যাক্টরিগুলো চালাতে লোক দরকার। ফলে তারা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করছে শরণার্থীদের অনুপ্রবেশে। একসময় জার্মানিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলেই তা মঞ্জুর করা হতো। আশির দশকে হাজার হাজার আফগান নাগরিক জার্মানিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তারা সেখানকার অর্থনীতিতে গড় অবদান রেখেছেন। আজকে ঘুরেফিরে সে পরিস্থিতি থেকে জার্মানি বেরিয়ে আসতে পেরেছে এটা মনে হয় না। তাদের 'শ্রমিক' দরকার কারখানাগুলো চালানোর জন্য। যদিও এটা সত্য, ১৯৯০ সালের পর পূর্ব ইউরোপ থেকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অভিবাসন ঘটেছে জার্মানিতে। এরা শ্বেতাঙ্গ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো দেশের নাগরিক (যেমন চেক, পোল্যান্ড)। এরা আইনগতভাবেই জার্মানিতে থাকার ও চাকরি করার অধিকার রাখেন। কিন্তু তার পরও জার্মানিতে শ্রমিক সংকট রয়েছে। ফলে আজকে যারাই অবৈধভাবে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টা করছেন, তাদের সবার ট্যাগেট থাকে জার্মানিতে যাওয়া। এটা সত্য, ইউরোপে এ অভিবাসী সমস্যা কোনো একটি দেশের নয়। বরং সমস্যাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব দেশের। তাই এর সমাধান ইউরোপীয় ইউনিয়নকেই খুঁজে বের করতে হবে। ইতোমধ্যে জার্মানির উদ্যোগে বলকান রাষ্ট্রগুলোর একটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল অংশ নিয়েছিলেন।

উদ্দেশ্য ছিল একটাই— কী করে অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। জার্মানি চাচ্ছে এক্যবদ্ধভাবে ইইউর এ সমস্যা মোকাবিলা করতে। কিন্তু স্পষ্টতই ইইউর নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভক্তি আছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, 'শেঙ্গেন জোন' (২৬ দেশ)-এর সুযোগ গ্রহণ করে এ অঞ্চলে একটি পাচারকারী চক্র অত্যন্ত সক্রিয়। ইইউভুক্ত প্রায় সব দেশ তাই 'শেঙ্গেন জোন'-এর অন্তর্ভুক্ত। এ 'জোন' ও অন্তর্ভুক্ত যে কোনো একটি দেশে প্রবেশ করলে অন্য দেশে ভিসা ছাড়াই যাওয়া যায়। ফলে পাচারকারীরা হাঙ্গেরিকে ব্যবহার করছে। প্রতিদিন হাঙ্গেরিতে পা রাখছে প্রায় তিন হাজার মানুষ। হাঙ্গেরি সার্বিয়ার সঙ্গে ১৭৫ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ করছে, যাতে সার্বিয়া থেকে অবৈধ অভিবাসীরা হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করতে না পারে। একবার হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করলে ইইউভুক্ত যে কোনো দেশে যাওয়ার সুযোগ তাদের জন্য তৈরি হয় এবং তারা হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করা মাত্র ইইউর সব সুযোগ-সুবিধা পাবে। জার্মানিতে ইতোমধ্যে প্রায় ১২ হাজার লোক অস্ট্রিয়া দিয়ে প্রবেশ করেছে। জার্মান নাগরিকরা এদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ৬ বিলিয়ন ইউরো এদের জন্য বরাদ্দ করার কথাও বলেছেন জার্মান চ্যান্সেলর। জাতিসংঘের মহাসচিব এ সেপ্টেম্বরেই অভিবাসীদের সমস্যা নিয়ে নিউইয়র্কে একটি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেছেন। সিরিয়া ও ইরাক সংকটের গভীরতা অনেক বেশি, তাতে সন্দেহ নেই। আফগানিস্তানেও 'যুদ্ধ' শেষ হয়ে গেছে এটা বলা যাবে না। আর মিয়ানমারে সংকটের চরিত্রটা একটু ভিন্ন ধরনের। সেখানে জাতিগত নিপীড়ন চলছে। যুদ্ধ আছে আফ্রিকাসহ, একাধিক দেশে। সোমালিয়া থেকে শুরু করে নাইজেরিয়া, কঙ্গো এবং সিয়েরা লিওনেও। ফলে মানুষ একটু বেঁচে থাকার জন্য দেশান্তরিত হবেই। জার্মানি ব্যাপকসংখ্যক সিরীয় অভিবাসীকে আশ্রয় দিয়ে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু জার্মানির একার পক্ষে সব শরণার্থী গ্রহণ করা সম্ভবও নয়। ফলে জাতিসংঘ যদি পৃথিবীর সর্বত্র 'যুদ্ধ বন্ধ' ও জাতিগত নিপীড়ন বন্ধ করার উদ্যোগ না নেয়, তাহলে মানুষ নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাবেই। তাই হয়তো আগামীতেও আবার আন্দামানের নৌকা ভাসবে। নৌকা ভাসবে ভূমধ্যসাগরেও। Daily Jai Jai Din 13.09.15

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com